মহাত্মা গান্ধী ও মীরা বেন

মদনমোহন গুহ

পাণ্ডুলিপি
১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট ● কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম সংস্করণ ঃ বৈশাখ ১৯৬০

প্রকাশক ঃ
শুভেন্দু মিশ্র
পাণ্ডুলিপি
১৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

লেজার টাইপ সেটিং ঃ
দেবজ্যোতি প্রিন্ট কোং
২৬, বিদ্যাসাগর রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৬৫

মুদ্রক ঃ
স্টারলাইন
কলিকাতা-৬

গীতাঞ্জলী

তোমাকে

ভূমিকা

মহাত্মাগান্ধীর সম্মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে যে সমস্ত বিদেশিনী মহিলা ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং ভারতের হিতসাধনে জীবনপাত করে গেছেন মীরাবেন তাঁদের অন্যতম। মীরা বেন-এর আসল নাম মেডিলেন স্লেড। মীরা বেন গান্ধীজির দেওয়া নাম। মীরা ছিলেন খাঁটি ইংরেজ রমনী। তাঁর ধমনীতে খাঁটি ইংরেজ রক্ত প্রবাহিত। বাবা ছিলেন ইংলন্ডের নৌবাহিনীর সর্ব্বোচ্চ অধিকর্তা।

তিনি যখন ভারতে আসেন ভারতে চলছে তুমুল ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন। স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ করাই ভারতবাসীর তখন ধ্যান জ্ঞান। অথচ মীরা বাবা মার কথা অগ্রাহ্য করে ভারতে চলে আসেন। গান্ধীজির টানে, গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে।

মীরার জন্ম ১৮৯২ সালে ইংলন্ডে। তিনি ভারতে আসেন ১৯২৫ সালে। তাঁর ভারতে আসার কাহিনী এক অদ্ভুত- অনেকটা কল্পকাহিনীর মতনই বলা চলে।

মীরা ছিলেন ইংলন্ডের অসামান্যা রূপসী-কন্যা। ধন, জন, যৌবনরসে ভরপুর। তিনি ছিলেন প্রকৃতির পূজারী। প্রকৃতি প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে থাকতেন ছোটবেলা থেকে। আর গান বাজনার প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল প্রবল। বিটোফেন্ ছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী। বিটোফেনের সুরের ঝংকার রেকর্ডে শুনে তিনি অভিভূত হয়ে পড়তেন ছোট বেলা থেকে। বড় হয়ে বিটোফেনের ন্যায় একজন উঁচুদরের সুরশিল্পী হবেন এই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান।

হঠাৎই তিনি হাতের কাছে পেয়ে গেলেন প্রখ্যাত ফরাসি সাহিত্যিক রম্যাঁলর‍্যাঁর বিটোফেনের উপর লেখা একখানা জীবনী-গ্রন্থ। রল্যাঁ ছিলেন বিটোফেনের গুণমুগ্ধ। তিনি বিটোফেনের ফিফ্‌থ সিম্পোনি অপূর্ব বাজাতে পারতেন। বিটোফেনের অন্যান্য বাজনার সুরও তাঁর যন্ত্রে অপূর্বভাবে ধরা পড়তো। রল্যাঁব লেখা বিঠোফেনের জীবনী গ্রন্থটি ফরাসি ভাষায় লেখা। মীরা স্বল্পদিনের গভীর চেষ্টায় ফরাসি ভাষা শিখে নিলেন। বিটোফেনের জীবনী গ্রন্থখানি অতি মনোনিবেশ সহকারে পড়লেন। মীরা স্থির করলেন তিনি রল্যাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। রল্যাঁ তখন সুইজারল্যান্ডে। ভিলন্যাভেতে থাকেন। ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত তিনি।

মীরা ছুটলেন রল্যাঁ সকাশে। ভিলন্যাভেতে। রল্যাঁর বাড়ির কাছে তিনি একখানা বাড়ি ভাড়া করলেন। নিয়মিত রল্যাঁর কাছে যেতে লাগলেন। বিটোফেনের বাজনার সুরের ঝংকার শুনলেন রল্যাঁর যন্ত্রের মাধ্যমে। রল্যাঁর হাতে বিটোফেনের বাজনার সুর মীরাকে মুগ্ধ করল। বিটোফেনের ব্যাপারে অনেক কথাবার্তা হলো।

রল্যাঁ হঠাৎ তাঁর আলোচনা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। তখন ভারতবর্ষে চলছে গান্ধীজির নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। গান্ধীজি তখন কংগ্রেসের একচ্ছত্র অধিপতি। অহিংস আন্দোলনের প্রবক্তা। রল্যাঁ মীরাকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কি মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনেছেন। মীরা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তিনি জানালেন গান্ধীর নাম তিনি শুনেননি। রল্যাঁ বললেন গান্ধী একজন সন্ত। তিনি আরও বললেন "Gandhi is another christ."।

রল্যাঁর মুখে একথা শুনে মীরা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর মনে তোলপাড় আরম্ভ হল। রল্যাঁ আরও বললেন তিনি গান্ধী সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন। মীরা বইখানি পড়ার

জন্য গভীর আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বইখানা ফরাসি ভাষায় লেখা। বইখানা মীরা অদ্যোপান্ত পড়লেন গভীর মনোযোগ সহকারে। মীরার মন মুহূর্ত্তমধ্যে পরিবর্তিত হয়ে গেল। বিটোফেনের বাজনার সুরও তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর মনে হলো। তিনি ভারতে গিয়ে গান্ধীজির শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন। রল্যাঁকে তাঁর মনের অনুভূতির কথা জানালেন। রল্যাঁর গান্ধী জীবনী পড়ে মীরার জীবনের মোড় গেল ঘুরে।

মীরা ও রোহনা দু' বোন আর মা বাবা। রোহনার বিয়ে হয়েছে একজন আই. সি. এস. অফিসারের সঙ্গে। তিনি তখন বম্বের জেলা শাসক। মীরার মনে তখন একমাত্র চিন্তা কিভাবে ভারতে গিয়ে গান্ধীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন।

এর মধ্যে তিনি গান্ধীজির কাছে চিঠি দিলেন। তাঁর মনের কথা বিস্তারিত জানালেন। তিনি যে সবরমতি আশ্রমে গান্ধীজির শিষ্যা হিসেবে থাকতে চান তাও জানালেন। গান্ধীজি মীরাকে সবরমতি আশ্রমে থাকতে দিতে অনীহা প্রকাশ করলেন না। তবে আশ্রম জীবন যে খুবই কষ্টের তা জানিয়ে দিলেন। এও বলে দিলেন মীরা যদি এরপবও আসতে চান তাহলে আসাব দিন ক্ষণ জানিয়ে যেন গান্ধীজিকে চিঠি দেন। মীরা গান্ধীজির চিঠি পেয়ে উল্লসিত।

জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে ২৫ শে অক্টোবর, ১৯২৫ সালে পি অ্যান্ড ও জাহাজের করে মীরা ভারত অভিমুখে রওনা দিলেন। রওনা দেবার দিনক্ষণ আগেই গান্ধীজিকে জানিয়ে দিলেন। ৬ ই নভেম্বর ১৯২৫ বম্বে বন্দরে মীরার জাহাজ এসে নোঙর করল। গান্ধীজির নির্দেশে মীরাকে রিসিভ করার জন্য বেশ কিছু কংগ্রেস নেতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখান থেকে মীরাকে মালাবার হিল সত্র দাদাভাই নৌরজীর বাড়ি নিয়ে গেলেন। কিছু সময় সেখানে কাটিয়ে বিকেলেব ট্রেনে সবরমতি রওনা দিলেন কংগ্রেস নেতারা মীরাকে নিয়ে।

যথাসময়ে আশ্রমে এসে পৌছোলেন। সেইখানে বল্লভভাই প্যাটেল ও আরও কয়েকজন মীরার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা সবরমতি আশ্রমে গিয়ে মীরাকে নিয়ে সরাসরি গান্ধীজির ঘরে গেলেন। গান্ধীজি মীরাকে এর আগে কোনদিন দেখেননি। প্রথম পরিচয়ে মীরা গান্ধীজির ব্যবহারে বিমোহিতা। গান্ধীজি মীরাকে বললেন "তুমি আমার কন্যাসমা" ক্রমে কস্তুরাবা ও আশ্রমের অনেকের সঙ্গে মীরার পরিচয় হল। মীরা এসেছিলেন সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করতে গান্ধীজির শিষ্যা হিসেবে। চেয়েছিলেন হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে। কিন্তু গান্ধীজি তাঁকে তাঁর ধর্ম ত্যাগ করতে নিষেধ করলেন।

তবে পরিবেশ ও পরিস্থিতি মীরাকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিতে বাধ্য করল। মীরা খাদির প্রচার করতে ও সমাজ সেবামূলক কাজের তাগিদে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন। জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে ভারতের নিষ্পেষিত জনগণের সেবার কাজে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতা ও অ্যানিবেশান্ত দু'জনই ছিলেন বিদেশিনী মহিলা। ভারতবর্ষে এসেছিলেন, ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর হিতসাধনে প্রভূত কাজ করে গেছেন। নিবেদিতা এসেছিলেন স্বামীজির শিষ্যা হিসেবে। স্বামীজির মৃত্যুর পর ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। জীবনের শেষ রক্তবিন্দুটি ভারতের স্বাধীনতার জন্য

অম্লানবদনে দান করেছিলেন। নিবেদিতা স্বামীজীকে সাক্ষাতে দেখেছিলেন, তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলেন, তাঁর বই পড়েছিলেন-শেষে অনেক বিচার বিবেচনা করে তাঁকে গুরুপদে বরণ করেছিলেন।

অ্যানিবেশান্ত এসেছিলেন থিওসফিক্যাল সোসাইটির নেত্রী হিসেবে। মাদ্রাজের আদিয়ারে ছিল তাঁর প্রধানকর্মকেন্দ্র। শেষে পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাঁকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। তিনি ছিলেন ভারতের হোমরুল লীগের প্রতিষ্ঠাতা। গান্ধীজি আফ্রিকা থেকে এসে অ্যানিবেশান্তের হোমরুলীগের ছত্রছায়ায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে প্রবেশ করেন। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজির সঙ্গে মতবিরোধের ফলে অ্যানিবেশান্ত নিজেকে রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। বেশ কিছুদিন আলমোড়াতে ছিলেন। রাউন্ড টেবেল কনফারেন্সের বিফলতার পর কংগ্রেস ছেড়ে দেন। তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন।

নিবেদিতা ও অ্যানিবেশান্ত দু'জনই হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুর সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী। এবং তাঁরা হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা সমগ্র বিশ্বে পরিজ্ঞাত করতে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। একদিকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য অপরিসীম পরিশ্রম করেছেন অন্যদিকে হিন্দুর সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের জন্য আত্মনিয়োগ করে তাঁরা তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ভারতের মাটিতেই তাঁরা দেহ রাখেন। ভারতের স্বাধীনতা দেখে যাবার সুযোগ তাঁদের হয়নি।

অন্যদিকে মীরা বেন সম্ভবত একমাত্র বিদেশিনী মহিলা যিনি রল্যাঁর লেখা গান্ধীর জীবনী পড়ে গান্ধীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গান্ধীজির নাম পর্যন্ত তিনি রল্যাঁর লেখা পড়ার আগে শুনেননি, গান্ধীজিকে দেখা ত দূরের কথা। গান্ধীজির বক্তৃতাও তাঁর কর্ণকুহরে কোনদিন প্রবেশ করেনি। হিন্দু ধর্ম সম্পর্কেও তাঁর কোন ধারণা ছিল না অথচ রল্যাঁর গান্ধীজীবনী তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। আত্মীয়স্বজন, ধন, যৌবন ব্যক্তিগত সুখ সব বিসর্জন দিয়ে ইংরেজ রক্তে উদ্ভাসিত মীরা গান্ধীজির শিষ্যা হিসেবে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর হিতসাধনে জীবনমন সমর্পণ-করলেন।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে মীরা পৃথ্বিসিং নামক এক সুদর্শন গান্ধীভক্ত পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। গান্ধীজির সম্মতিতে তিনি পৃথ্বিসিংকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। তিনিও যে রক্তমাংসের মানুষ এবং দৈহিক কামনা বাসনা যে তাঁর মনোরাজ্যে বিরাজমান এটাই ভারতে আসার পর তাঁর প্রথম এবং শেষ প্রকাশ। তবে পৃথ্বিসিং তাঁকে প্রতারণা করলেন - তা না হলে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভারতের বধূ হিসেবে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু নিয়তি তাঁকে তাঁর হঠাৎ জাগ্রত জৈবিক কামনা বাসনা থেকে বিচ্যুত করল। তাই কথায় বলে "নিয়তি কেন বাধ্যতে।" মীরা হতাশ হলেন না বরঞ্চ ভারতবাসীর নিষ্পেষিত জনগণের সেবার কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে সমর্পণ করলেন।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে নিবেদিতা ও অ্যানিবেশান্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেননি। মীরা কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা দেখেছেন। গান্ধীর মৃত্যুর পর দশবছর ভারতবর্ষে ছিলেন। এবং গান্ধীজির গ্রামস্বরাজের পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তখন জওহর লাল নেহরু ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। শতসহস্র

চেষ্টা করেও গান্ধীজির স্বপ্নকে রূপায়িত করতে তিনি সক্ষম হননি। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছে তিনি গান্ধীর মৃত্যুর পর বিশেষ সমাদর পাননি। সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারিরা তাঁকে বাঁকা চোখে দেখতেন - তারপর লালফিতের বাধন এড়িয়ে নিষ্পেষিত ভারতবাসীর মঙ্গলবিধানে তাঁর পক্ষে বিশেষ কোন কাজ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

গান্ধীজি একসময়ে তাঁকে দুঃখ করে বলেছিলেন, "I don't Know what you think of freedom. For me it is a disillusionment" কংগ্রেস তথা ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা দেখলে সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বাধীনতার পর গান্ধীজি চেয়েছিলেন স্বার্থলোভী কংগ্রেসকে ভেঙ্গে দিতে। কিন্তু গান্ধীজিকেই নীরবে সরে যেতে হয়েছিল নির্জনে। ভারত দ্বিখন্ডিত হল সেই শোক গান্ধীজি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভুলতে পারেননি।

মীরা ৩৪ বছর ভারতবর্ষে ছিলেন (১৯২৫—১৯৫৯)। এর মধ্যে ২৪ বছর গান্ধীজির সঙ্গে কাজ করেছেন আর দশবছর তাঁর মৃত্যুর পর। শেষ পর্যন্ত নানান ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিন কাটিয়ে অত্যন্ত বেদনার্দ্র হৃদয়ে ১৯৫৯ সালে ভারতবর্ষ ছেড়ে ভিয়েনা নগরে চলে যান। ভারতবর্ষের স্বার্থান্বেষী জনগনের অনেক কিছুই তাঁর হৃদয়ে গভীর ক্ষত স্থাপন করেছিল. সবরমতি আশ্রমে আশ্রমিকদের মধ্যে কলুষিত জীবন যাত্রা তাঁকে পলে পলে দগ্ধ করেছিল। গান্ধীজিকে তিনি সব খরবাখবর পরিবেশন করতেন। গান্ধীজি অনশন করেও সবরমতি আশ্রমে আশ্রমিকদের মানসিক পরিবর্তন ঘটাতে অসমর্থ হন। শেষ পর্যন্ত মীরার সঙ্গে পরামর্শ করে সবরমতি আশ্রম বন্ধ করে দেন। তারপর সেবাগ্রামে নতুন আশ্রম স্থাপন করেন। এ আশ্রম স্থাপনের পেছেনে রয়েছে মীরাবেনের প্রাণান্ত প্রয়াস। মীরা ৩৪ বছর ভারতবাসীর স্বার্থান্বেষী জনগণের মানসিকতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। কংগ্রেসের কার্যকলাপকেও সুস্থমনে দেখার সুযোগ তাঁর ঘটেনি। ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার আগে দুঃখ করে বলেছিলেন, " I have no place to live, and very little money left. Kishan Ashram, Pashulok, Gopal Ashram, Goabal all passed out of my life dreams, no more government projects, that at best was clear."।

মীরার বাবা মা তখন ইহজগত থেকে বিদায় নিয়েছেন, বোন রোহনাও তখন পরপারে। আত্মীয় স্বজন বলতে ভিয়েনা বা ইউরোপে তাঁর কেউ ছিলেন কিনা জানি না - কেন না মীরার ভিয়েনা বা ইউরোপজীবন সম্পর্কে লেখকের বিশেষ কিছু জানার সুযোগ হয়নি।

তবে এই বইতে মীরা বেনের ভারতে তাঁর কাজকর্মের সুদীর্ঘ আলোচনার চেষ্টা করেছি। শারীরিক অসুস্থতাও মানসিক অবসাদকে তুচ্ছ করে মীরা যে ভাবে ভারতবর্ষে ও ভারতবাসীর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন তার তুলনা মেলা ভার।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্য তাঁকে বহুদিন জেলে কাটাতে হয়েছে। সবরমতি জেলেও তাঁকে বহুদিন থাকতে হয়েছে। জেল জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর মনের গভীরে বিরাট ক্ষত স্থাপন করেছিল। পুনার আগা খাঁ জেলেও গান্ধীজির সঙ্গে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় বন্দিজীবন কাটাতে হয়েছিল। সেখানে দেখেছেন গান্ধীজির অন্যতম সুহৃদ মহাদেবের হৃদরোগে মৃত্যু, দেখেছেন গান্ধীপত্নী কস্তুরাবার জীবনাবসান। আগাখাঁ প্রাসাদের জেল সংলগ্ন জায়গায় তাঁদের মৃতদেহের সংকার স্বচক্ষে দেখেছেন। দেখেছেন

গান্ধীজির সহনশীলতা, সত্যের প্রতি তাঁর আসক্তি। মরণশীল মানব মানবীর জীবনের গূঢ় তত্ত্ব কিভাবে গান্ধীজির মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তার প্রমাণও তিনি পেয়েছিলেন। গান্ধীজির আদর্শই ছিল তাঁর চলার পথের পাথেয়।

নিবেদিতা, অ্যানিবেশান্ত বা মীরাবেন আজ এদেশের জনগণের মন থেকে বিলুপ্তপ্রায়। ভারতে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করা হয় সাড়ম্বরে প্রতি বছর কিন্তু এ সমস্ত বিদেশিনী মহিলার ভারতের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের কাহিনী কোনও নেতার মুখে একবারও উচ্চারিত হতে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। এ হতভাগ্য দেশের পক্ষে এর চেয়ে লজ্জার ব্যাপার আর কি হতে পারে?

বইটি লেখার ব্যাপারে Mira Behn এর 'THE SPIRIT'S PILIGRIMAGE' বইখানা আমায় বিশেষ সাহায্য করেছে। এ ছাড়া Dr. R. C. Mazumdar এর Freedom Movement of India. গান্ধীজির রচনা সমগ্র, সুভাষ রচনাবলী, ভারত স্বাধীন হল—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, Annie Besant - C. P. Ramaswami Ayer ও নানান ধরনের স্বাধীনতা সংক্রান্ত প্রবন্ধ আমাকে বইখানা লেখার ব্যাপারে নানান তথ্যের সন্ধান দিয়েছে।

পরিশেষে বইটি লেখার পেছনে আমার পত্নী শ্রীমতি গীতাঞ্জলির ও পুত্র সৈকতের সহযোগিতার কথা অকপটে স্বীকার করতে হয়। তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে অসুস্থ শরীরে বইখানার লেখা শেষ করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।

বইটির লেখা শেষ করে "পাণ্ডুলিপি' প্রকাশনী সংস্থার শ্রী শুভেন্দু মিশ্র মহাশয়ের কাছে যাই। উনি সঙ্গে সঙ্গে বইখানার পাণ্ডুলিপি আমার কাছ থেকে চেয়ে নেন এবং দু' একদিন পর বইখানা প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে আমায় গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেন।

গল্পের মত মীরাবেনের জীবনকাহিনী বইটিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সুধী পাঠকবৃন্দের কাছে বইটি সমাদৃত হলে আমার পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করব।

মদনমোহন গুহ

মহাত্মা গান্ধী ও মীরাবেন

এক

গান্ধীজির সম্মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে যে সমস্ত বিদেশিনী ভারতবর্ষে এসেছিলেন মীরাবেন তাঁদের অন্যতমা। তিনি ধন, জন, যৌবন সবই বিসর্জন দিয়ে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর সেবায় যোগিনীবেশে আত্মনিয়োগ করেছিলেন গান্ধীজির ব্যক্তিত্বে ও গান্ধীজির মধুর ব্যবহারে। এই মহীয়সী নারীর নাম আজ ভারতবাসীর স্মৃতি থেকে লুপ্তপ্রায়। খাঁটি ইংরেজ রমনী, খাঁটি ইংরেজরক্ত তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত। অথচ গান্ধীজির প্রেরণা তাঁকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত করেছিল। ভারতের শৃঙ্খলমুক্তিই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান।

তাঁর আত্মত্যাগের কাহিনীর স্মৃতিচারণা করা সরকারি বা বেসরকারি তরফ থেকে আজ গৌণ ব্যাপার। ইতিহাসের পাতায় হয়ত তাঁর কথা কিছুটা লিপিবদ্ধ করা আছে। তবে তাঁর বিস্তারিত জীবন কাহিনী পাওয়া আজ সহজ সাধ্য নয়।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মীরাবেন জন্মগ্রহণ করেন ইংলন্ডে। মীরা গান্ধীজির দেওয়া নাম। তাঁর আসল নাম মেডিলিন স্লেড। তাঁর বাবার নাম এডমিরাল এডমন্ড স্লেড। মীরার কোন ভাই ছিল না। একমাত্র দিদি রোহনা ছিল তাঁর অতি ভালবাসার ধন। রোহনা ও মীরা ছিল বাবা-মার চোখের মণি।

মীরার বাবা ছিলেন ইংলন্ডের নৌবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসার। বাড়িতে বেশিদিন থাকার সুযোগ তাঁর হতো না। দু' তিন বছর পর পর তিনি দেশের বাড়িতে আসতেন। মাকেই দু' মেয়ে নিয়ে থাকতে হতো। বেশির ভাগ সময় তাদের কেটেছে মামার বাড়িতে। ইংলন্ডের মিল্টন হ্যাথ নামক একটি জায়গায় তাদের মামার বাড়ি। সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ অপূর্ব। প্রায় কুড়ি একর জমি নিয়ে তাদের মামার বাড়ির সীমানা। এ জমির চারপাশে অপূর্ব সব গাছ গাছালির সারি। আর তার মাঝখানে তাঁদের প্রাসাদসম বাড়ি। ফুলের ও ফলের বাগান, সব্জির ও গম ভূট্টার খেত। সব মিলে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মীরার মনের গভীরে নাড়া দিত।

মীরা ছোটবেলা থেকে প্রকৃতি প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে থাকত। মামার বিশাল বাড়িতে দাদু (মার বাবা), মা, মীরা ও একজন নার্স স্থায়ীভাবে থাকত। আর কিছু লোকজন থাকত বাগানের ও বাড়ির কাজকর্ম করার জন্য। মীরাকে দেখাশুনার জন্য একজন মহিলা ছিলেন। তিনি পেশায় ছিলেন নার্স। নাম বার্থার। মীরাকে মামার বাড়ির কাছেই একটি নার্সারি স্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়। বার্থারই মীরাকে নিয়মিত নিয়ে যেতেন এবং নিয়ে আসতেন।

মীরার সঙ্গে বার্থারের খুব ভাব। মীরার মামার বাড়িতে অনেক ঘোড়া ও গরু ছিল। ঘোড়ার আস্তাবল ও গরুর গোয়ালঘরগুলি ছিল বিশাল। মীরা ছোটবেলায় ঘোড়ায়চড়তে খুব ভালবাসত।

নার্সারিতে পড়ার সময় মীরাকে বাধ্য-বাধকতার মধ্যে থাকতে হয়েছে। নার্সারি বিদ্যালয়ের পরিবেশ তার শিশুমনের গভীরে নাড়া দিয়েছিল। প্রকৃতি প্রেমিক মীরা শৈশব থেকেই প্রকৃতিকে পূজো করে এসেছে।

মীরার মা জীববিজ্ঞানের স্নাতক। মায়ের প্রভাব পড়েছিল মীরার জীবনে। মায়ের প্রভাবই মীরাকে পশুপাখি, গাছ্ গাছালি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখার অনুপ্রেরণা যোগায়। ডঃ আর্থার নামক আর একজন জীববিজ্ঞানী (মীরারই আত্মীয়) মীরাকে মানুষ ও পশুপাখির শরীর তত্ত্ব সম্পর্কে এক সূক্ষ্ম ধারণা দেন।

ডঃ আর্থারের সান্নিধ্যে মীরার শিশুমনে গান বাজনার প্রতিও গভীর আকর্ষণ সৃষ্টি করে। মীরার বয়স যখন সবে তের তখন তার বাবা বদলি হয়ে এলেন পোর্টস মাউথে। নেভেল ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষপদে।

বাবা-মা-মীরা তিনজনের ছোট সংসার। পোর্টসমাউথ-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতীব মনোরম। মীরার বাবার অপূর্ব সাজানো গোছানো কোয়ার্টার। গান বাজনার সরঞ্জাম রয়েছে কোয়ার্টারে।

ড্রয়িং রুমে রয়েছে একটা পিয়ানো। মীরা পিয়ানো বাজাতে জানত। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র রয়েছে কোয়ার্টারে। মীরা সেই সব বাদ্যযন্ত্র বাজনা শেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করল। বাবাও মীরাকে উৎসাহ দিলেন। মা-বাবার উৎসাহ ও সুযোগ্য শিক্ষকের শিক্ষাগুণে মীরা বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজনায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করে। এ সময়ে মীরা বিটোফেনের ফিফ্থ সিম্পোনি শোনার সুযোগ পায়। রেকর্ডে বিটোফেনের বাজনা শুনে মীরা অভিভূত। সে যেন স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করতে লাগল। তার মনপ্রাণ বিটোফেনের বাজনার সুরে আপ্লুত। মীরা সিদ্ধান্ত নিল সে বিটোফেনের ন্যায় একজন বিশাল সুরশিল্পী হবে।

মীরা মাকে বলল একশ বছর আগে এ পৃথিবীতে আসতে পারলে সে বিটোফেনের সঙ্গে সাক্ষাত করার সুযোগ পেত। তার জন্য সে ভগবানকে দায়ী করতে লাগল। মীরা যখন এরকম এক মানসিক অস্থিরতায় ভুগছে, ঠিক সেই সময় মীরার বাবার বদলির খবর এলো। বৃটিশ নৌবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ হিসেবে তাঁকে পূর্ব ভারতে বদলি করা হয়েছে।

যথাসময়ে মীরা বাবা-মাও দিদিসহ বম্বে বন্দরে এসে হাজির হল। উঠল গবর্ণর হাউসে। তখন বম্বের গবর্ণর জর্জ ক্লার্ক। কিছুদিন তাঁদের গবর্নর হাউসে থাকতে হলো। তারপর তাঁরা চলে গেলেন কোয়ার্টারে। বম্বেতে কিছুদিন থাকার পর মীরার বাবাকে সিংহলে যেতে হল। সিংহলের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মীরার মনে সুরের দোলা জাগালো। মীরা বাবার সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরলে কি হবে তার কানে কিন্তু বিটোফেনের পঞ্চম সিম্পোনির সুরের ঝঙ্কার ধ্বনিত হতে লাগল। সেই বাজনা শেখার তীব্র আগ্রহ তার মনকে ক্রমাগত উদ্‌গ্রীব করে তুলল।

শীতকালে তাঁরা সিংহল থেকে ফিরে এলেন বম্বেতে। একবছর বম্বেতে কাটালেন। পরের বছর মীরার বাবাকে বদলি করা হল পারস্য উপসাগরে। জাহাজযোগে তাঁরা চললেন

নতুন জায়গায়। বসরা, কুইয়েত, বাহরিন হয়ে তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন পারস্য উপসাগরে। মাস্কাটেই তাঁদের থাকতে হবে। মাস্কাটের সুলতানের সঙ্গে মীরার বাবা সপরিবারে সৌজন্য মূলক সাক্ষাতকারের জন্য গেলেন।

মাস্কাটের সুলতান মীরাররূপে মুগ্ধ। সুলতান ইংরেজি জানেন না। দোভাষীর মাধ্যমে সুলতানের সঙ্গে মীরার বাবা-মার কথা বার্তা চলছিল। সুলতান হঠাৎ মীরার হাতখানা চেপে ধরলেন। স্নেহের সুরে কি যেন বলছিলেন। দোভাষী সব বুঝলেন। সুলতান মীরাকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। দোভাষী সুলতানকে বুঝিয়ে দিলেন তা সম্ভব নয়। মীরা কোনরকমে ছাড়া পেল। এই অভিজ্ঞতার কথা মীরা তার "Spirit's Pilgrimage" বইতে উল্লেখ করেছেন।

মাস্কাটে কিছুদিন থাকার পর মীরার বাবাকে আবার বদলি করা হল ভারতে। ১৯১২। ভারতে যাচ্ছেন রাজা ও রানী। রাজদরবার বসছে ভারতের মাটিতে।

স্থির হল মীরার বাবা একাই যাবেন ভারতে। মীরার মা রাজি হলেন না। বাধ্য হয়ে মীরার বাবা সকলকে নিয়ে ভারতে যাবেন স্থির করলেন। মীরার কিন্তু ভারতে যাবার এতটুকু ইচ্ছে নেই। সে তখন ঊনিশ বছরের যুবতী। সে বাবাকে বোঝাল যে মিল্টন হ্যাথে মামার বাড়িতে থাকতে তার একটুও অসুবিধে হবে না। বাবা সম্মত হলেন। মীরা দাদুর কাছেই থেকে গেলেন।

রোহনা এবং মীরার বাবা-মা একসঙ্গে চললেন ভারতে। মীরার মনে তারজন্য কোন উৎকণ্ঠা নেই। বরঞ্চ সে মনে মনে খুশি। সে গান বাজনা নিয়ে মগ্ন. অভিভাবক রয়েছেন দাদু। বিটোফেনের সুর বাজনা তাকে শিখতেই হবে।

এর মধ্যে মীরার মা বাবা রোহনার বিয়ের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতে লাগলেন। পাত্রও জুটে গেল। পাত্র আই. সি. এস. অফিসার। পাত্রের কর্মস্থল বম্বেতে। জেলা প্রশাসক। যাই হোক, মীরা ভারত থেকে নিয়মিত চিঠি-পত্র পাচ্ছে তার বাবা মার কাছ থেকে।

মীরা হঠাৎ খবর পেল লণ্ডনে গান বাজনার আসর বসছে। ল্যমন্ড নামক একজন প্রখ্যাত জার্মান সুরশিল্পী আসছেন এই আসরে বাজাবার জন্য। বিটোফেনের ফিফ্থ সিম্পোনি বাজাবেন তিনি। বলতে গেলে তিনি বিটোফেনের একান্ত অনুরক্ত। বিটোফেনের সুর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বাজাবার কলা কৌশল তিনি এর মধ্যে আয়ত্ত করে নিয়েছেন। অসাধারণ প্রতিভা তাঁর।

খবর পেয়ে মীরা ছুটলেন লন্ডনে। যথাসময়ে গান বাজনার আসরে গিয়ে উপস্থিত হলেন তিনি। গানের আসরে উপস্থিত বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ। মীরা বসেছেন সম্মুখের সারিতে। ল্যমন্ডের আগমনে লণ্ডনের সুররসিকের দল আপ্লুত।

শুরু হলো ল্যমন্ডের বাজনা। মীরা স্তব্ধ। বিটোফেনের সিম্পনি শুনতে শুনতে মীরার দু' চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। বাজনা শেষে মীরা ল্যমন্ড সকাশে গেল। ল্যমন্ডকে অজস্র সাধুবাদ জানাল। জানাল তার অন্তরের কৃতজ্ঞতা।

এর মধ্যে মীরার বাবা এডমিরাল এর পদে উন্নীত হয়েছেন। প্রভূত তাঁর ক্ষমতা। মীরার বাবার বিশেষ এক কাজ ছিল "প্রোটেক্শন অফ ট্রেড রুট"। তখন চলছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। জার্মানীতে অজার্মানদের থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সেখানে শিল্পী বা সুরসাধকদের

গানবাজনা বন্ধ করে দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। ল্যমন্ড এর পক্ষে জার্মানিতে থাকা সম্ভব হলো না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত। মীরার বাবারও তখন সরকারি কাজের অবসর জীবন। আবার তিনি কাজ নিয়েছেন-অ্যংলো পার্শিয়ান অয়েল কোম্পানিতে। লণ্ডনের সন্নিকটে মীরার বাবা একটা বাড়ি নিলেন। জায়গাটা মীরার খুবই পছন্দের।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটলো অবসান। জার্মানীর পতন হল। কাইজার উইলিয়ম পলাতক। জার্মানীতে চলছে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের শাসন। মীরা ছুটলেন জার্মানীতে। এর মধ্যে তিনি জার্মান ভাষা আয়ত্ত করে নিয়েছেন। গিয়ে উপস্থিত হলেন বন-এ। খুঁজে বের করলেন বিটোফেনের জন্মস্থান। যে বাড়িতে তাঁর জন্ম হয়েছিল সেই বাড়িতে ঢুকলেন মীরা।

বাড়ির আশেপাশে রয়েছে অপূর্ব সব গাছগাছালি। রয়েছে অপূর্ব সব পাখির আস্তানা। মীরা অভিভূত। মীরা বিটোফেনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন। এব পর মীরা ছুটলেন ভিয়েনাতে। খুঁজে বের করলেন বিটোফেনের কবরস্থান। অনন্যসুন্দর এই স্থানটি মীরার মনে জাগালো এক স্বর্গীয় অনুভূতি।

মীরা ফিরে এলেন লন্ডনে। তাঁর বাবা ও মার কাছে। একদিন এক শুভ মুহূর্তে তিনি হাতেব কাছে পেয়ে গেলেন বিটোফেনের একখানা জীবনীগ্রন্থ। গ্রন্থখানির নাম "Jean Chnstopha" লিখেছেন ফরাসী মনীষী রম্যাঁরল্যাঁ। বইখানি ফরাসি ভাষায় লেখা। তাই বইখানা মীরার পক্ষে সঙ্গে সঙ্গে পড়া সম্ভব হল না।

মীরা স্থির করলেন ফরাসি ভাষা শিখবেন। যেই কথা সেই কাজ। মীবা কিছুদিনের মধ্যেই ফরাসি ভাষা শিখলেন গভীর আগ্রহ সহকারে। ফরাসি ভাষা শিখে মীরা বইখানি আদ্যোপান্ত পড়লেন। অবগত হলেন বিটোফেনের জীবনকাহিনী। রল্যাঁর উপর মীরার গভীর শ্রদ্ধা জাগল। এই প্রথম তিনি রল্যাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হলেন।

খবর পেলেন রল্যাঁ উঠেছেন হোটেল সিসিলি-তে। মীরা সেখানে ফোন করলেন। কিন্তু রল্যাঁ মীরাকে সময় দিতে পারলেন না। কেন না রল্যাঁ তখন খুবই ব্যস্ত। ঠাসা তাঁর প্রোগ্রাম। পেন ক্লাব-এর অনুষ্ঠান সেরে রল্যাঁ রওনা দিলেন প্যারিসের পথে। মীরাকে ফোনে বলে দিলেন প্যারিসে যেন মীরা তাঁর কাছে চিঠি দেন।

মীরা প্যারিসে রল্যাঁর ঠিকানা যোগাড় করলেন। তাঁর কাছে চিঠি দিলেন। রল্যাঁকে লিখলেন বিটোফেনের বাজনা শুনার জন্য তিনি ভীষণ ভাবে আগ্রহিনী। তিনি 'বিটোফেনের ফিফথ্ সিম্পোনি' বাজনা শিখতে বিশেষভাবে উদ্‌গ্রীব। এ সমস্ত ব্যাপারে কথা বলার জন্য মীরা রল্যাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান। রল্যাঁ মীরার চিঠির উত্তর দিলেন।

মীরাকে রল্যাঁ লিখলেন তিনি দু' একদিনের মধ্যেই সুইজারল্যান্ড যাচ্ছেন। 'ভিলন্যাভে'র ঠিকানা দিলেন। সেটাই রল্যাঁর সুইজারলান্ডের স্থায়ি ঠিকানা। লিখে জানালেন মীরা সেখানে রল্যাঁর সঙ্গে যেন দেখা করেন।

এর মধ্যে রল্যাঁ চলে এসেছেন সুইজারল্যান্ডে। চলে গেলেন নিজের বাড়ি ভিলন্যাভে। মীরা খবর পেলেন। ছুটলেন সুইজারল্যান্ডে। ভিলন্যাভে-তে রল্যাঁর বাড়ির কাছে একটা বাড়ি ভাড়া করলেন। সেখান থেকে সাইকেলে করে রল্যাঁর বাড়ি যাওয়া যায় আধঘন্টারও কম সময়ে।

এর মধ্যে মীরা রপ্ত করে নিয়েছেন ফরাসি ভাষা। মীরা ফরাসি ভাষায় রল্যাঁর কাছে একখানা চিঠি লিখলেন। এসময়ে মীরার সঙ্গে একজন স্কুলশিক্ষকের পরিচয় ঘটে। শিক্ষকটি মীরাকে বললেন যে, রল্যাঁ অতীব বিনয়ী, উদার এবং মানবতার প্রতিমূর্ত্তি।

রল্যাঁকে সাক্ষাতকারের দিনক্ষণ জানিয়ে চিঠি দিলেন। মীরা রল্যাঁ সন্নিধানে এলেন সাইকেলে চড়ে। বাড়ির দরজায় লাগানো কলিংবেল টিপলেন খুবই সংযতভাবে। রল্যাঁ আগে থেকেই জানতেন মীরা আসবেন। রল্যাঁ নিজেই দরজা খুলে দিলেন। মীরা ঘরের ভেতর গেলেন।

ঘরে ছিলেন রল্যাঁর বোন। মীরা রল্যাঁর সঙ্গে জমিয়ে গল্প করলেন। দু' জনে গল্পে মেতে উঠলেন। গল্প করতে করতে রল্যাঁ মীরাকে অস্ট্রীয়া সম্বন্ধে বললেন অনেক কথা। তখন ভারতে চলছে গান্ধীজির নেতৃত্বে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। সহিংস নয় অহিংশস আন্দোলন। রল্যাঁ ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক তথ্য পরিবেশন করলেন।

রল্যাঁ মীবাকে জানালেন যে তিনি গান্ধীজিকে নিয়ে একখানা বই লিখেছেন। বইটির নাম "মহাত্মা গান্ধী"। রল্যাঁ মীরার কাছে জানতে চাইলেন তিনি কি গান্ধীর নামের সঙ্গে পরিচিতা। গান্ধীর কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁর কি কোন ধারণা আছে? মীরা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। মীরা রল্যাঁকে বললেন এযাবৎ তিনি গান্ধীর নাম পর্যন্ত শুনেননি। রল্যাঁ মীরার কথাতে খানিকটা বিরক্তবোধ করলেন। তিনি মীরাকে বললেন গান্ধী পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব। গান্ধী হচ্ছেন আর একজন যিশু।

মীরা রল্যাঁর কথাতে বিস্মিত হলেন। এক অদ্ভুত চিন্তা মীরার মনোরাজ্যে বিচরণ করতে লাগল। গান্ধী সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য তিনি উৎসুক হয়ে উঠলেন। তখন সন্ধ্যা সমাগত। রল্যাঁ মীরাকে আর একটু সময়ও আটকে রাখতে চাইলেন না। মীরাকে সাইকেলে বাড়ি ফিরতে হবে। রল্যাঁ মীরাকে নিজের সন্তানেব ন্যায় ভালবাসতেন। মীরাকে স্নেহের সুরে তাঁর বাড়ির দিকে রওনা দিতে নির্দেশ দিলেন. মীরার দু' গালে চুম্বন দিলেন। যেন পিতা কন্যাকে স্নেহ ভালবাসা উজাড় করে দিচ্ছেন। মীরাকে রল্যাঁ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

মীরা সাইকেলে চেপে নিজের আস্তানার দিকে রওনা দিলেন। মীরার মনে এক স্বর্গীয় অনুভূতির উন্মেষ ঘটল। রল্যাঁর প্রতিটি কথা বিশেষত তাঁর গান্ধী সম্পর্কে উক্তি যেন মীরার মনকে উত্তাল করে তুলল।

"Gandhi is another christ" রল্যাঁর এই কথাটি মীরার মনে বার বার উদিত হতে লাগল। মীরা রল্যাঁর লেখা গান্ধীজির জীবনী গ্রন্থখানা পড়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। পরদিন মীরা সকালে গিয়ে বইখানার প্রকাশকের নাম ঠিকানা জানলেন। জানতে পারলেন প্রকাশক হচ্ছে ফ্রান্সের লোক। মীরা ছুটলেন প্যারিসে। সেখানে গেলেন প্রকাশকের কাছে। বইখানা কিনলেন। মীরা ফরাসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করে ফেলেছেন এরই মধ্যে। বইখানা প্রায় একদিনের মধ্যে পড়ে ফেললেন। কিছু কিছু জায়গা তিনি বারে বারে পড়লেন।

মীরার চিন্তাধারা গেল পাল্টে। যেন কোন এক অদৃশ্য শক্তি তাঁকে গান্ধীজির শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য প্রেরণা জাগাতে লাগল। রল্যাঁর গান্ধী সম্পর্কে লেখা বইখানা যে কত তত্ত্বসমৃদ্ধ

এবং মনুষ্যহৃদয়ের কত গভীরে নাড়া দিতে পারে গান্ধীসম্পর্কে মীরার অনুভূতি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

চারিত্রিক গঠন অনুযায়ী বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে আবেগেরবশে তাড়িত হয়। আবেগের তাড়নায় মীরা যেন গান্ধী সকাশে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। গান্ধীর শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য মীরা দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলেন। যৌবনের গভীর জৈব প্রেরণা তাঁকে অবদমিত করতে পারল না। বিশ্বের ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্ত বিরল। বা নেই বললেও চলে। একখানা মাত্র বই পড়ে গান্ধীকে তিনি গুরুর আসনে বসালেন। বাবা মার মতামত নেবারও প্রয়োজন মনে করলেন না। ভারতে গিয়ে গান্ধীর শিষ্যা হিসেবে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর হিতার্থে আত্মনিবেদন করার উদগ্র বাসনা তাঁর মন প্রাণকে উত্তাল করে তুলল।

মীরা ছুটলেন পি অ্যান্ড ও আফিসে। ভারতে যাবার জন্য জাহাজের সিট বুক করতে। মীরা তাদের বললেন এক বছরের মধ্যেই তিনি ভারতে যাবেন। মীরা গান্ধীর সুযোগ্যা শিষ্যা হবেন এটা তাঁর মনের দৃঢ় ধারণা। মীরা চরকায় সুতো কাটা শেখার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। মীরা গান্ধী সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে গেছেন। এবং চরকায় সুতো কেটে খাদি বস্ত্রাদি তৈরি করা যে গান্ধীর অন্যতম পরিকল্পনা তা মীরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছেন দূর থেকে। মীরা জানতেন গান্ধীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হলে এ সমস্ত ব্যাপারে নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে আগে থেকেই। কিন্তু ইংলন্ডে চরকায় সুতো কাটা শেখার সুযোগ কোথায়?

মীরা তাই বাধ্য হয়ে উল নিয়ে কাজ শিখতে লাগলেন। 'The Kensington weavers' কোম্পানীতে গেলেন। কোম্পানিটী চালাতো Donothy Wilkonson ও তাঁর বোন। তাঁদের কাছে মীরা শিক্ষানবিশী হিসেবে থাকলেন। যেতে লাগলেন সেলাইয়ের স্কুলেও। মীরা তাঁত ও সেলাই-এর কাজে পোক্ত হয়ে গেলেন।

ধীরে ধীরে তিনি মাছ, মাংস, মদ্ সিগেরেট সব ছাড়লেন। খেতে আরম্ভ করলেন নিরামিষ। বলা যায় গান্ধীজির শিষ্যত্ব লাভের জন্যই মীরার এই কৃচ্ছসাধন। মীরা এরমধ্যে ভারতীয় ভাষা শেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। নিযুক্ত করলেন একজন শিক্ষক। শিক্ষকের কাছে তিনি হিন্দীও সংস্কৃত ভাষা শিখতে লাগলেন। তবে উর্দু ভাষার প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল প্রবল। তিনি কিছু উর্দু ভাষী ছাত্রের সন্ধান পেলেন। মীরা কিছুদিনের জন্য এলেন লন্ডনে। তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়ম লাইব্রেরীতে গেলেন। পড়লেন গভীর মনোযোগ সহকারে ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা। এর মধ্যে তিনি খানিকটা উর্দুও হিন্দী ভাষা আয়ত্ত করে নিয়েছেন।

মীরা এর মধ্যে রল্যাঁর কাছে প্যারিস থেকে চিঠি পাঠালেন। রল্যাঁকে তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন তিনি রল্যাঁর বই পড়ে গান্ধী সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনেছেন। গান্ধীর মহান ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য ও মানবতাবোধ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তিনি গান্ধীর শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য ভারতে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রল্যাঁর লেখা গান্ধীজীবনী মীরার জীবনকে ওলট পালট করে দিল।

'বিটোফেন-এর সুরের আকর্ষণও যেন তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হতে লাগল। গান্ধীর

চিন্তাতেই তিনি আচ্ছন্ন। গান্ধীজিকে তিনি তাঁর গুরুপদে বরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বিয়ে-সাধি, যৌবনের উন্মাদনা, যৌনচেতনা প্রভৃতি তাঁর কাছে তুচ্ছ বলে মনে হতে লাগল। এ যেন ভগিনী নিবেদিতার স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণের চেয়েও বেশি বিস্ময়কর। কেন না নিবেদিতা স্বামীজিকে দেখেছিলেন খুব কাছ থেকে। শুনেছিলেন তাঁর ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা। স্বামীজির জ্বলন্ত চোখ দু'টো যেন অন্তরের অন্তস্থল ভেদ করে নিবেদিতার অন্তর্নিহিত সত্তাকে পরখ করে নিয়েছিল। নিবেদিতা তন্ময় হয়ে স্বামীজিকে নিরীক্ষণ করেছিলেন। পড়েছিলেন স্বামীজির লেখা বই পরম বিস্ময়ে। স্বামীজিকৃত হিন্দু সনাতন ধর্মের বিচার বিশ্লেষণ নিবেদিতার মনে দোলা লাগিয়েছিল। তারপর স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন অনেক যাচাই করে।

মীরা কিন্তু গান্ধীজিকে জেনেছেন রল্যাঁর বই পড়ে প্রথমে। এর পর থেকেই গান্ধীজির প্রতি মীরার শ্রদ্ধা। তিনি গান্ধীজিকে তখনো দেখেন নি। তাঁর বক্তৃতাও শুনেননি। গান্ধীজিকে পরখ করে নেবার সুযোগও তাঁর ঘটেনি। তবুও গান্ধীজিকে পরম গুরু হিসেবে গ্রহণ করার তাঁর কি আকুলতা। পৃথিবীর ইতিহাসে শুধু একখানা বই পড়ে এরকম একজন মহাত্মার শ্রীচরণে সম্পূর্ণরূপে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করার চরমদৃষ্টান্ত সম্ভবত এই প্রথম। সুধীজন মীরার এই সিদ্ধান্তকে বিস্ময়ের চোখে দেখেছেন। কিন্তু মীরার কাছে এই সিদ্ধান্ত ছিল স্বতঃসিদ্ধ। পূর্বজন্মের কর্মফল যেন মীরাকে গান্ধী সকাশে নিয়ে গিয়েছিল।

এর মধ্যে মীরা ভগবৎ গীতার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে ফেলেছেন। আহরণ করেছেন গীতার সার। মীরা মুগ্ধ। একদিকে গান্ধীজির ব্যক্তিত্ব পান্ডিত্য ও মানবতাবোধ ও অন্য দিকে গীতার সারমর্ম মীরাকে যোগিনীবেশে ভারতে ছুটতে বাধ্য করল। তখন ভারতে চলছে ব্রিটিশ বিরোধী গণ-আন্দোলন।

মীরা তখন লন্ডনে। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজের উপর মীরার চোখ পড়ল। মীরা দেখলেন বড় বড় হরফে কাগজে লেখা গান্ধীজি অনশন আরম্ভ করেছেন। ২১ দিন চলবে তাঁর এই অনশন। ভারতে হিন্দু মুস্লিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করার জন্যই গান্ধীজির এই অনশন। এই অনশন অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হলনা। হিন্দু মুস্লিম সম্প্রীতি ফিরে এলো। গান্ধীজি অনশন করলেন ভঙ্গ। গান্ধীজি তখন কলকাতায়। গান্ধীজির অনশন ভঙ্গের খবর মীরাকে দিল পরম স্বস্তি। মীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। মীরা গান্ধীজিকে চিঠি লিখলেন।

গান্ধীর কাছে মীরার এই প্রথম চিঠি। তাঁর মনের সম্পূর্ণ অনুভূতি, ভাব, ভালবাসা, শ্রদ্ধা সবই যেন গান্ধীজিকে উজাড় করে দিলেন চিঠির মাধ্যমে। গান্ধীজির শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য মীরা যে কৃচ্ছ্রসাধনা আরম্ভ করেছেন তাও জানালেন চিঠিতে। গান্ধীজির কাছে কুড়ি পাউন্ডের একখানা চেক পাঠালেন।

মীরা মনে মনে ভাবলেন গান্ধীজি হয়ত তাঁর চিঠির কোন উত্তর দেবেন না। চেকখানাও ফেরৎ পাঠাবেন। এভাবে চিঠি পাঠিয়ে কোন লাভ হবে না। চিঠি পাঠাবার পর বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। মীরা চিঠির উত্তরের আশা ছেড়ে দিলেন। একদিন মীরা বেডফোর্ড গার্ডেন এ নিজের ঘরে বসে আছেন। টেলিফোনের সামনে বসে কি একটা কাজে ব্যস্ত তিনি। এমন সময় একজন আগন্তুক এসে তাঁকে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিটা ছিল খামের ভেতর।

খামটা ছিল একটু ছেঁড়া। চিঠিচা পড়ে মীরা আনন্দ সাগরে ভাসতে লাগলেন। তিনি যিশুকে দু'হাত তুলে তাঁর প্রণাম জানালেন। চিঠিটা গান্ধীজির। মীরাকে চিঠিতে লিখেছেন।

"সুপ্রিয় বন্ধু,

এতদিন তোমার চিঠির উত্তর দিতে না পারার জন্য আমি প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি ক্রমাগত দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। সমাধান সূত্র খুঁজে বের করার জন্য। তোমার প্রেরিত কুড়ি পাউন্ড আমি সানন্দে গ্রহণ করেছি। এই টাকা নতুন চরকা কেনার জন্য ব্যয় করা হবে।

আমি জেনে অতীব খুশি হলাম তুমি নিজেকে ভারতবর্ষে এসে সমাজ সেবায় উৎসর্গ করার জন্য একবছর কৃচ্ছসাধনে ব্রতী হয়েছ। উল বোনার কাজ শিখছ। শিখছ তাঁতের কাপড় বোনার কাজ। আরও কিছুদিন এভাবে কাজ করে যাও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি ভারতবর্ষে এসে ভারবাসীর জন্য সেবা মূলক কাজে সুন্দরভাবে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে পারবে। আমার আশ্রমে তোমার জন্য একটা পবিত্র স্থান থাকবে। এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত থেকো।"

রেলগাড়িতে স্বাঃ এম. কে গান্ধী
৩১.১২.২৪

মীরা গান্ধীকে আবার লিখলেন যে তিনি ভারতে যেতে সম্পূর্ণভাবে তৈরি। তাঁর উল বোনার ও চরকায় সুতো কাটা শেখার কাজ সমাপ্তপ্রায়। তিনি গান্ধীজিকে তাঁর উল বোনার একটা নমুনাও পাঠালেন। গান্ধীজি তাঁর এই চিঠি পেয়ে বিস্মিত। তিনি ভাবতেই পারছেন না রূপসী, ধনীকন্যা, খাঁটি ইংরেজ রমনী ভারতবর্ষে এসে তাঁর আশ্রমে জীবন যাপন করবেন। কেননা মীরা চিঠিতে গান্ধীজিকে লিখেছেন তিনি সবরমতি আশ্রমে জীবনযাপন করতে একান্তভাবে আগ্রহিনী। তিনি আরও লিখেছেন আশ্রমজীবনে যে কঠোর পরিশ্রম ও কৃচ্ছ্রসাধন প্রয়োজন তার জন্য তিনি ইতিমধ্যে নিজেকে তৈরি করে ফেলেছেন। জবাবে গান্ধীজি মীরাকে লিখলেন,

১৪৮ রসা রোড কলিকাতা
২৪শে জুলাই, ১৯২৫

'প্রিয় বন্ধু'

তোমার চিঠি পেলাম। তোমার এই চিঠি আমাকে ভীষণ ভাবে বিচলিত করেছে। তোমার বোনা উলের নমুনা সত্যি অপূর্ব।

তোমার যখনই ইচ্ছে হবে তখনই আমার আশ্রমে চলে আসবে। তবে আসার আগে আমায় জানাবে। কোন্‌স্টীমারে তুমি আসবে সেটা জানতে পারলে তোমাকে আনার জন্য আমি লোক পাঠাবো। যিনি তোমাকে সবরমতি আশ্রমে নিয়ে আসবেন। তবে তোমাকে জানিয়ে রাখি আশ্রম জীবন খুবই কষ্টের ও পরিশ্রমের। প্রত্যেক আশ্রমবাসীকেই কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও পরিশ্রম করতে হয়। সমাজসেবাও আশ্রমবাসীদের আর একটি প্রধান কাজ।

তদুপরি এখানকার জলবায়ু স্নিগ্ধ নয়। এখান কার জলবায়ু তোমার শরীরের পক্ষে উপযুক্ত হবে কিনা তা সঠিক বলা যায় না। অতএব এখানে আসার আগে সবকিছু ভালোভাবে চিন্তা ভাবনা করে নিও। তোমাকে ভয় দেখাবার জন্য এই কথাগুলো লিখছি না। তবে যা বাস্তব সত্য তা জানিয়ে দিয়ে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। এরপর ভারতে আসার ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্তই শেষ কথা"।

ইতি

স্বাঃ এম. কে. গান্ধী

দুই

গান্ধীজির চিঠি পেয়ে মীরা ভারতে যাবার জন্য সব ঠিকঠাক করে নিলেন। জাহাজে সিট বুক করা হয়ে গেছে। মীরা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে দু' ট্রাঙ্ক মূল্যবান বই, এক ট্রাঙ্ক জামা কাপড় আর কিছু অলঙ্কার. মীরা যাবার আগে রল্যাঁর সঙ্গে দেখা করবেন ভিলন্যাভে গিয়ে। পাকাপোক্ত ব্যবস্থা।

মীরার বাবা-মা প্রথমে একটু অনীহা দেখিয়েছিলেন মীরাকে ভারতে পাঠাতে। পরে তাঁরা বুঝতে পারলেন মীরা আধ্যাত্মিক দিক থেকে অনেকখানি এগিয়ে। আশ্রমে জীবন যাপন করার বাসনা তাঁর হৃদয়ে প্রবল। জ্ঞানী বাবা-মা মীরার মনোবাসনা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারলেন। তাই তাঁরা মীরাকে গান্ধী সন্নিধানে যেতে নিষেধ করলেন না। সানন্দে অনুমতি দিলেন।

মীরার বাবা তখন প্যারিসে ছিলেন। তিনি মীরার জন্য আশীর্বাদবানী পাঠালেন। তিনি তাতে লিখলেন মীরা যেন ভারতে গিয়ে সাবধানে থাকে। তখন ভারতে চলছে চরমপন্থী আন্দোলন। ভারতকে স্বাধীন করার জন্য ভারতবাসী মরিয়া হয়ে উঠেছে। মীরা ইংরেজ রমনী। দ্বিতীয়তঃ তাঁর বাবা একজন উচ্চপদস্থ বৃটিশ নৌবাহিনীর অফিসার। সুতরাং বিপ্লবীদের তাঁর উপর ক্ষোভ থাকা অস্বাভাবিক কিছুই নয়।

মীরা ছুটলেন ভিলন্যাভে, রল্যাঁর সঙ্গে দেখা করতে। রল্যাঁও তাঁর বোন মীরাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। রল্যাঁর কাছে ভারতে যাবার ব্যাপারে মীরা বিস্তারিত লিখে জানিয়েছিলেন এর আগে। এখন মীরা তাঁকে সামনাসামনি সব বললেন। রল্যাঁ হয়ত ভাবছেন তাঁর লেখা গান্ধীজীবনী মীরার জীবনকে ওলট পালট করে দিল। রল্যাঁ ও তাঁর বোন মীরাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন।

২৫শে অক্টোবর। ১৯২৫। মীরা পি অ্যান্ড ও জাহাজে করে ভারতবর্ষে রওনা দিলেন। যথাসময়ে মীরা তাঁর যাত্রার কথা গান্ধীকে জানিয়ে দিলেন। সমুদ্রের অপূর্ব শোভা উপভোগ করতে করতে মীরা চলেছেন জাহাজে করে ভারতে। তাঁর মনে কত কথাই না উদিত হচ্ছে। অচেনা-অজানা জায়গায় তাঁর নতুন জীবন সুরু হতে চলেছে। তার জন্য মীরার মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগছে। তেত্রিশ বছরের ইংলন্ড জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে তিনি যে অচেনা-অজানা দেশে যাচ্ছেন তার জন্য তার মনে এতটুকু চিন্তা নেই। বরঞ্চ তিনি উৎফুল্ল। তাঁকে

দেখে মনে হচ্ছিল এক স্বর্গীয় উন্মাদনা তাঁর দেহ মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

৬ই নভেম্বর মীরার স্টীমার বম্বে বন্দরে নোঙর করল। সেখানে তাঁকে গ্রহণ করার জন্য গান্ধীর নির্দেশে গিয়েছিলেন কিছু কংগ্রেস নেতা। তাঁরা তাঁকে মালাবার হিলস-এ নিয়ে গেলেন। তাঁকে তুললেন দাদাভাই নৌরজীর বাসভবনে। দাদাভাই নৌরজী তাঁকে একদিন বিশ্রাম নিয়ে সবরমতি যাত্রা করার জন্য বললেন।

মীরা একমুহূর্ত্তও নষ্ট করতে নারাজ। তিনি সবরমতি যাত্রা করার জন্য ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলেন। গান্ধীজির চতুর্থ সন্তান দেবদাস গান্ধী এসেছিলেন মীরাকে সবরমতি নিয়ে যেতে। দেবদাস গান্ধী মীরাকে কয়েকঘন্টা বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করলেন। মীরা নৌরজীর বাড়িতে ঘন্টা চার বিশ্রাম নিলেন। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে বিকেলে আহমদাবাদ ট্রেনে উঠলেন। ট্রেন মীরাকে নিয়ে ছুটল। কয়েকঘন্টার রাস্তা। সবরমতি এসে উপস্থিত হলেন মীরা।

মীরাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিলেন মহাদেব দেশাই, বল্লভভাই প্যাটেল এবং ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদক স্বামী আনন্দ।

বল্লভভাই রসিকলোক। তাঁর রসিকতাপূর্ণ কথাবার্তা মীরার মনকে প্রভূত আনন্দ দিচ্ছিল সবরমতি আশ্রমের পথে। পথের দু'ধারে অপূর্ব সব গাছের সারি। প্রকৃতি যেন মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তাকে উপভোগ করার জন্য। মানুষ যে প্রকৃতির সন্তান তাও যেন সে মানুষকে বুঝিয়ে দিচ্ছে. এরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে মীরাকে নিয়ে চলল গাড়ি।

রাস্তায় যেতে যেতে প্রথমে পড়ল 'অল ইন্ডিয়া স্পীনারস এসোসিয়েশন' এর আপিস। তার সেক্রেটারী শঙ্করলাল বাস্কার। তারপর সবরমতি নদী। নদীর উপর রয়েছে একটি ব্রীজ। সবরমতি ব্রীজ।

সবরমতি সেতু থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সবরমতি আশ্রম। মীরার মনে হচ্ছিল প্রকৃতির অপরূপ রূপে যেন সবরমতি আনন্দে মাতোয়ারা।

মীরার মনে হতে লাগল প্রকৃতির অপরূপ রূপে তাঁর সব সত্তার যেন বিলুপ্তি ঘটছে। হাতে যে একটা ব্যাগ আছে তাও যেন তাঁর অনুভূতির বাইরে। এইভাবে গাড়ি করে চলতে চলতে কোন এক সময়ে মীরা ও অন্যান্যরা সবরমতি আশ্রমের দরজায় এসে উপস্থিত।

বল্লভভাই প্যাটেল, মহাদেব দেশাই প্রমুখ ব্যক্তি রয়েছেন মীরার সঙ্গে। তাঁরা মীরাকে নিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করে প্রথমেই গান্ধীজির ঘরে গেলেন। গান্ধী বসেছিলেন নীচে। সাদা ধপধপে চাদর পাতা গদিতে। পিছনে ছিল তাকিয়া।

মীরা দেখলেন গান্ধীজির গায়ের রঙ তামাটে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন গান্ধীজি মীরার দিকে তাকালেন। মীরা তাঁকে নমস্কার করলেন সপ্রতিভ ভাবে। গান্ধীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন মীরার অন্তরাত্মা ভেদ করল। গান্ধীজি মীরাকে বললেন, "তুমি আমার কন্যা।" তারপর দু' একটা কথা হলো দু'জনের মধ্যে। এর পর স্বয়ং গান্ধীজিই মীরাকে নিয়ে প্রবেশ করলেন কস্তুরাবার ঘরে। কস্তুরাবা তখন ছিলেন রান্না ঘরে। মীরা রান্না ঘরের চৌকাঠ পার হননি। বাইরেই দাঁড়িয়েছিলেন। কস্তুরাবা মীরার আপাদমস্তক অবলোকন করলেন। পায়ে যে জুতো রয়েছে তা ও তাঁর নজরে এলো। গান্ধীজি জিনিসটা বুঝতে পারলেন। মীরাকে বললেন সে যেন তার জুতো জোড়া বাইরে খুলে রেখে আসে। গান্ধী তাঁকে আরও বললেন ভারতীয় হিন্দুরা

রান্না ঘরে জুতো নিয়ে ঢুকে না। দ্বিতীয়ত কোন গুরুজনের ঘরে জুতো পরে ঢোকা রীতি বিরুদ্ধ। মীরা জিনিসটা বুঝতে পেরে লজ্জা পেলেন। বাইরে গিয়ে জুতো জোড়া খুলে রাখলেন। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য তিনি কস্তুরাবার কাছে ক্ষমা ভিক্ষে করলেন। গান্ধীর নির্দেশে মীরার খাবার ব্যবস্থা হল কস্তুরাবার সঙ্গে। মীরা কয়েকদিন সেখানে খেলেন। তারপর গান্ধীজিকে অনুরোধ করলেন তাঁকে যেন অন্যান্য আশ্রমবাসীদের সঙ্গে খাবার সুযোগ দেওয়া হয়। গান্ধী সম্মত হলেন।

এরপর গান্ধীজির নির্দেশে মীরা চরকায় সুতো কাটা শিখতে লাগলেন। তুলসী মাহার ছিলেন তাঁর শিক্ষক। তুলসী মাহার নেপালের লোক। ইংরেজি জানেন না। মীরা প্রথমে তাঁর সঙ্গে উর্দুতে কথা বলতে চাইলেন। তুলসীমাহার উর্দুও জানেন না। গান্ধীজি মীরাকে হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষা ভালো করে আয়ত্ত করার নির্দেশ দিলেন। উত্তরপ্রদেশের অধিবাসী পণ্ডিত 'সুরেন্দ্রজী'কে বলে দিলেন মীরাকে হিন্দীও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিতে।

অল্প সময়ের মধ্যে মীরা হিন্দীও সংস্কৃত ভাষা রপ্ত করে ফেললেন। আগেও লণ্ডনে থাকতে তিনি এই ভাষাদু'টি কিছু কিছু শিখেছিলেন। মীরা এবার মনোযোগ দিয়ে চরকায় সুতো কাটা শিখতে লাগলেন। তুলসী মাহারের কাছে। পোক্ত হয়ে গেলেন এই কাজে।

এবার গান্ধীর নির্দেশে মীরা আশ্রমের সাফাই কাজে হাত লাগালেন। পায়খানা পরিষ্কার করা, ঘর ঝাড় দেওয়া প্রভৃতি কাজে তিনি পারদর্শীতা লাভ করলেন। আশ্রমে একজন চাইনিজ সদস্যা ছিলেন। গান্ধীজি তাঁর নামকরণ করেছিলেন শান্তি। শান্তি ভালো ইংরেজি জানতেন। তাই মীরার পক্ষে শান্তির সঙ্গে মিশতে অসুবিধে হতো না। সকাল চারটার সময় মীরার ঘুম ভাঙ্গতো। তারপর শুরু হতো মীরার কাজকর্ম। প্রার্থনা সভা আরম্ভ হতো সকাল ৪-৩০ মিনিটে। মীরার ভালোভাবে কেটে যাচ্ছিল এ জীবন।

তবে অত্যাধিক পরিশ্রম তাঁর শরীরটাকে খানিকটা দুর্বল করে দিয়েছিল। মীরা আশ্রমের খাবার সহ্য করতে পারতেন না। মোটা রুটি খেয়ে তাঁর পেটের গোলমাল দেখা দিল। মীরা তাই নিজের হাতে পাতলা করে রুটি করতেন। সেও কাঠের উনুনে। তবুও তিনি প্রভূত আনন্দ পেতেন। নিজে রান্না করে খাওয়াতে তাঁর পেটের গোলমাল কিছুটা কমলো।

আশ্রমবাসীদের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকজন ছিল তাদের মধ্যে মনের মিল ছিল না। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত হতো। গান্ধীকে তাদের এ সমস্ত সমস্যা সমাধানে হস্তক্ষেপ করতে হতো। সব সময় তাঁর পক্ষে তাঁদের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হতোনা। মীরা আশ্রমে আসাতে গান্ধী তাঁর একজন অতি বিশ্বাসী লোক পেলেন।

মীরা কিন্তু আশ্রমের দৈনন্দিন পরিবেশ দেখে মনে মনে খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। তিনি গান্ধীকে গিয়ে সবই বলতেন। আশ্রমের কিছু ছেলে একদিন তাদের যৌন-কামনা বাসনা চরিতার্থ করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়ল। অনেক মেয়ের মধ্যেও রয়েছে কুৎসিৎ মানসিকতা। গান্ধী বোর্ডের সদস্যদের নিয়ে মিটিং ডাকলেন। আশ্রমের পরিবেশ সুন্দর করে তোলার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। কিন্তু বৃথাই তাঁর চেষ্টা।

উপায়ান্তর না দেখে গান্ধী অনশন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অনশন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল আগের দিন রাতের প্রার্থনাসভাতে। বাপু অনশন আরম্ভ করলেন। বাপুর শরীর দু' দিনেই

ভেঙ্গে গেল। তবে প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে বাপু স্থির হয়ে বসলেন। তৃতীয় দিনে তাঁকে যেন একটু উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল।

এ সমস্ত দেখে মীরার মন যেন থমকে দাঁড়াল। কি পবিত্র মন নিয়ে তিনি এসেছিলেন সবরমতিতে। আর এখন কি দেখতে পাচ্ছেন। এ সমস্ত বিষয় চিন্তা করে মীরা ক্লান্ত। মীরা যেন স্নায়বিক দুর্বলতায় ভুগতে লাগলেন। এ পরিবেশে তিনি নিজেকে খাপখাওয়াতে পারছিলেন না।

মীরা আতঙ্কিত। তবে মীরার অনুরোধে-ও পরিস্থিতির চাপে গান্ধীজি অনশন ভঙ্গ করলেন। বিনোবাভাবেজীর ব্রহ্মচর্য আশ্রম ছিল ওয়ার্ধাতে। সেটা ছিল গান্ধীজির সন্ন্যাসজীবনের আশ্রয়স্থল।

সেবার কংগ্রেস অধিবেশন বসার স্থান স্থির হল কানপুরে। গান্ধীজি কানপুর অধিবেশনে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। মীরা কিন্তু গান্ধী ভিন্ন সবরমতি আশ্রমে থাকতে নারাজ। অনেকভাবে তিনি গান্ধীজিকে বুঝালেন। তাঁর সঙ্গে কানপুর কংগ্রেসে যোগদিতে যাবেন স্থির করলেন। গান্ধীজি সম্মতি দিলেন। মীরা চলেছেন গান্ধীজির সঙ্গে ট্রেনযোগে কানপুরে। কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে। প্রতি স্টেশনে গান্ধীজিকে দেখার জন্য বিপুল লোক সমাগম হতে লাগল। মীরা স্তম্ভিত। বিস্ময়ে হতবাক। জনগণ যেন গান্ধীকে ভগবান জ্ঞানে পূজো করতে লাগল।

কানপুর কংগ্রেসে গান্ধীজি ছিলেন সভাপতি। মীরাবেন ও মহাদেব দেশাই গান্ধীজির সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। প্রকাশ্য অধিবেশনের সিদ্ধান্ত লেখার দায়িত্ব পড়েছিল মীরা বেন-এর উপর। মীরা বেন তাঁর কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা করলেন। প্রকাশ্য অধিবেশন শেষে গান্ধী, মীরাবেন, মহাদেব দেশাই প্রমুখ ফিরলেন সবরমতি আশ্রমে। অন্য সময় হলে গান্ধীজি হয়ত ভ্রমনে বের হতেন। এবার কিন্তু চলে এলেন সবরমতিতে।

মীরার পক্ষে সবরমতি আশ্রমে থাকা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠলো। তবুও বাপুর টানে সবরমতি আশ্রম ছাড়তে পারলেন না। মীরা আশ্রমে শাড়ি পরে থাকতেন। গান্ধীজির নির্দেশে তিনি সাদা শাড়িই পরতেন। গান্ধীজি মীরাকে ব্রহ্মচর্যমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। নিজের হাতেই তিনি মীরার এক গোছা চুল কেটে দিলেন। মীরা ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত। গান্ধীজি তাঁকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। মীরা এখন আশ্রমে যোগিনী। খাবার দাবার ব্যাপারে মীরার একটু অসুবিধে হচ্ছিল। অবশ্য তিনি নিজের হাতে রান্না করে খেতেন।

এ সময় মীরার সঙ্গে পরিচয় হয় অনসূয়া বেন এর। অনুসূয়া অম্বরলাল সরাবাই এর বোন। অম্বরলাল একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি। অনেক কাপড়ের কলের মালিক।

এই সময় সবরমতিতে এলেন সি. এফ. এন্ড্রুজ। পরম গান্ধীভক্ত। গান্ধী সি. এফ. এন্ড্রুজকে হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষা শেখার পরামর্শ দিলেন। এই দু'টি ভাষা শিক্ষা দেবার দায়িত্ব পড়ল মীরা বেন-এর উপর।

মীরাবেন নিষ্ঠাসহকারে এই দায়িত্ব পালন করতে উৎসুক ছিলেন। এন্ড্রুজ কোন মতে ভাষা দু'টি আয়ত্ত করলেন, মীরা এন্ড্রুজকে চরকায় সুতো কাটাও শেখাতে লাগালেন। এন্ড্রুজ ধীরে ধীরে চরকায় সুতো কাটা শিখলেন।

গান্ধীজির আমাশার ধাত ছিল। তিনি বেশ কিছুদিন আমাশা রোগে কষ্ট পেতে

লাগলেন। ডাক্তার ঔষধ দিলেন। পরামর্শ দিলেন ছাগলের দুধ খেতে। গান্ধীজি প্রথমে অনীহা প্রকাশ করলেন।

গান্ধীজি আশ্রমের সকলকে নির্দেশ দিলেন আশ্রমের কাঁচা শাক-সব্জি ও ফল ইত্যাদি খেতে। তিনি নিজেই কাঁচা শাক-সব্জি ও ফল খেয়ে জীবন ধারণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। মীরা বেনও গান্ধীজির পথ ধরলেন। দু' একদিন খাবারপর তাঁদের দেখা দিল পেটের রোগ।

গান্ধীজির খেয়ালিপনায় মীরা বেন বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। গান্ধী নিজেও। কাঁচা শাকসব্জি ও ফল খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু মীরা বেন-এর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেল। গান্ধীজি ছাগলের দুধের দই খেতে আরম্ভ করলেন। প্রাণে বেঁচে গেলেন। তারপর চেষ্টা করলেন আশ্রমবাসীদের জন্য রুটি তৈরি করার শর্ট-কাট একটা পদ্ধতি বের করতে। ছোটলালজিকে পাঠানো হলো কাছের একটা বেকারিতে। বেশি রুটি যাতে একসঙ্গে করা যায় তার পদ্ধতি শিখে আসতে। গান্ধীজির নির্দেশে ছোটোলালজি যথারীতি সেখানে গেলেন। অবশ্য কাজের কাজ কিছুই হলো না।

গান্ধীজির এরকম খেয়ালিপনা মীরাবেনের কাছেও অদ্ভুত ঠেকল। সত্যের পূজারি তিনি। তাঁর এ সমস্ত কাজের সমালোচনা করা অনেকের কাছে হয়ত যুক্তিযুক্ত মনে হবে না। তবে যা সত্যি তাকে ত অস্বীকার করা যায় না। মীরাবেন বুঝতে পারলেন গান্ধীজিই হচ্ছেন কংগ্রেস-এর প্রধান। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য সবরমতিতে আসেন কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ। সর্দার প্যাটেল, আজাদ, গোবিন্দবল্লভ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ। বলা যায় গান্ধীজি ছিলেন কংগ্রেসের প্রাণপুরুষ।

তিন

এ সময় হঠাৎ একদিন খবর এলো লন্ডনে তাঁর বাবার মৃত্যু ঘটেছে। মার তারবার্তা মীরাকে কিছু সময়ের জন্য বিচলিত করল। মীরা দিদি রোহনার চিঠি পেলেন মাদ্রাজ থেকে। রোহনা লিখেছেন তিনি ও তাঁর স্বামী হ্যারল্ড ভারনন, আই. সি. এস যাচ্ছেন লন্ডনে মার কাছে। মীরাকেও তাঁদের সঙ্গে যেতে অনুরোধ করলেন। মীরা গান্ধীর অনুমতি নিতে গেলেন মাদ্রাজে। রোহনার সঙ্গে কথা হলো। কথা হলো রোহনার স্বামীর সঙ্গেও। তিনি তখন মাদ্রাজের জেলাশাসক। মীরা বললেন তাঁর পক্ষে লন্ডন যাওয়া সম্ভব হবে না। নিবেদিত প্রাণ মীরা ভারতের জন্য যেন আত্মত্যাগের সংকল্পে অটল। বাবার মৃত্যু সংবাদও যেন তাঁর কাছে বিশেষ কোন ঘটনা নয়।

মীরা মাদ্রাজ থেকে সবরমতিতে ফিরে এলেন। রোহনা ও তাঁর স্বামী চললেন লন্ডনে। এ সময় গান্ধীজি তাঁর এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ। বইখানা লিখছেন। তবে গুজরাতি ভাষায়। তা সেখানকার কাগজে প্রকাশিত হতে লাগল ধারাবাহিক ভাবে। সেক্রেটারী মহাদেব দেশাইকে তার ইংরাজী তর্জমা করার জন্য অনুরোধ করলেন গান্ধীজি। মহাদেবদেশাই-এর ইংরেজি তর্জমা আবার মীরাবেন দেখে দিতেন। কেন না মীরাবেন-এর ইংরেজি ভাষার উপর দখল ছিল মহাদেবের থেকে বেশি।

গান্ধীজি এবার যাচ্ছেন ভারত ভ্রমণে। বিভিন্ন জায়গায় সংগঠনের কাজে। সঙ্গে যাচ্ছেন

মহাদেব দেশাই ও পিয়ারীলালজী। পিয়ারীলালজী ছিলেন পাঞ্জাবী। মীরাকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন না। মীরা কিন্তু একাকিনী সবরমতিতে থাকতে অনীহা প্রকাশ করলেন। গান্ধীজি তাঁকে কিছুদিনের জন্য দিল্লী যেতে নির্দেশ দিলেন। সেখানে মীরার থাকার জন্য ব্যবস্থা করে দেওয়া হলো কন্যাগুরুকূল আশ্রমে।

এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। তিনিই আর্যসমাজের একজন তাত্ত্বিক নেতা। স্বয়ং সেবক সংঘের অন্যতম কর্মকর্তা ও নেতা। এই আশ্রমের সদস্য-সদস্যা সকলেই আর্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত। সেখানকার এক কর্মকর্তা মীরাকে নিয়ে গেলেন শ্রদ্ধানন্দের ঘরে। তিনিই তখন আশ্রমের সব কিছুর দায়িত্বে। শ্রদ্ধানন্দের অপূর্ব দেহ। অপরূপ মুখাবয়ব দেখে মনে হবে ভগবানের আশীর্বাদপুষ্ট দিব্যজ্যোতি সম্পন্ন মহাপুরুষ। মীরা তন্ময় হয়ে তাঁর মুখপানে চেয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ কাটলো এভাবে। স্বামীজি মিষ্টি ভাষায় মীরার কাছে গান্ধী সম্পর্কে জানতে চাইলেন।

গান্ধী সম্পর্কে মীরা মোটামুটি স্বামীজিকে বললেন। স্বামীজি জিজ্ঞেস করলেন তাঁর আশ্রমে মীরার কোন অসুবিধে হচ্ছে না ত। মীরা জবাবে তাঁকে জানালেন তিনি ভালই আছেন। এভাবে কন্যাগুরুকূল আশ্রমে মীরার দিন কেটে যাচ্ছিল।

একদিন তিনি তাঁর ঘরে বসে কি একটা হিন্দী বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। হিন্দী সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান পরখ করে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ বাইরের কোলাহলে মীরা যেন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। জানতে পারলেন 'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ'জিকে এক আততায়ী হত্যা করেছে।

সমস্ত আশ্রম যেন উত্তেজনায় কাঁপছে। এমনকি আশ্রমের মহিলা সদস্যারাও অসিহস্তে মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের উপর এ মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে উদ্যত। মীরা ত ভীত সন্ত্রস্ত। তদুপরি তিনি খাঁটি ইংরেজ। মীরার মনে তাঁর বাবার কথা উদিত হতে লাগল। তিনি মীরাকে বলেছেন যে মীরা খাঁটি ইংরেজ। আর ভারতে চলছে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন। অতএব মীরা যেন খুবই সাবধানে থাকেন ভারতে। সত্যি বাবার কথাই যেন তাঁর বারে বারে মনে জাগল।

তবে আশ্রমের অধিবাসীরা মীরাকে নিজেদের পরম আত্মীয়জ্ঞানে গ্রহণ করেছে। তারউপর তাদের বিন্দুমাত্র অনুযোগ নেই। শ্রদ্ধানন্দের মরদেহ আনা হয়েছে তাঁরই বাসভবনে। হিন্দুরা দলে দলে শ্রদ্ধানন্দের মরদেহকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে যাচ্ছে। আশ্রমের মহিলারাও ছুটছেন সেখানে। তারা মীরাকে সঙ্গে নিয়ে চলল।

মীরা দেখলেন লোকে লোকারণ্য। ঘোড়ার পিঠে পুলিশবাহিনী কোনরকমে তাদের সামলাচ্ছে। মীরাকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকজন আশ্রমবাসী শ্রদ্ধানন্দের মরদেহ দেখার জন্য গেল। মরদেহ রাখা হয়েছে বাইরে। যাতে ভক্তবৃন্দের তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে অসুবিধা না হয়।

তখন আশ্রমবাসীদের মাথার ঠিক নেই। হিন্দুধর্মের সহিষ্ণুতা তাদের মন থেকে তিরোহিত। প্রতিশোধ নেবার জন্য যেন তাদের শরীর থর্ থর্ করে কাঁপছে।

মীরা গান্ধীকে সমস্ত অবস্থা জানিয়ে চিঠি দিলেন। এবং তিনি গান্ধীজিকে লিখলেন যে তিনি অন্যত্র চলে যেতে চান। জায়গাটা হরিদ্বারের সন্নিকটে। নাম 'গুরুকুল কাংরী'। এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতাও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। মীরা শুনেছেন এখানাকার জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব। গান্ধী যথারীতি গুরুকূল কাংরীতে যাবার জন্য অনুমতি দিলেন মীরাকে।

আর সেখানকার কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে মীরার যাতে সেইখানে কোনরূপ অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে। এখানে রয়েছে গ্রাম্যপরিবেশ। পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা কম। সরলপ্রাণ লোকদের বাস সেইখানে। প্রকৃতির অপরূপ মাধুর্যে ভরা গুরুকুল কাংরী।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে সবরমতির পরিবেশ ক্রমশই নোংরা হয়ে আসছিল। সেখানকার আশ্রমিকদের মধ্যে অনেকরই মন কলুষতায় পূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। গান্ধীজি আশ্রমিকদের দ্বন্দ্ব সংঘাত সামলাতে না পেরে অনশন আরম্ভ করেদিলেন। কিন্তু বিশেষ কোন লাভ হলো না।

সবরমতির আশেপাশে তৈরি হচ্ছিল প্রচুর বড় বড় কারখানা। ফলে কলকাখানার বিষাক্ত ধোঁয়া আকাশ বাতাসকে কলুষিত করছিল। কলকারখানার আবর্জনা মিশ্রিত জলীয় পদার্থ সবরমতির জলকে করছিল দূষিত। সেই দিক থেকে গুরুকুলকাংরী ছিল মীরার মনের মতন জায়গা। গ্রাম্যপরিবেশ, আশ্রমের পরিবেশ আর প্রাকৃতিক পরিবেশ।

গুরুকুল কাংরীতে মীরার জন্য অতিথিশালায় থাকার ব্যবস্থা হল। তিনি এসেছিলেন জানুয়ারিতে। বেশ আনন্দেই তাঁর দিন কাটছিল। হিন্দীটাকে আরও পোক্ত করে নিচ্ছিলেন। গ্রামে ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা করানোর দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করলেন। তারা যেন তাঁর ছোট ছোট ভাই বোন। দুঃস্থ অসহায় ছেলেমেয়েদের উপর তাঁর নজর ছিল অধিক। এইভাবেই মীরার জীবন চলছিল এখানে।

এর মধ্যে খবর এলো গান্ধীজি আসছেন গুরুকুল কাংরী পরিদর্শনে মার্চ মাসে। মীরার সে কি আনন্দ। কতদিন তাঁকে দেখেননি। এবার নিশ্চিত তাঁর সঙ্গে আলোচনার সুযোগ হবে। যথা সময়ে গান্ধী এলেন। দু' তিন দিন পর চলে গেলেন। গান্ধী ব্যস্ত তাঁর কাজ নিয়ে। আশ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা, দেশের বিভিন্ন সমস্যা সবই যেন তাঁর মাথায় ঘুরছে। মীরা যে সেখানে আছেন সেই ব্যপারে গান্ধীর কোন যেন হুঁস নেই। মীরা নিজে থেকে গিয়েও গান্ধীর সঙ্গে কথা বলতে নারাজ। অথচ গান্ধীও মীরাকে ডাকলেন না।

বেশ কয়েকদিন এভাবে কেটে গেল। একদিন মীরা একটি বাগানে ঝোঁপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দূর থেকে গান্ধীজিকে দেখছেন আর কাঁদছেন। কয়েকজন গান্ধীভক্ত তা লক্ষ্য করল। মীরার কাছে তারা গেল। কি ব্যাপারে তাঁর মনের এই অবস্থা তারা জানতে চাইল। মীরা কোন উত্তর দিল না। এ ঘটনাটা গান্ধীর কানে গেল। তিনি সব অনুধাবন করলেন। মীরাকে কাছে ডাকলেন। সব বুঝলেন। মীরা যেন বুঝেও বুঝে না। অভিমানে তাঁর মুখ ভারাক্রান্ত।

গান্ধীজি তাঁকে শান্ত করলেন। স্নেহের সুরে তাঁকে অনেক কথাই বললেন। তঁআকে আরও জানালেন যে এরপরও তাঁকে সঙ্গে নীয়ে গান্ধী যাবেন না। মীরাকে যেতে হবে আরও দূরে। রাজস্থানে। মীরা চিন্তাক্লিষ্ট। গান্ধী তাঁকে বুঝালেন। গান্ধীর ইচ্ছে মীরাকে একজন যথার্থ নারী হিসেবে গড়ে তোলা। মীরা যেন বুঝেও বোঝে না। তিনি মর্মাহত। একাকিনী তাঁকে যেতে হচ্ছে রাজস্থানে।

গুরুকুল কাংরী থেকে মীরা, গান্ধীজি, মহাদেব দেশাই, পিয়ারীলালজী ও যমন লাল প্রমুখ একই ট্রেনে রওনা দিলেন। তবে মীরার গন্তব্যস্থল রাজস্থান, আর অন্যান্যদের সঙ্গে গান্ধী চলেছেন ভারতভ্রমণে। বেশ কিছু জায়গা ঘুরে তিনি যাবেন নান্দী হিলস-এ। বিশ্রামের জন্য।

একই ট্রেনে যাত্রা শুরু গান্ধীসহ। মাঝপথে বগি গেল পাল্টে। মীরা চলেছেন রাজস্থানে। 'ভগবৎভক্তি আশ্রমে' একাকিনী। বিষাদে তাঁর মন ভারাক্রান্ত। কিন্তু গান্ধীর নির্দেশের অবাধ্য হবার ক্ষমতা তাঁর নেই। যথা সময়ে মীরা রাজস্থানে গিয়ে পৌঁছালো। আশ্রমের মহারাজ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন। মীরার কাজ যথা নিয়মে চলতে লাগল। চলতে লাগল ভজন পূজন, সঙ্গে হিন্দিতে পোক্ত হবার তালিম।

রাজস্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং আশ্রমের পরিবেশ তাঁর ভালোই লাগছিল। তবে তিনি বুঝতে পারলেন সামনে গ্রীষ্মকালে অত্যাধিক গরমে তাঁর কষ্ট হবে খুবই। এ সমস্ত চিন্তার সঙ্গে জড়িত রয়েছে গান্ধীর চিন্তা। হঠাৎ মহাদেব দেশাই এর ছোট এক চিঠিতে মীরা জানতে পারলেন গান্ধীজি উচ্চরক্তচাপে শয্যাশায়ী।

মহাদেব দেশাই লিখেছেন গান্ধীজিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নান্দী হিলস-এ। সেখান থেকে প্রয়োজনবোধে বাঙ্গালোরে নিয়ে যাওয়া হবে। মীরার মনকে কোন এক অজানা ভীতিতে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মীরা ক্লান্ত। তিনদিন তাঁর চোখে ঘুম পর্যন্ত বন্ধ। গান্ধী চিন্তাতেই তিনি আচ্ছন্ন।

মীরা জানতে পারলেন গান্ধীজি বাঙ্গালোরে আছেন। রাজস্থান থেকে নিয়মিত চিঠি পাঠাতে লাগলেন মীরা গান্ধীজির কুশলপ্রার্থনা করে। একটি চিঠিতে মীরা গান্ধীজিকে রম্যাঁরঁলার লেখা বিটোফেন এর বইখানার কথা উল্লেখ করলেন। সেই বই থেকে কিছু অংশ তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করে গান্ধীজিকে পাঠালেন। গান্ধীজি মীরার চিঠি পেয়ে আনন্দ অনুভব করলেন।

১৯২৭। ১৩ ই এপ্রিল। গান্ধীর উপোসের দিন। সেদিনই তিনি মীরাকে একটি চিঠি লিখলেন। গান্ধী লিখলেন। "আজ আমার উপোসের দিন। তোমার চিঠিখানা পেয়েছি। তুমি বিটোফেনের উপর রম্যাঁরলাঁর বই থেকে যে উদ্ধৃতিটা পাঠিয়েছ তা প্রাণধান যোগ্য। সেটা আধ্যাত্মিক জগতের প্রিয় বস্তু। আমি তোমাকে গান বাজনা ভুলে যেতে বলছি না বা গান বাজনা সম্পর্কে তোমার রুচির পরিবর্তন হোক তাও চাই না। বিটোফেনের উপর তোমার এরকম গভীর শ্রদ্ধার জন্য তুমি রলাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আর রলাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলে বিটোফেনের পঞ্চম সিম্পনি সম্পর্কে আলোচনা করতে। এবং তা রলাঁব বাজনার মধ্যে শুনতে। পরোক্ষভাবে রঁলার মাধ্যমেই তুমি আমার কথা জেনেছ। আমায় চিঠি দিয়েছ। আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা জেগেছে রলাঁর লেখা থেকে। সেই লেখাই তোমাকে আমার সান্নিধ্যে আসার জন্য প্রেরনা দিয়েছে। তুমি আমার কন্যাসম। একান্ত অনুগতা। এটা হয়ত ভগবানেরই অভিপ্রেত। ঘটনাচক্রে তুমি আমার একান্ত অনুরক্ত ভক্তে পরিণত হয়েছ।"

মহাত্মার চিঠি মীরাকে চঞ্চল করে তুর্লল। এর মধ্যে মীরা ভগবৎভক্তি আশ্রমে নিজেকে বেশ খাপখাইয়ে নিয়েছে। মীরার আগ্রহ দিন দিন বেড়ে চলল। আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত বিশাল এক জায়গা জুড়ে। সমস্ত আশ্রমটিকে ঘিরে রেখেছে নিমগাছের সারি।

একদিন এক ঘটনা মীরার মনকে আশ্রমের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হতে বাধ্য করল। মীরা নিজের মনে আশ্রমে পড়াশুনায় ব্যস্ত। এমন সময় কয়েকজন আবাসিক এসে মীরাকে ভাঙ্গ খাবার প্রস্তাব দিল। মীরা ত বিস্মিত ওদের সাহস দেখে। নিজেরা ভাঙ্গ খেতে অভ্যস্ত। এরকম পরিবেশ মীরার কল্পনার বাইরে। মীরা বুঝতে পারলেন এই পরিবেশে তাঁর পক্ষে

বেশিদিন এই আশ্রমে থাকা যুক্তিযুক্ত হবে না। মীরা সব জানিয়ে বাপুকে চিঠি দিলেন। বাপু বিস্মিত। ক্ষোভের সঙ্গে তিনি যমন লালকে চিঠি লিখলেন। যমন লাল এব্যাপারে কথা বলার জন্য আশ্রমের অধিকর্তার কাছে ছুটলেন। গোটা পরিস্থিতি একটা জটিল আকার ধারণ করল। আশ্রমে ভাঙ্গ খাওয়া নিষিদ্ধ হল।

তবে মীরা এই আশ্রমে থেকে ওয়ার্ধাতে বিনোবাজীর আশ্রমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। গান্ধীজিকে এ ব্যাপারে লিখলেন। তিনি সম্মত হলেন। মীরা চলে এলেন। ওয়ার্ধাতে।

ওয়ার্ধা আশ্রমে মীরার দিন কেটে যাচ্ছিল ভালোভাবেই। কাজ কর্মের মধ্যে তিনি ডুবে থাকতেন। কিন্তু তিনি ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যা নিলেন। ১০৫° পর্যন্ত জ্বর উঠল। প্রায় প্রতি বছরই মীরাকে এ রোগে বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হতো।

ঔষধ খেয়ে মীরা সুস্থ হয়ে উঠলেন। গান্ধীজি মীরাকে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে বললেন। চলে যেতে নির্দেশ দিলেন পুনাতে। সব ব্যবস্থা হলো। গান্ধীজি তখন দক্ষিণভারতে ভ্রমণরত। মানুষের অস্বাভাবিক ভিড় প্রতি ট্রেনে। গান্ধীকে দেখার জন্য উৎসুক জনতা। গান্ধী তাদের শ্রদ্ধার ভারে ক্লান্ত। এত লোকের শ্রদ্ধা দেহমন যেন গ্রহণ করতে অপারগ। তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

মীরার কাছে অবিলম্বে এখবর পৌঁছে গেল। মীরা চিন্তিত। পুনা না গিয়ে তিনি সোজা ছুটলেন গান্ধীর কাছে। গান্ধী তাঁকে দেখে ক্ষিপ্ত। তিনি মীরাকে তাঁর মনের কথা বললেন। এবং বললেন গত রাতে তিনি মীরাকে স্বপ্নে দেখেছেন। মীরাকে অনেক বকলেন। তাঁকে সবরমতি আশ্রমে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। মীরা তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। মীরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন। এর পর তিনি আর গান্ধীর নির্দেশ ছাড়া কোন কাজ করবেন না-তা তাঁকে জানিয়ে দিলেন। মীরা ফিরে এলেন সবরমতিতে। নিজের কাজকর্মে মন দিলেন। দিন যেতে লাগল। প্রচুর কাজকর্মের মধ্যেই তিনি ডুবে থাকতেন। গান্ধী চাইতেন মীরা যেন নিজেকে গড়ে তুলেন অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে।

মীরা এর মধ্যে খবর পেলেন গান্ধী এখন সুস্থ। চলেছেন সিংহলে। সেখানে কিছুদিন থাকবেন। ফিরে তিনি সবরমতি আশ্রমে আসবেন। তখন ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে জোর কদমে। বাংলা পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র প্রমুখ অগ্নিগর্ভ। গান্ধীর সঙ্গে কংগ্রেসের নেতাদের ক্রমাগত চলতে লাগল আলোচনা। কোন্ পথে আন্দোলন চালানো যাবে তা নিয়েই চিন্তাভাবনা। সিংহলে বেশিদিন ছিলেন না। ফিরে সবরমতি আশ্রমে এলেন।

এর মধ্যে আশ্রমে ঘটে গেল এক অদ্ভুত কাণ্ড। আশ্রমে একটি গাভি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ল। গাভি থেকে প্রচুর দুধ পাওয়া যেত আশ্রমে। অনেক চেষ্টা করেও গাভিটিকে সুস্থ করা গেল না। সব চিকিৎসা বিফল। কিন্তু গাভিটির কষ্ট চোখে দেখা যায়না। গান্ধী স্বচক্ষে গাভিটির কষ্ট দেখে স্থির থাকতে পারতেন না। গাভিটি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করত প্রতিনিয়ত। গান্ধী প্রার্থনা করলেন গাভিটির যেন অচিরেই মৃত্যু ঘটে। কিছুতেই কিছু হলো না। গান্ধী কয়েকজন আশ্রমবাসীর সঙ্গে আলোচনা করলেন। মীরার সঙ্গে পরামর্শ করলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন গাভিটিকে বিষপূর্ণ ইন্‌জেকশন দিয়ে মেরে ফেলার জন্য ডাক্তারকে নির্দেশ দেবেন। গান্ধীর বিপরীত মতাবলম্বী আশ্রমের কিছু লোক গান্ধীর এই মনোভাব মেনে নিলেন না। ফলে গান্ধীর সঙ্গে তাদের মানসিক সংঘাত উপস্থিত।

মীরা জিনিসটা লক্ষ্য করলেন। গান্ধী কয়েকদিন চুপচাপ থাকলেন, বেশ কিছুদিন চলে গেলো। কিন্তু গাভিটির কষ্ট চলতে লাগল। গান্ধীর মতের বিরুদ্ধে যারা কথা বলেছিল তারাও ভাবল গাভিটিকে মেরে ফেলা উচিত। তার এতকষ্ট চোখে দেখা যায় না। তারা গান্ধীকে তাদের মনোভাব জানিয়ে দিল।

গান্ধী মীরাকে ডাকলেন। অন্যান্যরাও এলো। গান্ধী ও অন্যান্যরা গাভিটির পা চেপে 'ধরল। ডাক্তার বিষ ভর্তি করল সিরিঞ্জে। সিরিঞ্জ পুশ করা হলো গাভিটির দেহে। ধীরে ধীরে গাভিটি নিস্তেজ হয়ে গেল। সমস্ত কষ্টের হলো লাঘব। গান্ধী 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় এনিয়ে একটা কবিতা লিখলেন

"The path way of love is the ordeal of fire,
The shrinkers turn away from it.
The way of the Lord is meaut for heroes,
Not for cowards."

এ ব্যাপারে গান্ধীকে অনেকেই কঠোর সমালোচনা করলেন। গান্ধী কিন্তু নির্বিকার। তিনি যা সত্য বলে বুঝেছেন তাই করেছেন। গান্ধী মীরাকে লিখলেন গাভিটিকে মেরে ফেলে মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে মুক্ত করেছেন তিনি। এই কাজের সমালোচনা হচ্ছে। তবে এটার একটা ভালো দিক্ হলো মানুষকে এ বিষয়ে চিন্তা করার খোরাক জুগিয়েছে। মানুষ ভাবুক। বলুক। আমার কাজটি ভালো হয়েছে-না খারাপ হয়েছে।

চার

মীরা এবার বিহারে যাবার জন্য উৎসুক। বিহারের গ্রামে কাজ করার স্পৃহা তাঁর প্রবল। হিন্দিতে এখন পোক্ত। গান্ধীজির অনুমতি চাইলেন। গান্ধী তাঁকে রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দিলেন। গান্ধী রাজেন্দ্রপ্রসাদকে মীরা সম্পর্কে অবহিত করে রেখেছেন। মীরা ছুটলেন বিহারে। রাজেন্দ্র প্রসাদের সান্নিধ্যে যাবার জন্য তিনি এখন উম্মুখ।

মীরা এসে পড়লেন উত্তর বিহারের মধুবণীতে। এখানে রয়েছে অল ইন্ডিয়া স্পিনারস অ্যাসোসিয়েশনের সেন্টার। মীরা সেখানে গেলেন। মীরাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে খাদির ব্যাপক প্রচারের ও প্রসারের। তিনি স্থির করলেন গ্রামে গিয়ে তিনি বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে খাদির প্রসারের জন্য পরিকল্পনা নেবেন। তিনি উত্তর বিহারের মধুবণীর নিকট আরও কয়েকটি গ্রামে গেলেন। দেখলেন অনেকের ঘরেই রয়েছে চরকা। সুতো কাটায় তারা যথেষ্ট অভিজ্ঞ। এতদিন গান্ধীর নির্দেশে চরকায় সুতো কেটেছেন স্বয়ং মীরা। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন প্রচুর।

তিনি মধুবনীর সন্নিকটে অনেক গ্রাম ঘুরে স্থির করলেন ছাতাওয়ান নামক একটি গ্রাম থেকে তিনি তাঁর কাজ আরম্ভ করবেন। এই গ্রামের প্রতিটি ঘরেই রয়েছে চরকা। বিহারে এ সমস্ত কাজের জন্য লোকের অভাব হতো না তখন। বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ ছিলেন তখন উত্তর বিহারের একজন জননায়ক। তিনি ছিলেন অল ইন্ডিয়া স্পিনারস এসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক। খুবই ভালো লোক। মীরা তাঁর স্মরণাপন্ন হলেন।

মীরাকে তিনি রামদেববাবু নামক একজন কর্মঠ ও শৃঙ্খলা পরায়ণ যুবককে দিলেন।

রামদেববাবুর সাহায্যে মীরা বেশ কিছু কর্মঠ যুবক সংগ্রহ করলেন। এদের নিয়ে তিনি তৈরি করলেন একটা দল। বলাচলে সমাজ সেবার দল। রাজেন্দ্র প্রসাদের কাজকর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল মুজাফ্‌ফরপুর।

মীরা মনের আনন্দে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। লোকের মধ্যে চরকায় সুতো কাটার হিড়িক পড়ে গেল। স্পিনারস এসোসিয়েশনে খাদি কাপড় তৈরির পরিমাণ ও বেড়ে যেতে লাগল ক্রমাগত। গ্রামবাসীদের মধ্যে খাদির ব্যবহারও বেড়ে যেতে লাগল। বলা চলে মীরার আগমনে ছাতাওয়ান গ্রামে যেন নূতন প্রাণের সঞ্চার হলো। মনে হতে লাগল এই গ্রামে যেন খাদি বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। মীরা মনে করতে লাগলেন তিনি যেন চাতাওয়ান গ্রামের মধ্যমণি এবং সব থেকে সুখী লোক অন্তত তখনকার মত।

গান্ধীজি মীরার প্রতিটি কাজকর্মের হিসেব নিতেন। মীরা গান্ধীজিকে তাঁর কাজকর্মের হিসেব পাঠাতেন নিয়মিত। গান্ধীজি তখন ভারত ভ্রমণে বের হয়েছেন। সেই সময় তিনি রাজস্থানে। মীরার চিঠি অবশ্য যথাসময়ে গান্ধীজির হাতে পৌঁছালো না। কেন না তিনি ত এক জায়গায় স্থির হয়ে বেশিদিন থাকতেন না। আজ এখানে কাল সেখানে এভাবে নিত্য নৈমিত্তিক তার ঠিকানা বদল হতো। গান্ধীজি অবশ্য তাঁর শত কাজের মধ্যেও মীরার কাছে সময়মত চিঠি পাঠাতে ভুলতেন না। সেই চিঠিতে তিনি মীরাকে বাস্তবধর্মী হবার উপদেশ ও নির্দেশ দিতেন। এভাবে মীরার দিন কাটছিল বিহারের ছাতাওয়ানা গ্রামে।

এ সময়ে এই গ্রামে হঠাৎ ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখাদিল। ম্যালেরিয়া মহামারির আকার ধারণ করল। লোকের ঘটল অকাল মৃত্যু। মীরা গ্রামবাসীদের সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। অত্যধিক পরিশ্রমে ও ম্যালিরিয়া রোগের ধাক্কায় মীরা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি ম্যালিরিয়ায় আক্রান্ত হলেন গুরুতরভাবে। তাঁর চলার শক্তি রহিত। তিনি শয্যা নিলেন। লোকের সেবা করতে গিয়ে নিজেই সে এখন শয্যাশায়ী ম্যালেরিয়া রোগে।

গান্ধীজি মীরার অবস্থা পরিজ্ঞাত হলেন। তিনি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে জানালেন মীরার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছুটলেন ছাতাওয়ানা গ্রামে। মীরার অবস্থা তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। তিনি ডাক্তার ডাকলেন। মীরার যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। বিহারের একটি স্বাস্থ্যকর স্থান গিরিডি। মীরা একটু সুস্থ হয়ে উঠলে রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁকে নিয়ে সেখানে চলে গেলেন। মীরা সুস্থ হয়ে উঠল।

ছাতাওয়ানাগ্রামেও ম্যালেরিয়ার প্রভাব কমল। তবুও গান্ধীজি রাজেন্দ্র প্রসাদকে লিখলেন তিনি যেন মীরাকে অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করে দেন। ছাতাওয়ানা গ্রামে আবার ম্যালিরিয়া আরম্ভ হলে মীরার জীবন সংশয় হতে পারে। এই ভাবনায় গান্ধীজি অস্থির।

পাঁচ

গ্রীষ্মকাল। প্রচন্ড গরম। গান্ধীজি চলেছেন হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলে। গ্রামে গ্রামে খাদির মহিমাপ্রচারের উদ্দ্যেশ্যে। মীরাকে তিনি তাঁর সঙ্গে নিলেন। বেশ কিছু গ্রাম ঘুরলেন। মীরাও উত্তর প্রদেশ ও হিমাচল প্রদেশের গ্রাম্য পরিবেশের সঙ্গে যেন একাত্মা হয়ে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন কোসানিতে। অপূর্ব সুন্দর জায়গা। পাহাড়ি

এলাকা। প্রকৃতি তার অপূর্ব রূপের ছটায় কোসানিকে ভরিয়ে দিয়েছে। কোসানির সূর্য্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরাই জানেন কোসানির প্রাকৃতিক শোভা কি অপরূপ। কোসানি গান্ধী আশ্রম থেকে সূর্য্যোদয়-এর সময় ত্রিশূল পাহাড় দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলাম, কি দেখেছি তার বর্ণনা দেওয়া দুষ্কর। সকালের সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের রশ্মি ত্রিশুল পাহাড়-এর চূড়ায় পড়ে-রূপো নয় যেন প্ল্যাটিনামের মত চকচক্ করছে। চোখ ফেরানো যায় না। নিঝুম পরিবেশে আমরা কয়েকজন দাঁড়িয়ে কোসানি পাহাড়ে। দূরে বহুদূরে ত্রিশূল-এর এই শোভা মাত্র কয়েক সেকেন্ড দেখেছিলাম। তাতেই যেন আমার ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেল। দার্জিলিং পাহাড় থেকে বা টাইগার হিল থেকেও সূর্য্যোদয় দেখেছি। কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়োর রূপালি রঙ দেখেছি। সারি সারি বরফ যেন প্ল্যাটিনামের পরিধান বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে নৃত্যরত। ত্রিশূল পাহাড়ের সূর্য্যোদয়ের দৃশ্য যেন কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপকেও হার মানায়।

গান্ধীজি কোসানিতে কাটালেন দশদিন। বেশিদিন থাকার সময় যে তাঁর নেই। সঙ্গে রয়েছেন সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই, পিয়ারী লাল ও আরও দু' চারজন লোক। গান্ধী'র খাওয়া দাওয়া, থাকা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উপর নজর রাখার দায়িত্বে রয়েছে মীরা স্বয়ং। মীরা নিজেই ছাগলের দুধ দোহাতেন। গান্ধীজির ফল, মধু, শাকসব্জী ইত্যাদি যাতে পরিচ্ছন্ন থাকে তার উপরও তীক্ষ্ণ নজর থাকত মীরার।

এক একটা গ্রামে এক একদিন প্রার্থনাসভা করতেন গান্ধীজি। গ্রামে লোকেরা ভিড় জমাতো। মন্ত্রমুগ্ধের মতন গান্ধীজির বক্তৃতা শুনতো। ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে যেতো গ্রামের আবালবৃদ্ধজনতা। সামর্থমত প্রত্যেকেই তাদের আর্থিক সাহায্য দিত গান্ধীজিকে। মীরা ও আর দু' একজন কাপড় লম্বা করে দু' দিক দিয়ে ধরে লোকের কাছে যেতো। কাপড়ের মধ্যে গ্রামের লোকজন তাদের দান সামগ্রী ঢেলে দিত।

অনেক সময় টাকা-পয়সা রূপো ও সোনা দানাতে কাপড় ভর্তি হয়ে যেতো। গ্রাম থেকে যে অর্থ সংগ্রহ হতো সেগুলো দিনের শেষে গোপন জায়গায় বসে গোনা হতো। তৈরি করা হতো বিভিন্ন সামগ্রীর তালিকা। তারপর সুযোগমত শহরে এসে ব্যাঙ্কে রাখার ব্যবস্থা হতো। এভাবে বেশ কিছুদিন চলল। গান্ধীজি স্থির করলেন মীরাকে নিজের মতন কাজ করতে বলবেন। কিন্তু সেই সুযোগ গান্ধীর হলো না।

গান্ধীকে ছুটতে হলো লাহোর। লাহোর কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্য। সঙ্গে মীরাকেও যেতে হলো। লাহোর যাবার পথে গান্ধীকে যেতে হলো দিল্লী। ভাইসরয় ডেকে পাঠিয়েছেন। গান্ধীকে বড়লাট বললেন লণ্ডনে রাউন্ড টেবেল কনফারেন্সে যেন গান্ধী অবশ্যই যোগ দেন কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে। গান্ধী জানতেন রাউন্ড টেবেল কনফারেন্সে যোগ দিয়ে কোন লাভ হবে না। গান্ধী তাঁর মনের কথা গোপন করলেন না। খোলাখুলি ভাইসরয়কে বললেন। তবে রাউন্ড টেবেল বৈঠকে যোগ দিতে উনি সম্মত হলেন। যে সমস্ত শর্ত ভাইসরয় দিলেন- গান্ধী সেগুলোর বেশির ভাগই মেনে নিতে পারলেন না।

লাহোরে তখন প্রচন্ড শীত। গান্ধীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হলো। অন্যান্যরা যাঁরা গেলেন তাঁদের হাতে রয়েছে শীতের জামা কাপড় সঙ্গে বিছানা-ব্যাগ।

গান্ধীর দেখাশুনা, খাওয়া দাওয়া, স্বাস্থ্যপরীক্ষা, দায়িত্ব ইত্যাদি সব রয়েছে মীরার

উপর। লাহোর অধিবেশন শেষ পর্যায়ে। সব ঠিকঠাক মত চলছিল। তারপর প্রকাশ্য অধিবেশন। লোকসমাগম হলো প্রচুর প্রকাশ্য অধিবেশনে। অধিবেশন চলল রাত দু'টো পর্যন্ত। পূর্ণ-স্বাধীনতার পক্ষে অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। উপস্থিত সদস্য-সদস্যাবৃন্দ উচ্ছ্বাসে উদ্বেল।

জওহরলাল ছিলেন লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি। লাহোর কংগ্রেস সমাপ্ত। গান্ধীজি ফিরে এলন সবরমতিতে। সঙ্গে মীরা। ২৬ শে জানুয়ারী। ভারতের সর্বত্রই স্বাধীনতা দিবস পালিত হচ্ছে হৈ হুল্লড়ের মধ্যে দিয়ে।

গান্ধী নতুন পরিকল্পনা গ্রহণে ব্যস্ত। চিন্তা ভাবনা মাথায়। তবে গান্ধী কি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চলেছেন-তা কেউ অনুধাবন করতেপারলো না। গান্ধী বেশ কিছুদিন মীরাকে নিয়ে আশে পাশের গ্রাম গঞ্জেও ঘুরতে লাগলেন। নতুন ভাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করবেন-তা গ্রামের লোকেরা জানতে পারলো। তবে তা কি বা কোন ধরনের সত্যাগ্রহ আন্দোলন তা নিয়েই সাধারণ লোকের কৌতূহল।

গান্ধীজি এর মধ্যে কংগ্রেস নেতাদের একটা মিটিং ডাকলেন সবরমতিতে। সবরমতি আশ্রম রাজনীতির আখড়া হয়ে দাঁড়ালো। এলেন আজাদ, এলেন প্যাটেল। এলেন পন্থ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ প্রথম সারির কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। আলোচনা চলল বহুক্ষণ। গান্ধী শুধু বললেন তিনি নতুন করে ব্রিটিশ এর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করতে চলেছেন। অন্যান্য নেতারা সত্যাগ্রহের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করতে চাইলেন। গান্ধী কিন্তু চুপচাপ, মুখ খুলতে চাইছেন না। তাই অন্যান্য নেতারা কৌতুহলপূর্ণ নয়নে গান্ধীর দিকে তাকিয়ে। গান্ধী হঠাৎ তাঁর মৌন ভঙ্গ করলেন। বলে ফেললেন তিনি লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করতে চলেছেন।

উপস্থিত কংগ্রেস নেতারা স্তম্ভিত। তাঁরা যেন গান্ধীর এই পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা গান্ধীকে জিজ্ঞেস করলেন তাহলে কি তাঁদের সকলকে লবণ তৈরির কাজে যুক্ত হতে হবে? গান্ধীর সোজা উত্তর লবণ সত্যাগ্রহ হবেই। এই নিয়েই আরম্ভ হবে আইন অমান্য আন্দোলন।

জওহরলাল ও মতিলাল গান্ধীর এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারলেন না। তাঁরা সভা থেকে প্রস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠে পড়লেন। মীরা দেখলেন বাপু চপুচাপ। শুধু সেক্সপীয়ারের কয়েকটি কথা যেন বাপুর ঠোঁটের আগাই এসে গেলো। বাপু বলেই ফেললেন, "When shall we three meet again? In thunder, lightning and in rain."

মতিলাল ও জওহর গান্ধীর এই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারলেন না। কিন্তু গান্ধী তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। কেউ তাঁকে তাঁর সংকল্প থেকে টলাতে পারবেনা। মতিলাল ও জওহর গান্ধীর কাছে হার স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

স্থির হল ১২ই মার্চ সবরমতি থেকে লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য গান্ধী যাত্রা করবেন। সবরমতি থেকে যাত্রা হবে শুরু। গন্তব্য স্থল আরব সাগর। তাঁর সঙ্গে যাবেন উনিশজন কংগ্রেস নেতা ও কর্মী। তাঁদের তালিকাও করা হয়ে গেছে। তবে মীরা এবার তাঁর সঙ্গে যাচ্ছেন না।

গান্ধী তাঁর পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দিল্লীতে ভাইসরয়-কে চিঠি পাঠালেন। চিঠিটা বয়ে নিয়ে গেল একজন ইংলিশ কোয়াকার নাম রেগিন্যাল্ড রেনলডস্।

ভাইস্রয় যথারীতি চিঠি পেয়ে গেলেন। তবে তিনি বিচলিত নন। গান্ধীর চিঠিকে তিনি কোন গুরুত্বই দিলেন না। সমগ্রভারত তখন উত্তেজনায় টান টান। বাপু ঘোষণা করলেন তিনি ১২ই মার্চ ডান্ডি অভিযান আরম্ভ করছেন। সবরমতি আশ্রম থেকেই এই অভিযান আরম্ভ হবে। সকলের মনে এই ধারণা দৃঢ়বদ্ধ ছিল যে গান্ধীজি অচিরেই গ্রেপ্তার হবেন।

কাতারে কাতারে লোক এসে সবরমতি আশ্রমে জমায়েত হতে লাগল। ১১ই মার্চ সন্ধে। ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রার্থনা সভার। স্ত্রী পুরুষ, ছেলে, মেয়ে, যুবক-যুবতী যেন কারো চোখে ঘুম নেই। সন্ধে গড়িয়ে রাত এলো। রাতও প্রায় শেষ প্রহর গুণছে। কোন পুলিশের দেখা নেই। গান্ধীজির গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা রইল না।

মীরা বলেছেন বাপু নির্বিকার। তাঁর মুখে কোন কথা নেই। চিন্তা ক্লিষ্ট। কপালের রেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে রাতে তিনি ঘুমোলেন ভালই। যাকে বলে 'সাউন্ড স্লিপ' বা গভীর ঘুম।

আশ্রমের চারপাশে লোকে লোকারণ্য। আশ্রমের আশে পাশের মাঠে ঘাটে তারা অবস্থান করছে। খালি মাঠে গাছতলায় গোটা আশ্রমকে কেন্দ্র করে তারা সারারাত ঘুরেছে.

অবশেষে প্রভাত সূর্যের রক্তিমাভ রেখা দেখা দিল। আশে পাশের গ্রাম থেকে, এমনকি দূর দূর অঞ্চল থেকেও অসংখ্য লোক এসে হাজির হতে লাগল। মনে হচ্ছিল এত জনগণের হাত থেকে গান্ধীজিকে ছিনিয়ে নেবার সাধ্য ইংরেজসরকার বাহাদুরের নেই।

বাপুর ডান্ডি অভিযানের সময় সমাগত। মনে হচ্ছিল বাপুর মধ্যে ভারতাত্মা জেগে উঠেছে। উনাশি জন সহযাত্রী সহ গান্ধীজি দন্ডায়মান। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিধর ব্রিটিশরাজের সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ। চলেছেন আইন অমান্য করতে। লবণ আইন ভাঙ্গতে। জনগণের করতল ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত। গান্ধীজি কি জয় ধ্বনি আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল। এই ধ্বনি যেন অচিরেই পৌঁছে গেল ভাইসরয়-এর কাছে। ১২ই মার্চ গান্ধীজির যাত্রা হলো শুরু ডান্ডি অভিমুখে।

মীরা চলে গেলেন সবরমতি আশ্রমে। গান্ধীজি পরের দিনই মীরার কাছে তাঁর কুশল সংবাদ জানিয়ে হাত চিঠি পাঠালেন। মীরার কাছ থেকে আশ্রমের খবরাখবর জানতে চাইলেন। গান্ধীজির ভয় ছিল তাঁর অবর্তমানে হয়ত ইংরেজ পুলিশ আশ্রমে অত্যাচার চালাবে। না-সেইরকম কিছু হলোনা। পুলিশ-এর টিকিটি ও দেখা গেল না।

গান্ধীজি এর মধ্যে বেশ এগিয়ে যাচ্ছেন। পৌঁছে গেলেন ডান্ডি ৫ ই এপ্রিল। ৬ই এপ্রিল অতি প্রত্যুষে গান্ধীজি তাঁর সঙ্গীসাথিদের নিয়ে লবণ-আইন ভঙ্গ করলেন। নিজ হস্তে লবণ তৈরি করার জন্য সকল ভারতবাসীকে নির্দেশ দিয়ে যেতে লাগলেন। হাজারে হাজারে বম্বের ধনী লোকদের স্ত্রীরা এসে জড়ো হলেন। গান্ধীজির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে এতবড় আন্দোলনের সামিল হলেন।

গান্ধীর কাজ সমাধা হলো। এরপর একমাস কেটে গেল। ৫ই মে, এলো ইংরেজ পুলিশ ভাইসরয়ের নির্দেশ নিয়ে। গান্ধী গ্রেপ্তার হলেন। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল যারবেদা জেলে। বহুদিন পর গান্ধী জেলে ঘুমোলেন।

গান্ধীকে মীরা চিঠি দিলেন। মীরা খাদির প্রচারের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। গান্ধীজির অনুমতি চাইলেন। গান্ধী সানন্দে মীরাকে অনুমতি দিলেন। তবে তিনি মীরাকে স্পষ্টত বলে দিলেন মীরা যেন কোন ক্রমেই নিজে থেকে গ্রেপ্তার বরণ না করেন। মীরা গান্ধীজির সম্মতি নিয়ে প্রথমে গেলেন মাদ্রাজ সেখান থেকে বিহার হয়ে এসে উপস্থিত হলেন কলকাতা।

হাওড়া ষ্টেশনে যথাসময়ে ট্রেন এসে থামলো। মীরার হাওড়া আগমনের খবর বায়ুবেগে কলকাতার জনগণের কাছে গিয়ে পৌঁছাল। হাজার হাজার কংগ্রেস সদস্য-সদস্যা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছুটলেন হাওড়া ষ্টেশনে।

তখন কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট। লালবাজারে বসে তিনি নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। গোলমাল হতেপারে এ ভয়ে মীরার ট্রেনের কামরা পুলিশে ঘিরে রেখে দিল। মীরাকে কামরা থেকে নামতে দেওয়া হলো না। কিন্তু জনতার চিৎকার চেঁচামেচিতে এক বিশ্রী পরিবেশের সৃষ্টি হল। জনতাকে সামলাতে পুলিশ যেন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ২/১ জন কংগ্রেস নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে মীরার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিল পুলিশ। তাঁরা মীরার সঙ্গে দেখা করলেন। মীরাকে তাঁরা জানালেন মীরার জন্য গাড়ি প্রস্তুত। তাঁকে তাঁরা নিয়ে যেতে এসেছেন।

পুলিশের একজন ডেপুটি কমিশনার তাদের বললেন মীরাকে কংগ্রেস কর্মীদের কোন গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া যাবে না। সরকারের নিষেধ। তাঁকে পুলিশের গাড়িতে করে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হবে। মীরাকে নিয়ে পুলিশ ভ্যান ছুটল হাওড়া স্টেশন থেকে। গন্তব্যস্থল লালবাজার। সেখানে রয়েছেন পুলিশ কমিশনার টেগার্ট।

মীরাকে নিয়ে যাওয়া হলো পুলিশ কমিশনারের ঘরে। মীরা টেগার্টের বিপরীতদিকের চেয়ারে বসলেন, টেগার্ট মীরাকে অনেক প্রশ্ন করলেন। অনেক প্রশ্নের মীরা কোন উত্তর দিলেন না। প্রশ্নগুলো এড়িয়ে গেলেন। টেগার্ট নির্দেশ দিলেন মীরা যেন কোন মিছিলে যোগ না দেন। মীরা টেগার্টের কোন কথার প্রতিবাদ করলেন না। মীরা যেন নির্বাক শ্রোতা টেগার্টের বক্তব্য শোনার জন্য উপবিষ্ট।

টেগার্ট মীরাকে বললেন তাঁর আগমনে কলকাতার এ রকম আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। মীরা এই কথার প্রতিবাদ করলেন দৃপ্তকণ্ঠে। তিনি বললেন এর জন্য পুলিশই সম্পূর্ণরূপে দায়ী। পুলিশই সৃষ্টি করেছে এরকম একটা পরিস্থিতি। নচেৎ সব কিছুর শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাপ্তি ঘটত।

টেগার্ট আবার মীরাকে সাবধান করে দিলেন তিনি যেন কোন বৃহৎ সভাসমিতি বা পদযাত্রায় যোগ না দেন। তবে কলকাতার যার বাড়িতে অতিথি হয়ে যাচ্ছেন সেই বাড়িতে যাবার অনুমতি দেওয়া হল মীরাকে।

মীরার জন্য একখানা ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল লালবাজারে। ড্রাইভারটি ছিল শিখ। ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের প্রতিমূর্ত্তি। লালবাজারের আসে পাশে জনতার আসার বিরাম নেই। মীরাকে পুলিশের একজন ডেপুটি কমিশনার সঙ্গে করে নিয়ে এসে অপেক্ষারত ট্যাক্সিতে তুলে দিলেন। যে বাড়িতে অতিথি হয়ে মীরা যাচ্ছেন সে বাড়ির ঠিকানা দেওয়া হল ড্রাইভারকে।

ড্রাইভার ছুটল গাড়ি নিয়ে। যথাসময়ে ট্যাক্সি গন্তব্যস্থলে এসে উপস্থিত হল। বাড়ির মালিক এসে মীরাকে উপরে নিয়ে গেলেন। মীরার শরীরে তখন বেশ জ্বর। তিনি খুবই ক্লান্ত। বাড়ির মালিক মীরাকে শুয়ে পড়তে অনুরোধ করলেন। মীরার শরীর আর চলছিল না। মীরার দেহ খানা বিছানার উপর পড়ে গেল। শক্তিহীন দেহখানি যেন তাঁর ভার বইতে পারছিল না।

ছয়

মীরা কলকাতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় প্রশেসন বের হয়ে গিয়েছিল। মূলত মহিলাদের। চারদিকে হৈ হৈ রব। এদিকে পুলিশ সক্রিয়। কলকাতার রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ ও হলো কয়েকদফা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা পুলিশকে দেখে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বেদম লাঠি পেটা করল। ক্ষুব্ধ ভাইসচ্যান্সেলার এর প্রবল প্রতিবাদ করলেন। মীরা এলেন পরদিন। ভাইসচ্যান্সেলার মীরাকে পুলিশের লাঠির আঘাতে রক্তারক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালের গায়ে লাগা রক্তের ছাপ দেখালেন। মীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বর্বর-ব্রিটিশ পুলিশের নিদারুণ অত্যাচারের চিহ্ন স্বচক্ষে দেখে মীরা স্তম্ভিত। তাঁর আগমনে কলকাতার পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তাবিত জানিয়ে মহাত্মাকে চিঠি দিলেন। ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০ মহাত্মা মীরাকে লিখলেন, I have your Calcuta letter. You are having a variety of experiences. Seekers after truth turns everyone of these to good account."

এর পর মীরা গান্ধীর নির্দেশে সবরমতি ফিরে গেলেন। তখনও তাঁর শরীর ক্লান্ত। তবুও আশ্রমে তাঁর মন টিকছিল না। তিনি আবার বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণে বের হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ২৪শে জানুয়ারি। গান্ধী ছাড়া পেলেন জেল থেকে।

ছাড়া পেয়ে তিনি প্রথমে গেলেন বম্বে। সেখানে খবর পেলেন মতিলাল গুরুতর অসুস্থ। আছেন এলাহাবাদে। আনন্দভবনে। কালবিলম্ব না করে বাপু ছুটলেন এলাহাবাদ। মতিলাল সকাশে। মীরা তখন ছিলেন সিন্ধুপ্রদেশে। তিনি সিন্ধুপ্রদেশ ভ্রমণ তাড়াতাড়ি শেষ করে ছুটলেন এলাহাবাদে। মিলিত হলেন বাপুর সঙ্গে। তখন নেহরু পরিবারের প্রায় সকলেই এসে গেছেন আনন্দভবনে।

মতিলালের অবস্থা খারাপ। শেষ অবস্থা বলা যেতে পারে। ডাক্তারের পরামর্শে তাঁকে লক্ষ্মৌ নিয়ে যাবার কথা চিন্তা করা হলো। কিন্তু সম্ভব হলো না। মৃত্যুর ঘন্টা যে বেজে উঠল। মতিলালের ঘটল অকাল প্রয়ান। সেদিনই এলাহাবাদে তাঁর দেহ পুড়িয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা হলো। তাঁর নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিলিয়ে গেল। তখন জওহর একা। গান্ধী রয়েছেন আনন্দভবনে। পাশে মীরা।

বিশাল শোভাযাত্রা করে মতিলালের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হল শ্মশানে। গান্ধী গেলেন না শোভাযাত্রার সঙ্গে। পরে আনন্দভবনে গাড়ি পাঠানো হলো গান্ধীর জন্য। গান্ধী, মীরা, মদনমোহন মালব্যকে সঙ্গে নিয়ে সেই গাড়িতে শ্মশানে গেলেন। চিতা সাজানো। মতিলালের নিষ্প্রাণ দেহ শায়িত চন্দন কাঠের উপর। মুখাগ্নি করবেন জওহর। গায়ে তার প্রচন্ড জ্বর

তখন। গান্ধীর আসার অপেক্ষায়। গান্ধী এলেন। একটা চন্দন কাঠ মৃতের চিতায় দিলেন। ঘি ঢালা হলো প্রচুর। জওহর হিন্দু ধর্ম্মমতে বাবার মুখে আগুন দিল। আগুন প্রজ্জ্বলিত হল। দ্রুতগতিতে দাহ করার চেষ্টা করা হল। তবু রাত শেষ হয়ে গেল।

জওহর অন্যান্য কাজ শেষ করে গঙ্গা-যমুনার জলে ডুব দিয়ে স্নান করল। গায়ে জ্বর। কিন্তু নিরুপায়। নিষ্ঠা সহকারে হিন্দু ধর্মের রীতি নীতি অনুযায়ী সব কাজ সমাধা করল জওহর। পরদিন জওহর-এর জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পেল।

এর মধ্যে ভাইসরয় আরউইন ডেকে পাঠালেন গান্ধীকে দিল্লীতে। বাপু ছুটলেন দিল্লী। মীরা আছেন সঙ্গে। দিল্লীতে তাঁরা উঠলেন ডঃ আনসারির বাড়িতে। দরিয়াগঞ্জে। যমুনা নদীর পাশেই আনসারির বাড়ি। গান্ধী কুড়িদিন ছিলেন দিল্লীতে। আনসারির বাড়িতে যেন বড় বড় কংগ্রেস নেতাদের হাট বসে গেছে। গান্ধী আরউইনের সঙ্গে কথা বলতে যাবার আগে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করতেন।

ডঃ আনসারি গান্ধীর অত্যন্ত প্রিয়জন। জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের একজন জাঁদরেল নেতা। ভারতজননীর একজন অতি গুণী সন্তান। স্বল্পভাষী। অপূর্ব তাঁর ব্যবহার। জনচিত্তে আনসারির আসন অনেক উঁচুতে। গান্ধীজি রোজই একবার করে আরউইন সকাশে যেতে লাগলেন। আলোচনা চলত অনেকক্ষণ। তিনি একাই কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে আরউইনের সঙ্গে কথা বার্ত্তা চালাচ্ছিলেন। অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা দরিয়াগঞ্জে আনসারির বাড়িতে উৎসুক হয়ে থাকতেন। গান্ধীজি এলে আরউইনের সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা হলো সেই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা হতো। দিন গড়িয়ে যাচ্ছে। আরউইনের সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাতে আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু কোন কাজের কাজ হচ্ছে না। গান্ধী ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। বৃথা সময় নষ্ট না করে তিনি সবরমতি ফিরে যাবার কথা চিন্তা করছিলেন।

এ সময় গান্ধী তিন জন কংগ্রেস নেতার উপর খুবই নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এই তিন জন কংগ্রেস নেতা হলেন তেজবাহাদুর সাপ্রু, এম. আর জয়াকার, আর ডঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী। এই তিনজন ছিলেন জাঁদরেল কংগ্রেস নেতা। তাঁদের পরামর্শে গান্ধীজি অনেক কঠিন কাজ সমাধা করেছেন অতিসুষ্ঠুভাবে। তাই এই তিনজনের উপর তাঁর আস্তা ছিল প্রভূত।

মীরা গান্ধীর খাবার দাবার স্বাস্থ্য পরিচর্যা ইত্যাদি নিয়েই দিল্লীতে ব্যস্ত থাকতেন বেশিরভাগ সময়। ডঃ আনসারির বাড়ির এক অভিজ্ঞতার কথা মীরা তাঁর বইতে লিখেছেন। মীরা লিখেছেন একদিন বাপু ক্লান্ত দেহে আরউইনের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে বাড়ি ফিরেই শুয়ে পড়লেন। গান্ধী ধরে রেখেছেন আরউইনের সঙ্গে এ সাক্ষাতকার ফলপ্রসূ হবে না। তাঁকে বিফল মনোরথে ফিরে যেতে হবে সবরমতি।

গান্ধী ঘুমোতেন বারান্দায়। যমুনা নদী দেখা যেত সেখান থেকে। অপূর্ব-তার শোভা। যমুনার অপূর্ব শোভা দেখতে দেখতে গান্ধীজি ঘুমিয়েছেন। গভীর তাঁর ঘুম। মীরা শুতো গান্ধীর খানিক দূরে। সব সময় মীরার কান খাড়া হয়ে থাকত। তিনি যে গান্ধীজির অতি বিশ্বস্ত প্রহরী।

গান্ধীজি গভীর ঘুমে। মীরাও নিদ্রামগ্ন। তবে তাঁর ঘুম খুবই পাতলা। এমন সময় হঠাৎ বাইরের টুকটাক শব্দে মীরার ঘুম গেল ভেঙ্গে। তিনি উঠে বসলেন। দেখলেন তিনটি অস্পষ্ট ছায়া মূর্ত্তি। তখন ছিল শীতের রাত। সকলেই লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছেন।

মীরা দেখলেন ছায়ামূর্ত্তি তিনটি ক্রমশ এগিয়ে আসছে। মীরা তাদের পরিচয় জানতে চাইল না। মীরা প্রথমে ভেবেছিলেন এই তিনজন হয় সি. আই. ডির লোক। লোকগুলি মাথার কাছে এলো। মীরাকে তারা জানালো যে আরউইন স্বয়ং তাদের গান্ধীর কাছে পাঠিয়েছেন। আরউইনের অতি গোপন কিছু কথা গান্ধীকে জানাতে তাদের আগমন। মীরা তাদের সঙ্গে কথা বললেন। প্রথমে তাদের কথায় কোন আমলই দিতে চাইলেন না। পরে সব অবগত হয়ে গান্ধী সকাশে গেলেন।

অতি সান্তর্পণে বাপুর ঘুম ভাঙ্গালেন। বাপু সব শুনলেন। লোকগুলিকে কাছে ডাকলেন। তাদের সবার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা হলো। কথা হলো বেশ কিছুক্ষণ। মীরা কিন্তু তার বইতে কি কথা হলো সেই বিষয়ে কোন আলোকপাত করেননি. তিনজনের আগমনে ঘটনার মোড় গেল ঘুরে। বাপু ভেবেছিলেন আরউইনের সঙ্গে আলোচনা করে কোন লাভ হবে না। অতএব তিনি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন সবরমতি ফিরে যাবেন।

না তা হলো না, বাপু পরের দিনই আবার আরউনের কাছে গেলেন। নতুন করে শুরু হলো আলোচনা। আলোচনা চলা কালে মীরাব একবার ডাক পড়ল। মীরা বাপুর খাবার দাবার নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। বাপু তখন খেতেন খেজুর-আর দুধ। মীরা গান্ধীর নির্দেশে তাঁর খাবার নিয়ে আলোচনা গৃহে উপস্থিত।

মীরা সব তৈরি করে বাপুর হাতে খাবার পাত্রটি তুলে দিলেন। বাপু ধীরে ধীরে খেতে আরম্ভ করলেন। ভাইসরয় বিস্মিত। এত অল্প খাবার খেয়ে একটা লোক জীবন ধারণ করতে পারে তা ভাবতেও যেন তিনি বিস্ময়বোধ করছেন।

বাপুর খাবারের দিকে ভাইসরয় দু' একবার উঁকি মারলেন। বাপু তা অনুধাবন করে একটু মুচ্কি হাসলেন। এবং বললেন পয়গম্বরের খাবার।

মীরা বাপুকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি অপেক্ষা করবেন কি না? বাপু ও ভাইসরয় সম্মতি দিলেন বাপুর খাবার শেষ হলে মীরা থালাবাটি নিয়ে চলে যাবেন। বিশাল আলোচনা কক্ষ। লোক মাত্র জনা চার। মীরা বিশাল কক্ষের বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেল। মীরা কিন্তু তখনো অপেক্ষা করছেন।

মীরা বলেছেন, "The Stage had been reached for the drafting of the pact, and one point after another was being put in writing."

বাপু বলে যেতে লাগলেন। নোট নিচ্ছিলেন এমারসন। পাশেই ছিলেন মহাদেব দেশাই। এক সময়ে আরউইন কি যেন একটা সংশোধন করে দিতে চাইলেন। গান্ধী তা বুঝতে পারলেন এবং সেইভাবে তাঁর নোট লেখা হলো।

এর মধ্যে গান্ধীর খাওয়া শেষ। মীরা ছুটে এলেন। গান্ধীর থালা-বাটি ও অন্যান্যসামগ্রী নিয়ে মীরা যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের সময় আরউইনের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আরউইন তাঁকে হাসিমুখে বিদায় দিলেন। গান্ধী এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে ভাইসরয়-এর সঙ্গে আলোচনায় রত। আর তাঁর ছোট ছেলে দেবদাস ব্যস্তগভীর প্রেমে। রাজাগোপাল চারির ছোট মেয়ে লক্ষ্মী দেবদাসের বাগদত্তা। বয়স তাদের বেশ কম। তাই গান্ধী কিংবা রাজাজী কেউ এত তাড়াতাড়ি পুত্রকন্যার বিয়ে দিতে নারাজ।

দ্বিতীয়ত গান্ধী বৈশ্য। আর রাজাজী দক্ষিণভারতের ব্রাহ্মণ। কস্তুরাবার প্রাণ ছোট

ছেলের মধ্যে। আর রাজাজীর ছোটমেয়ের মধ্যে। পুত্রকন্যার জীবনে অঘটন কিছু ঘটুক তা তাঁদের কল্পনার বাইরে। তবে উভয়পক্ষই চান তাঁদের সন্তানরা আর একটু পরিণত বয়সে বিয়ে করুক। অন্তত পাঁচ বছর পর। রাজাজী ছোট মেয়ের জন্য পাঁচ বছর দিল্লী কাটাতে সম্মত. আর কস্তুরাবা ছোট ছেলের জন্য পাঁচবছর দিল্লীতে থাকতে বদ্ধপরিকর।

মীরাবেনের সামনে কস্তুরাবা পুত্র দেবদাসকে ডাকলেন। ডাকলেন লক্ষ্মীকে ওরা উভয়েই উৎফুল্ল। তাদের দুজনকেই কস্তুরাবা বুঝিয়ে সব বললেন। কস্তুরার সব কথা দু'জনে নতমস্তকে শুনলো। দু'জনেই তারুণ্যের প্রেমের আতিশয্যে যেন কল্পলোকে ভেসে চলেছে। দু'জনেই পরস্পরকে পাবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে প্রস্তুত।

এদিকে আরউইনের সঙ্গে গান্ধীর প্যাক্ট হলো। যা ইতিহাসে গান্ধী আরউইন প্যাক্ট নামে স্বীকৃত। উভয়েই নির্ধারিত স্থানে সইসবুদ করলেন। ভাইসরয় এর প্রাসাদের বাইরে অগনিত জনতা। তাদের জয়ধ্বনিতে দিল্লীর আকাশ-বাতাস মুখরিত। জনতা প্যাক্টের বিষয় জানতে আগ্রহী। গান্ধী ঘোষণা করলেন তিনি দু'দিন পর তাঁর বক্তব্য রাখবেন। ১৯ শে মার্চ করাচী কংগ্রেস। গান্ধী চললেন করাচী কংগ্রেসে যোগ দিতে। সঙ্গে আছেন মীরা।

ঠিক এমন সময় ভগৎ সিং-এর ফাঁসির হুকুম হলো। সমগ্র দেশ হয়ে উঠল উত্তাল। মীরা বলেছেন গান্ধী ভাইসরয়-কে ভগৎসিং ও অন্যান্য চরমপন্থী বিপ্লবীদের ফাঁসি রদ করতে অনুরোধ করেননি। করলে ভগৎসিং বা অন্যান্য চরমপন্থী বিপ্লবীদের ফাঁসির হুকুম রদ হতো।

তবে এটা সত্যি গান্ধীর ভগৎসিং-দের প্রাণবাঁচাবার প্রচেষ্টার মধ্যে ত্রুটি ছিল। কেন না তারা ছিল গান্ধী মতবাদে অবিশ্বাসী। প্যাক্ট অনুযায়ী গান্ধীমতবাদে বিশ্বাসী সকলেই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিল। একমাত্র গান্ধী মতবাদে অবিশ্বাসী কট্টরপন্থী ছাড়া। তাদের প্রাণ দিতে হলো ফাঁসিকাঠে।

গান্ধী আরউইন প্যাক্ট যখন স্বাক্ষরিত হয় মতিলাল তখন পরপারে। সুভাষ রয়েছেন জেলে। অন্য কোন কংগ্রেস নেতাকে গান্ধী ভয় বা সমীহ করেন না। তাঁরা সকলেই গান্ধীর বশংবদ। গান্ধীই কংগ্রেস। সুভাষ জেলে বসে বিপদগুণলেন। গান্ধীকে জেল থেকে অনুরোধ করে চিঠি-পাঠালেন-প্যাক্ট-এ সই না করতে। সুভাষের অনুরোধে কোন কাজ হলো না। সুভাষ জেল থেকে ছাড়া পেলেন ৮ই মার্চ। প্যাক্ট সই হলো ৫ই মার্চ।

চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল, "কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন তুলে নেবে। বিনিময়ে সরকার অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী রাজবন্দীদের মুক্তি দেবে। এমনকি সমুদ্রের কাছাকাছি বসবাসকারী অধিবাসীদের বিনা শুল্কে লবণ তৈরির অধিকার দিতেও সরকার রাজি।"

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সুভাষ ছুটলেন বম্বে। দেখা করলেন গান্ধীর সঙ্গে। চেষ্টা করলেন গান্ধীর মনোভাব পরিবর্তন করতে। বম্বে থেকে গান্ধীর সঙ্গে সুভাষ এলেন দিল্লী ট্রেনযোগে। ট্রেনেই তাঁরা খবর পেলেন ভগৎসিং, শুকদেও রাজগুরুর ফাঁসির হুকুম হয়েছে।

সুভাষচন্দ্র হতাশ। গান্ধীকেই দায়ী করলেন সুভাষ। সুভাষ তাঁর ইন্ডিয়ান স্ট্রাগেল বইতে লিখেছেন যে, "দিল্লী পৌছাতে না পৌছাতে আমরা সেই মর্মান্তিক খবর পেলাম। সরকার আদেশ দিয়েছেন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ভগৎসিং এবং তাঁর দুই সহকর্মীর মৃত্যুদন্ডের আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। আমরা গান্ধীজির উপর চাপ সৃষ্টি করলাম যাতে এই দন্ডাজ্ঞা মকুব করার জন্য তিনি বড়লাটকে দৃঢ়ভাবে বলেন। আমি এই দন্ড মুকুব

করার জন্য চুক্তির একটি অনতম শর্ত করতেও গান্ধীজিকে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করলেন না। আন্দোলনের জন্য যাঁরা বন্দী হয়েছে তাদের ব্যাপারটা চুক্তির শর্ত হিসেবে রাখতে গান্ধী আদৌই উৎসাহী নন।"

সমগ্র দেশ উত্তাল হয়ে উঠল। শেষপর্যন্ত দেশের জনগণের চাপে ও বেশ কিছু কংগ্রেস নেতার দৃঢ় বক্তব্যে গান্ধী বাধ্য হয়ে ভাইসরয়সমীপে গেলেন। তিনি ভাইসরয়কে বললেন ভগৎ সিংদের ফাঁসির হুকুম রদ্ করতে। কেন না তিনি ভাইসরয়কে স্পষ্টত জানালেন যে ভগৎসিংদের ফাঁসি হলে তারা পাবে শহীদের মর্যাদা। অতএব এদের ফাঁসির হুকুম যেন রদ করা হয়। ভাইসরয় গান্ধীজির কথার কোন গুরুত্ব দিলেন না। তবে ফাঁসির দিন স্থির হয়েছিল ২৪শে মার্চ সেটাকে ২৩শে মার্চ করা হল। কেন না ২৪শে মার্চ ছিল করাচী কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের দিন।

ভারতবাসী কিন্তু জানতে পারল না ভগৎসিংদের ফাঁসির দিনটি কবে। গান্ধী জানতেন। তিনি ছিলেন নীরব। অদ্ভুত লোকটির কাছে ভগৎ সিংদের বীরত্বগাথা যেন একটা নোংরা কাজ। যেহেতু তারা সশস্ত্র বিপ্লবী।

ভগৎসিং ও তার দু সহকর্মী ভাইসরয়-এর কাছে কেবলমাত্র একটা আবেদনই রাখল চিঠির মাধ্যমে। তাতে তারা লিখল " আমাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ যে আমরা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ষড়যন্ত্র করছি। এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে ভারতবর্ষ ও গ্রেটব্রিটেনের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বর্তমান। আর আমরাও যুদ্ধবন্দী। যুদ্ধবন্দী হিসেবে আমাদের দাবী আমাদের গুলি করে হত্যা করা হোক।"

ভগৎসিংদের ব্যাপারে গান্ধীর উপর সাধারণ মানুষ এমনকি কংগ্রেস নেতারা পর্যন্ত অসন্তুষ্ট। ভারতবাসী সেদিন গান্ধীর উপর কি ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন তার একটি বর্ণনা দিয়েছেন মীরা তাঁর বইতে। তিনি লিখেছেন গান্ধীসহ ট্রেন যখন সুক্কুর স্টেশনে এসে দাঁড়ালো তখন ঘটে গেল এক ভয়ঙ্কর কান্ড।

বিশাল ছাত্র ও যুবকের দল গান্ধীজির ট্রেন ঘিরে ফেলল। তারা গান্ধীর কামরায় ঢুকতে উতলা হয়ে উঠেছে। কিন্তু ট্রেনের কামরায় সব দরজা বন্ধ। শুধু দু'টো জানালা খোলা। শত বলপ্রয়োগ করেও তারা ট্রেনের দরজা ভাঙতে পারল না। শেষ পর্যন্ত খোলা জানালা দু'টোর ফোকর দিয়ে তারা ট্রেনের কামরায় প্রবেশের চেষ্টা করতে লাগল। তাদের হাতে রয়েছে ভগৎসিং-এর ছবি। গান্ধীর বিরুদ্ধে নানান কুৎসিৎ মন্তব্যে তখন আকাশ বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। ট্রেনের কামরায় রয়েছেন গান্ধী, কস্তুরবাবা, মীরা আর একজন।

এরই মধ্যে কিছু ছাত্র ট্রেনের কামরার পায়খানার জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকার চেষ্টা করল। একজন পায়খানার জানালার একদিকটা প্রায় ভেঙ্গে ফেলল। সেই ফোকর দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিল। এরকম পরিবেশে গান্ধী যেন মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। তিনি দেখলেন যুবক ছাত্রদের হাত থেকে সহজে তাঁর রেহাই মিলবে না। তিনি মীরাকে দরজা খুলে দেবার নির্দেশ দিলেন। মীরা ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিলেন। ছাত্রের দল গান্ধীকে নানা কটূক্তি করতে করতে কামরায় ঢুকল। কয়েকজন ছাত্র ভগৎ সিং-এর ছবি হাতে গান্ধীর দিকে ছুটে

গেল। গান্ধীর পর্বতপ্রমাণ ব্যক্তিত্ব ছাত্রদের অবদমিত করল। গান্ধী ছাত্রদের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করলেন। তাদের বুঝালেন অতি সুললিত কণ্ঠে। তাদের উদ্যত ফনা যেন কোন এক যাদুমন্ত্রবলে নুয়ে পড়ল। তারা ফিরে এল। বাইরে অপেক্ষারত অন্যান্য ছাত্র ও যুবকদের তারা বুঝাল।

এর মধ্যেই গাড়ি চলতে শুরু করল। মীরা বলেছেন বাপু প্রাণে বাঁচলেন। মীরা যেন নবজীবন লাভ করলেন। বাপুর দেহ যেন স্থবীর। নড়াচড়ার লক্ষ্মণ নেই। শ্বাস-প্রশ্বাসও যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। ট্রেন চলতে লাগল আপন গতিতে।

অবশেষে ট্রেন করাচীতে এসে পৌছাল। সঙ্গে রয়েছেন কস্তুরাবা ও আরও দু'একজন। সেখানে গিয়ে গান্ধী পড়লেন আর এক বিপাকে। বিশাল এক যুবার দল কালো ব্যজ পরে বিভিন্ন ধরনের লেখা ফেস্টুন নিয়ে দন্ডায়মান। গান্ধীকে ক্ষোভের সঙ্গে ধিক্কার জানাচ্ছে. বিভিন্ন বিশেষণে গান্ধীকে তারা ভূষিত করতে লাগল। শুরু হয়ে গেল কংগ্রেস সেবাদলের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি। উপস্থিত সুধী মন্ডলী ভয়ে কাঠ।

গান্ধী কিন্তু নির্বিকার। কংগ্রেস সেবাদলের লোকদের কয়েকজনকে গান্ধী ডাকলেন। তাদেব নির্দেশ দিলেন তারা যেন প্রতিবাদ জ্ঞাপনকারি জনগণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তাঁর কাছে আসার সুযোগ দেয়। যথারীতি কাজ হলো। বিক্ষোভকারীদের কয়েকজন নেতা এলেন গান্ধী সমীপে। বেশ কিছু গূঢ় আলোচনা হল তাদের সঙ্গে গান্ধীর। গান্ধী যেন কোন এক অদ্ভুত যাদুমন্ত্রবলে নেতাদের বশ মানালেন। বলা চলে নেতারা গান্ধীর মধূর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট। তারা গান্ধীর পরমভক্ত হয়ে উঠলেন।

করাচী কংগ্রেসের অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত হল। পূর্ণ স্বরাজের দাবীর কথা ঘোষিত হল। স্বাধীন গণতান্ত্রিক সার্বভৌম ভারত গড়ার সিদ্ধান্ত হল। স্থির হলো গোল টেবিল বৈঠকে বাপু একাই কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করবেন। বাপু ঘোষণা করলেন ভারত স্বাধীনতা লাভ করার একদিন আগেও তিনি আর সবরমতি আশ্রমে ফিরবেন না।

এসময়ে মীরা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। গায়ে জ্বব। গা-হাতে প্রচন্ড রকমের ব্যথা। মীরা নির্জীব হয়ে গেলেন। গান্ধী সকাশে গেলেন মীরা। তাঁর শারীরিক অবস্থার কথা জানালেন বাপুকে। মীরা অনুভব করলেন তাঁর বসন্ত হয়েছে। বাপুর নির্দেশে মীরা রাজাজীর কাছে গেলেন। রাজাজী ডাক্তার নন্। তবে অভিজ্ঞতা আছে এসব বিষয়ে। রাজাজী পরিষ্কার বললেন মীরা বসন্তরোগে আক্রান্ত। ডাক্তার দেখানো হলো। বসন্ত বেশ ভালোভাবেই সারা শরীরে দেখা দিল। মীরাকে সম্পূর্ণ আলাদা ঘরে রাখা হলো। পরে অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে দেখে তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হলো। প্রায় একমাস মীরা হাসপাতালে কাটালেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন। কয়েকদিন বিশ্রাম নিলেন।

সাত

তাঁর শরীরটা অনেকটা সুস্থ। বাপু তখন বম্বেতে চলে গেছেন। মীরা আর বেশিদিন বিশ্রাম নিতে পারলেন না। তাঁকে ছুটতে হলো বাপুর কাছে। বম্বেতে। গান্ধী আরউইন চুক্তির কোন শর্তই যেন সরকার কার্যকর করতে ইচ্ছুক নন। সরকারের এই মনোভাব গান্ধীকে

অস্থির করে তুলল। এর মধ্যে চলে গেছেন আরউইন। তার জায়গায় এসেছেন উইলিংডন। অত্যন্ত বদ্‌মেজাজী মানুষ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ক্ষুব্ধ। ক্ষুব্ধ জনগণ। গান্ধী আরউইন চুক্তি অনুযায়ী যে কাজ হবার কথা ছিল তা হচ্ছে না। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং জনগণ গান্ধীকে আবার সত্যাগ্রহ বা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার জন্য চাপ দিতে লাগল। গান্ধী তাদের বুঝালেন।

গান্ধী উইলিংডনকে অত্যন্ত মার্জিত অথচ ধমকের সুরে চিঠি দিলেন। তিনি উইলিংডনকে স্পষ্টতই জানিয়ে দিলেন যে চুক্তি মানা না হলে তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবেন না। গান্ধী কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। মীরা রয়েছেন গান্ধীর সঙ্গে।

গান্ধী মীরাকে সবরমতি চলে যেতে নির্দ্দেশ দিলেন। মীরা চললেন সবরমতি আশ্রমে। গান্ধী কয়েকদিনের মধ্যেই মীরাকে চিঠি লিখলেন। অত্যন্ত সুললিত ভাষায় চিঠিখানাতে মীরার প্রতি গান্ধীর মনের করুণভাব ফুটে উঠেছে ছত্রে ছত্রে।

গান্ধী মীরাকে লিখলেন, "মীরা, তুমি এখন আমার পাশে নেই। অনেক দূরে তোমাকে চলে যেতে হয়েছে আমার ই নির্দ্দেশে। তুমি সবরমতি আশ্রমের কাজকর্ম চালাচ্ছো। ভারতের জনগণের সেবার জন্যই তুমি এসেছো। আত্মীয় পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, মা-বাবা সকলকে ত্যাগ করে। আমার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাহেতু। কিন্তু আমার সেবার জন্য তুমি আত্মনিয়োগ করবে তা আমি চাই না। আমার দেশের জনগণের সেবার কাজে তুমি নিজেকে নিয়োজিত করলে আমি সব চেয়ে বেশি আনন্দ পাব। হে আমার কন্যাসমা মীরা, প্রফুল্লচিত্তে ভারতের অগনিত নিপীড়িত জনগণের সেবার কাজে নিজেকে কায়মনোবাক্যে নিয়োজিত করার জন্য তোমার প্রতি আমার নির্দ্দেশ বা উপদেশ।"

মীরা গন্ধীর চিঠি পেলেন। বার বার চিঠিখানা পড়লেন। যতবার চিঠিখানা পড়েছেন ততবারই তাঁর চোখ দু'টি অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গান্ধী বিহনে মীরা কিন্তু সবরমতি আশ্রমে হাঁফিয়ে উঠেছেন। তাঁর মন টিকছিল না। নানা ভাবনায় মন তার অস্থির। তদপুরি আশ্রমের পরিবেশ ও মীরাকে আর আকৃষ্ট করতে পারছিল না। আশ্রমবাসীদের মধ্যে যেন একটা অনাসক্তির ভাব। শৃঙ্খলাবোধও যেন দিন দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মীরা চিঠির মারফৎ গান্ধীকে এসব খবর জানালেন। মীরার মন নানান ব্যাপারে বিধ্বস্ত। এর মধ্যে একটা চিঠি পেয়েছেন লন্ডন থেকে। মার অসুস্থতার খবর রয়েছে চিঠিতে। মা গুরুতর অসুস্থ। মীরা বুঝতে পারলেন মার আয়ু আর বেশিদিন নেই। তাঁর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। একদিন মীরা আপন মনে বসে আছেন তাঁর ঘরে। মার শরীরের ব্যাপারে কয়েকদিন ধরে মীরা চিন্তাক্লিষ্ট। এমন সময় তাঁর কাছে পিওন এসে হাজির। হাতে একখানা চিঠি। তাঁরই নামে। তিনি চিঠি খুলে দু'এক লাইন পড়লেন। তাঁর চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। মাথা ঘুরতে লাগল। বিছানার উপর ধপাস করে বসে পড়লেন। পাশের ঘরের একটি বালিকা ছুটে এলো।

মীরার চোখ দু'টি জলপূর্ণ। কোন কথাই বলতে পারলেন না। শুধু বললেন মা নেই। মীরা কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। মাকেশেষ দেখাও দেখতে পারলেন না। গান্ধীর সম্মোহিনীশক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে মীরা এসেছিলেন ভারতে। মার অসুখের সংবাদ পেয়েও শেষবারের মত তাঁকে দেখতে যেতে পরলেন না। এর চেয়ে দুঃখের আর কি থাকতেপারে।

মীরা বাপুকে সব জানালেন। মীরার মায়ের মৃত্যুর খবর বাপুকে ব্যথিত করল। বাপু মীরাকে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি দিলেন. কিন্তু অবোধ মন। এতে কি শান্ত হতে পারে।

মীরা মা'র কাছ থেকে প্রতিমাসে চিঠি পেতেন। এখন মা চলে গেলেন। মা'র স্নেহমাখা চিঠি-ত তিনি আর পাবেন না। মা'র স্মৃতি রোমন্থন করেই মীরার দিন কাটছে। কোন কোন সময় মা'র কথা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েন। রাতে প্রায় সময় খাওয়া হয় না। এবারে মার মৃত্যু মীরার দেহ ও মনের উপর কঠোর আঘাত করল। সময় আপন গতিতে বয়ে যায়। সময় ক্রমে ক্রমে মানুষকে তার অতীতকে ভুলিয়ে দেয়। সময়ের এই ক্ষমতা আছে। তাই মানুষ দুঃখের অসহ্য জ্বালা সহ্য করতে পারে। নচেৎ মানুষ ত পাগল হয়ে যেতো। মীরার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। ধীরে ধীরে মীরার মন থেকে মাতৃশোকের তীব্রতা কমতে লাগল। মীরা থাকেন আপন মনে। আর বাপুর চিঠির প্রতীক্ষায় দিন কাটান।

এর মধ্যে গান্ধীর সঙ্গে সরকার বাহাদুরের মসিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। উইলিংডন গান্ধীকে পাত্তা দিতে চান না। গান্ধী তা বুঝতে পারেন তবে না বোঝার ভান করেন। উইলিংডন গান্ধীকে সিমলাতে ডেকে পাঠালেন। গান্ধী ছুটলেন সিমলা। উইলিংডনের সঙ্গে গান্ধীর দীর্ঘ আলোচনা হল। আলোচনা ফলপ্রসূ হলো না। গান্ধীকে আবার গুজরাটে ফিরে যেতে হলো। সেখানকার লোকেরা গান্ধীর উপর ক্ষুব্ধ।

মীরা এদিকে সবরমতি আশ্রমে হাঁফিয়ে উঠেছেন। গান্ধীর ধনুভঙ্গ পণ ভারত স্বাধীন না হলে তিনি সবরমতি আশ্রমে ফিরবেন না। মীরা তাই অনেকখানি ম্রিয়মান।

মীরা প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতির জীব পশু-পাখি, গাছ-গাছালি, বন, নদী সমুদ্র প্রভৃতি মীরার মনের গভীরে নাড়া দেয়। শুয়ে শুয়ে আপন মনে প্রকৃতিকে ধ্যান করেন। সেই ধ্যান ভঙ্গ করার জন্য হয়ত স্বয়ং বিধাতা মীরার কাছে পাঠালেন প্রকৃতির সন্তান এক ময়না পাখি-কে। ঘরে মীরা একা। মীরা শুয়ে শুয়ে বাইরের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক শোভা দেখেন। মীরার মনের এরকম এক অবস্থায় হঠাৎ একদিন সুন্দর ছোট্ট এক ময়না পাখি ঘরে ঢুকল জানালা দিয়ে।

মীরা মাথা তুলে পাখিটির দিকে দু' একবার তাকালেন, পাখিটি বোধহয় মীরার মনের অবস্থা অনুধাবন করতে পারল। মীরা কিছু কিসমিস ছড়িয়ে দিল মেঝেতে। ময়না টুক্‌টুক্ করে কিসমিস খেতে লাগল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পাঁচ, সাতখানা কিসমিস সাবাড় করে ময়না আকুল নয়নে মীরার পানে তাকাল। মীরা হাতে ইশারা করে ও মুখে শব্দ করে ময়নাটিকে ডাকলেন। পাখির বোধ শক্তি প্রচুর। ময়না ধীর পদক্ষেপে মীরার কাছে এল। দু' একবার কিচিরমিচির শব্দ করে কিযেন বলতে চাইল। মীরা তার চোখের চাহনিতে মুখের ভাষাবুঝে নিল। সে আরও কিছু কিসমিস খেতে চায়। মীরা আরও কিছু কিসমিস দিল। ময়না খেলো তারপর উড়ে চলে গেল জানালা দিয়ে। তখন পড়ন্ত বেলা। বুঝিয়ে দিয়ে গেল পরের দিন সে আবার আসবে মীরা সকাশে।

পরের দিন ঠিক একই সময়ে ময়নাটি আবার এলো। তবে মীরা দরজা খোলা রেখেছিল। খোলা দরজা দিয়ে ময়না ঘরে ঢুকল। মীরা আর মেঝেতে কিসমিস ছড়ালো না। কিসমিসগুলি করতলে রাখলেন। ঈশারা করে ময়নাকে ডাকলেন। ময়না এক পা এক পা করে মীরার কাছে এলো। মীরার হাত থেকে কিসমিস গুলি টুক্ টুক্ করে খেল। তারপর

হঠাৎ মীরার মাথায় উঠে বসল। মীরার চুলগুলি ঠোঁট দিয়ে এদিক ওদিক করে দিল। মীরার খুবই ভালো লাগছিল। মীরা সস্নেহে ময়নাটির দিকে হাত বাড়াল। ময়না মীরার হাতের উপর চড়ে বসল। মীরার মনে বিচিত্র এক অনুভূতি জাগল। ময়না আবার উড়ে বাইরে চলে গেল। তখন সন্ধ্যাসমাগত।

এইভাবে ময়নাকে নিয়ে মীরার দিন কাটছিল বেশ আনন্দেই। একদিন ময়না তার সাথীকে নিয়ে এল। মীরা বুঝতে পারলেন ময়নার স্ত্রী। মীরা হাতের ইশারায় দু'টিকেই ডাকলেন। ময়না ধীরে ধীরে মীরার কাছে গেল। হাতের উপর বসল। কিন্তু ময়নার স্ত্রী সলজ্জিত নয়নে চেয়ে রইল মীরার দিকে। সন্ধ্যা সমাগমে ময়না স্ত্রীসহ উড়ে চলে গেল বাইরে।

এর পর বেশ কিছুদিন ময়নার খোঁজ মিলল না। মীরা মনে করলেন ময়না স্ত্রীসহ অন্যত্র পাড়ি দিয়েছে। তারা আর আসবে না। মীরার সঙ্গে এর মধ্যে ময়নার একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মীরা এককিনী। ঘরে শুয়ে শুয়ে কি যেন একটা বই নিয়ে পড়াশুনা করছেন। দরজা বন্ধ। ভেতর থেকে খিল দেওয়া। তখন বেলা দু'টো। বাইরের দরজায় টুকটুক শব্দে মীরার মন সংযোগ নষ্ট হলো। বই থেকে চোখ তুললেন। বাইরের দিকে তাকালেন। বুঝতে পারলেন বাইর থেকে কোন পাখি ঠোঁট দিয়ে দরজার টুক্‌টাক্‌ শব্দ করছে।

মীরা উঠলেন। দরজার দিকে গেলেন। দরজা খুললেন। দেখতে পেলেন ময়না আর তার স্ত্রী সঙ্গে তিন চারটি বাচ্চা। মীরা বুঝতে পারলেন বাচ্চাগুলি সহ ময়না এসেছে মীরার কাছে। ধীরে ধীরে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে ময়না ঘরে ঢুকল। মীরা অনেক কিসমিস ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে দিলেন। ময়না স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে কিসমিসগুলি তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল।

এরকম ভাবে মীরার দিন যাচ্ছিল কেটে। হঠাৎ একদিন বাপুর চিঠি এসে হাজির। চিঠি পেয়ে মীরা বাপুর নির্দেশে ছুটলেন বরসাদে। এর মধ্যে বাপুর লন্ডন যাবার দিন স্থির হয়ে গেছে। গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেবার জন্য। বাপু ২৯ আগস্ট লন্ডন যাত্রা করবেন। জাহাজে করে। বাপু সিমলা ছুটলেন। উইলিংডন-এর সঙ্গে দেখা করার জন্য।

২৭শে আগস্ট মীরা বাপুর একখানা টেলিগ্রাম পেলেন। বাপু মীরাকে ২৯শে সকালে বম্বে পৌঁছতে লিখেছেন। তল্পী তল্পা নিয়ে। মীরা ও পিয়ারীলালকে তাঁর সঙ্গে লন্ডন যেতে হবে। স্থির হলো দেবদাস, পিয়ারীলাল, মীরা আর মহাদেব-এ চারজন বাপুর সঙ্গে লন্ডল যাবেন। এই খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

বম্বেতে লোক সমাগম হতে লাগল প্রচুর। মূলত গান্ধীদর্শনে। তিনি যাচ্ছেন বিলেতে। মীরা পোশাক পরিচ্ছদ কিনলেন তবে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি। মীরা ও পিয়ারীলাল এসে গেছেন বম্বেতে। উঠেছেন মনি ভবনে। সেখানে গান্ধীও আছেন। টাকা পয়সা পোশাক পরিচ্ছদ সব ঠিক হয়ে গেল। তবে সব পোশাক পরিচ্ছদ নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই অনেক পোশাক পরিচ্ছদ ভারতে রেখে যেতে হল।

২৯শে আগস্ট সকাল। বাপু গেছেন স্নান আহ্নিক সারতে। ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে কংগ্রেস নেতারা এসে বম্বেতে ভিড় জমিয়েছেন। সকলেই এসেছেন ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করতে। মদন মোহন মালব্য ও সরোজিনী নাইডুও যাচ্ছেন লন্ডনে ডেলিগেট হিসেবে।

বাপুর জন্য পি এ্যান্ড ও জাহাজ প্রস্তুত। জাহাজের ডেকে লোকে লোকারণ্য। সামলোনো দায়। সরোজিনী ও মালব্য আগেই এসে গেছেন জাহাজের ডেকে। আর এসেছেন কংগ্রেস সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেল। অদূরে দাঁড়িয়ে কস্তুরাবা, তিনি এবার গান্ধীর সঙ্গিনী নন।

বল্লভভাই গান্ধীর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলে নিলেন। জাহাজ ছাড়লো যথা সময়ে। দূরে দাঁড়িয়ে অগনতি জনতা গান্ধীকে জানাল তাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা। জাহাজ চলতে লাগল। ধীরে ধীরে গভীর সমুদ্রে গিয়ে পড়ল জাহাজ। জাহাজের অংশবিশেষ দেখা যাচ্ছিল। দূরে বহুদূরে। ধীরে ধীরে তাও মিলিয়ে গেল। গান্ধীকে নিয়ে জাহাজ দ্রুত বেগে ভেসে চলল লন্ডনাভিমুখে ভারতের ভবিষ্যত নির্ধারণ মানসে।

মীরা, গান্ধী ও অন্যান্যরা একটু নিশ্চিন্ত। বেশ চুপচাপ পরিবেশ। মনোরম প্রাকৃতিক শোভাতে তাদের মনে অনাবিল স্বর্গীয় সুখের ছোঁয়া লাগল। মহাদেব আর মীরা গান্ধীর কাছে বসলেন। প্রচুর চিঠি পত্র ছিল যেগুলো এতদিন খোলার সময় হয়নি। একে একে সমস্ত চিঠিপত্র খোলা হল। গান্ধী সব চিঠিপত্র পড়তে থাকলেন। তারমধ্যে ছিল উইলিংডনের একখানা চিঠি। গান্ধী সেই চিঠির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করলেন না। তিনি মীরাকে শুধু বললেন উইলিংডন আর আরউইন এক নন। জাহাজ চলছে আপনগতিতে। কিন্তু সমুদ্র ছিল উত্তাল। জাহাজ বেশ দুলছিল। মীরার মনে হচ্ছিল যেন জাহাজখানা উলট পালট খাচ্ছে। মীরার গা বমিবমি করছিল। মীরা কেবিন থেকে বের হয়ে এলেন। উন্মুক্ত বাতাসে দাঁড়ালেন।

বাপু বের হয়ে এলেন তাঁর কেবিন থেকে। বাপুর মধ্যে যেন একটা উদ্বেগের চিহ্ন। বিশেষত মীরার জন্য। মীরার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন। মীরা তখন একটু সুস্থ বোধ করছিল। গান্ধীর নজর পড়ল জিনিসপত্রের উপর। যেগুলি নিয়ে চলেছে লন্ডনে। গান্ধী এত পোশাক পরিচ্ছদ ও অন্যান্য জিনিষপত্র দেখে বিরক্তিবোধ করলেন।

মীরাকে বললেন তাঁর অসন্তোষের কথা। তিনি মীরাকে এও জানিয়ে দিলেন যে এত জিনিসপত্তর নিয়ে লন্ডন যাওয়া যাবে না। তাঁর কাছে যে সমস্ত জিনিস অপ্রয়োজনীয় মনে হলো সেগুলি সম্বন্ধে মীরাকে বলে দিলেন। মীরা সেই সমস্ত জিনিসের একটা তালিকা প্রস্তুত করলেন। বাপুকে সেই সমস্ত জিনিসপত্রের তালিকা দেখানো হল। বাপু বললেন জাহাজ এডেন বন্দরে নোঙর করলে সেইখান থেকেই এ সমস্ত জিনিস বম্বে পাঠিয়ে দিতে হবে। সেই সমস্ত জিনিষপত্রগুলো প্যাকেটে করে বম্বে পৌছে গেল।

এডেনে বাপুর সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য এলেন প্রচুর সাংবাদিক। এডেনে বাপু সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রস্তুত। তিনি একটা সাংবাদিক সম্মেলন ডাকলেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে বাপুর আলোচনা হলো।

এরপর গান্ধীজি এলেন পোর্টসৈয়দে। মিশরের নেতৃবৃন্দ গান্ধীকে সাদরে বরণ করলেন। ফেরার পথে তাঁকে মিশরে নামার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন উপস্থিত সুধীবৃন্দ।

এডেন থেকে জাহাজ ছাড়লো। দেখা গেল ভূমধ্যসাগর, ক্রীট দ্বীপ। অপূর্ব সেই সাগরশোভা। বাপু ও মীরা এই দৃশ্য এর আগে দেখেছেন। তাই তাঁদের কাছে এই শোভা যতখানি আকর্ষনীয় তার চেয়ে অনেক বেশি যাঁরা এর আগে এই দৃশ্য দেখেননি তাদের কাছে। মীরা, বাপু, দেবদাস, পিয়ারীলাল, মহাদেব সহ প্রায় সকলেই ক্রীট দ্বীপের এই

অপরূপ দৃশ্য প্রাণভরে উপভোগ করতে লাগল।

তবে গান্ধীকে তাড়াতাড়ি লন্ডন পৌঁছতে হবে। যথাসময়ে রাউন্ড টেবেল কনফারেন্সে উপস্থিত হতে হবে তাঁকে। তাই জাহাজ Short cut রাস্তায় চলছিল। মার্সাইলিশ দ্বীপ হয়ে প্যারিসের মধ্যে দিয়ে গান্ধীকে পৌঁছতে হবে লন্ডনে। কথা ছিল লন্ডনে যাবার পথে সময় ও সুযোগ বুঝে রঁলার সঙ্গে দেখা করে যাবেন গান্ধী। কিন্তু সময়ের অভাবে তাঁকে রঁলার সঙ্গে দেখা করার চিন্তা পরিত্যাগ করতে হলো। জাহাজ এসে উপস্থিত হলো মার্সালিশ বন্দরে। জাহাজ নোঙর করল। অনেক সাংবাদিক এসে ভিড় জমালো সেখানে। সাংবাদিকরা অত্যন্ত রুচিশীল। গান্ধীকে তাঁরা নানান ধরনের প্রশ্ন করতে লাগলেন। গান্ধী তাঁদের কথার উত্তর দিতে দিতে যেন ক্লান্ত। সাংবাদিকদের মধ্যে Madeline Rolland, এক অধ্যাপক এবং Madame Edmond Privot ছিলেন গান্ধীর একান্ত অনুরক্ত।

মার্সালিশ বন্দরে গাড়ি প্রস্তুত। গান্ধীর পক্ষে আর বেশি সময় অপেক্ষা করা সম্ভব হলো না। গাড়ি ছুটল ট্রেন ধরার জন্য গান্ধীকে নিয়ে। ট্রেন-এ করে গান্ধী পৌঁছলেন ফ্রান্সের উত্তর উপকূলে। তখন সেখানকার আবহাওয়া ছিল খুবই শীতল। মীরা, মহাদেব, দেবদাস, পীয়ারিলাল-সকলের গায়ে গরম জামা কাপড়। গান্ধীর গায়ে কিন্তু কোন গরম জামাকাপড় নেই। তিনি প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতি যেন তাঁকে আপন করে নিয়েছে। গায়ে একখানা চাদর। কটিবস্ত্রপরিহিত গান্ধী চলেছেন। লন্ডনে গোলটেবেল বৈঠকে যোগ দিতে। গান্ধী অন্যান্য সঙ্গীসহ ইংলিশ চ্যানেল পার হলেন নৌকোযোগে। পৌঁছলেন লন্ডনের উপকূলে। সেখান থেকে গান্ধীকে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিল গাড়ি।

গান্ধীকে নিয়েপ্রাইভেট কার ছুটল ঘন্টায় ষাট মাইল বেগে। গান্ধীকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য এসেছিলেন অনেক বিশাল মাপের ব্রিটিশ অফিসার। তাঁরাও গান্ধীর সঙ্গে গেলেন। তবে মীরা, মহাদেব, দেবদাস, পিয়ারীলাল ট্রেনে করে চললেন।

ভিক্টোরিয়া স্টেশনে এসে গান্ধীর গাড়ি অপেক্ষা করছিল। মীরা, মহাদেব, প্রভৃতির জন্য। গান্ধীকে দেখার জন্য লোকের ভিড় যেন উপচে পড়ছে। কিংবদন্তী পুরুষ গান্ধী আবহাওয়া ছিল ভয়ঙ্কর খারাপ। আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টির ধারা ক্রমাগত পড়ে চলেছে। লন্ডনের বিপুল সংখ্যক জনতা বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে গান্ধী সন্দর্শনে অপেক্ষারত ভিক্টোরিয়া স্টেশনে।

লন্ডনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী মুরিয়েল লেস্টার (Muriel Lester) গান্ধী, মীরা ও অন্যান্যদের সাদরে আহ্বান জানাবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। লেস্টার একসময়ে কিছুদিন সবরমতি আশ্রমে কাটিয়েছিলেন। তিনি পরম গান্ধীভক্ত এবং গান্ধীদর্শণে ঘোর বিশ্রামী।

মুরিয়েল গান্ধী ও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে গেলেন পূর্বলন্ডনের কিংসি হলে। সেখানে অনেক কামরা। অপূর্ব সব ব্যবস্থা। প্রত্যেকের থাকার জন্য। মীরার থাকার কামরাখানা ছিল সকলের শেষে। গোলটেবেল বৈঠক আরম্ভ হবার বেশি দেরি নেই। গান্ধী ব্যস্ত, ভীষণভাবেই ব্যস্ত। বিভিন্ন ধরনের চিঠিপত্র লেখা। ডিকটেশন দেওয়া। তাঁর কাজের বিরাম নেই। চলেছ ত চলছেই।

গোলটেবেল বৈঠকের আয়োজন হয়েছে লন্ডনে পশ্চিমে অবস্থিত সেন্ট জেমসের

প্রাসাদে (St James s Palaee)। কিন্তু তাঁদেব থাকাব ব্যবস্থা হযেছে পূর্ব লন্ডনেব কিংসলি হলে। এখান থেকে সেন্ট জেমস প্রাসাদেব দূবত্ব অনেকখানি। তবে নাইটস্‌ব্রিজ হাউস (Knights bridge House) এ গান্ধী থাকতে পাবতেন। এটা পশ্চিম লন্ডনে অবস্থিত। কনফাবেন্স হলেব কাছাকাছি। এখানে বযেছে কনফাবেন্সেব অন্যান্য বডবড নেতৃবৃন্দ। পিযাবিলাল, মহাদেব, দেবদাস ও এখানে চলে এসেছে। কিন্তু গান্ধী কিংসলি হল-এ বাতেব বিশ্রামটুকু নিতে একান্তভাবে আগ্রহী। জাযগাটা তাঁব খুবই পছন্দ। তদুপবি আছেন মিঃ ও মিসেস জুবিযেল লেস্টাব। তাঁদেব সাহচার্য গান্ধী একান্তভাবে কামনা কবেন।

এবজন্য মীবাব খাটুনিও প্রচুব। সকাল ৮টাব মধ্যে গাডি আসে গান্ধীকে নিযে যাবাব জন্য কনফাবেন্স হলে। তাই মীবাকে গান্ধীব রুটিন মতন খাবাব দাবাবেব ব্যবস্থা কবে দিতে হয। তাঁব জামাকাপড পবিষ্কাব কবাব ঘব পবিষ্কাব কবাব তাঁব জন্য অল্প সমযেব মধ্যে বান্না বান্নাব ব্যবস্থা কবাব সবই মীবাব দাযিত্ব। তাবপব দুপুবে খাবাব নিযেও যেতে হয তাঁকে নাইটসব্রিজ হাউসে, পশ্চিম লন্ডনে। সেখানে গান্ধী এসে তাঁব দুপুবেব খাবাবটুকু খান। আব মহাদেব, পিযাবীলাল-এঁদেব সঙ্গে নানা আলোচনায মগ্ন হন। মীবা কিংসলি হল থেকে গান্ধীব খাবাব দাবাব তৈবি কবে যথাসমযে চলে যান নাইটসব্রিজ হলে। তিনি যাতাযাত কবেন টিউব বেলে। কনফাবেন্স হল থেকে গান্ধী যথাসমযে চলে আসেন নাইটসব্রিজ হলে। গান্ধীব খাওযা দাওযা সাঙ্গ হলে মীবা চলে আসেন কিংসলি হলে। তাঁব জাযগায।

বাজনৈতিক আলোচনা, কাজকর্ম সেবে গান্ধীব কিংসলি হলে ফিবতে যিবতে অনেক বাত হযে যায। কোন কোন সময বাত দু'টো হযে যায।

গান্ধীব লন্ডন আগমন ঘটল গ্রীষ্মেব শেষে। ভাবতেব সময আব লন্ডনেব সমযেব ব্যবধান অনেক। তাই মীবা গান্ধীকে ঘডিব কাঁটা লন্ডনেব সময অনুযাযী ঘুবিযে দিতে অনুবোধ কবলেন। গান্ধী মীবাব বা অন্য কাবও কথাতে কর্ণপাত কবলেন না। ঘডিব কাঁটা তিনি ভাবতীয সময অনুযাযী বেখে দিলেন। তবে এতে তাঁব কোন অসুবিধে হতো না। তিনি যথাসমযে সব ঠিকঠাক মতন চালাতে পাবতেন। মীবাব জীবনটাও চলছিল ঘডিব কাঁটাব মতন। একবাব ত গান্ধী এলেন বাত দু'টোব সময। তিনি গিযেছিলেন লযেড জর্জেব গ্রামেব বাডিতে। দিনেব বেলায কোন সভাসমিতিতে গান্ধী আলাপ আলোচনা চালাতে থাকলে মীবা ঘুমিয়ে নিতেন খানিক। গোলটেবিল বৈঠক চলাব সময এ ভাবেই মীবাব দিন কাটছিল।

আট

গোল টেবিল বৈঠক শনিবাব বসতো না। সেইদিনটিতে গান্ধী বিভিন্ন জাযাগায ভ্রমণে বেব হযে পডতেন। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, ইটন, বামিংহাম, ল্যাংকাশায়ারেব শ্রমিক কলোনীতে ঘুরতে যেতেন ট্রেনযোগে। সঙ্গে থাকতেন মীরা। গান্ধীর পোশাক ছিল গায়ে চাদর পরনে কটিবস্ত্র। ট্রেনযোগে বিভিন্ন জাযগায় যাবার সময় তাঁরা সুখনিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে যেতেন।

গান্ধী ইংলন্ডের বহু সমাজসেবী সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। তাদের সদস্যদের সঙ্গে এক আসনে বসে খেয়েছেন। খেয়েছেন আপেলের রস। আমের রস। মধু প্রভৃতি।

তবে মদ স্পর্শ করেননি কোনদিন। রানী একবার গান্ধীকে বার্মিংহাম প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করেন। রানীর নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য গান্ধীকে কোর্ট প্যান্টপরে যাবার জন্য মীরা অনুরোধ করেন। রানীরও তাই ছিল ইচ্ছে। কিন্তু গান্ধী অনড়, অটল। তিনি তাঁর পোশাক পাল্টাতে রাজি হলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করেই চললেন রাজপ্রাসাদে। রানীর আমন্ত্রণে।

গান্ধীর সঙ্গে ছিলেন মীরা, সরোজিনী নাইডু, মহাদেব দেশাই। সরোজিনী ছিলেন সাদা ধবধবে সিল্কের শাড়ি পরিধানরতা। আর মহাদেবের পরনে ছিল সাদা প্যান্ট-সার্ট। মীরার পোশাক যথারীতি। আর গান্ধীরও তাই।

গান্ধী রানীর আমন্ত্রণ রক্ষার্থে উপস্থিত। কিন্তু তাঁর চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ। তিনি রানীর সামনেই স্পষ্টতই বললেন এ সব অনুষ্ঠানের কোন প্রাণ নেই। নেই কোন আন্তরিকতা। লোকদেখানো আতিথিয়েতা রয়েছে। তবুও সৌজন্যের খাতিরে তিনি রানীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে রাজ-প্রাসাদে উপস্থিত।

এর মধ্যে গান্ধী মীরার সঙ্গে পরামর্শ করে এলবার্ট হলে (Albert Hall) একটি জনসভা করতে চাইছিলেন। কিন্তু তাঁর কিছু অনুরক্ত ব্রিটিশভক্ত তাঁকে এব্যাপারে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে অনুরোধ করেন। তাঁরা তাঁকে বুঝালেন যে ইংলন্ডের বুকের উপর বসে ইংরেজদের সমালোচনা করা উচিত হবে না। তিনি চিন্তা করলেন। মত পাল্টালেন।

তাঁর ইংরেজভক্তের দল একটা জিনিস বুঝতে পারলেন যে তিনি ল্যাঙ্কাশায়ারে গেলে সেইখানে শ্রমিকরা তাঁকে বিক্ষোভ দেখাবে। তাঁর স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমিকদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছে। বিদেশী কাপড় বর্জন করে এবং বিদেশী কাপড় পুড়িয়ে ভারতে ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে কাপড় আসা বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে এখানকার শ্রমিকদের রুজিরোজগার গেছে বন্ধ হয়ে। তাদের কাপড়ের মিল গুলির উঠেছে নাভিশ্বাস।

ব্রিটিশ সরকার তাই ভীত। গান্ধী ল্যাঙ্কাশায়ারে গেলে তাঁর উপর শ্রমিক শ্রেণী আক্রমণ-ও করতে পারে। গান্ধীর মনেও যে দ্বিধা-দ্বন্দ নেই তা নয়। তবুও তিনি চললেন ট্রেন যোগে ল্যাঙ্কাশায়ারে। সেখান থেকে গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলেছেন তিনি। তবে সঙ্গে রয়েছে সাদা পোশাকের সি আইডি। গান্ধীর গায়ে আঁচড় লাগলে ভারতে আগুন জ্বলবে- তা ব্রিটিশ সরকারের অনুধাবন করতে অসুবিধে হলো না।

কিন্তু দেখা গেল গান্ধীকে শ্রমিকশ্রেণী সাদরে গ্রহণ করছে। কোন কটূকথা তারা তাঁর বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেনি। তারা গান্ধীর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ। মীরা তাঁর বইতে লিখেছেন যে তিনি কয়েকজন শ্রমিককে নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে দেখেছেন। তাদের কথাও তিনি শুনেছেন। তারা পরস্পরকে বলিছল গান্ধী নিজের দেশের স্বার্থে সঠিক পথই অবলম্বন করছেন। দেশের মুক্তির জন্য। ইংলন্ড ভারতের মত পরাধীন থাকলে তারাও গান্ধীর পথই অবলম্বন করত।

এর মধ্যে গান্ধী ল্যাঙ্কাশায়ারে একটা মিলে এসে উপস্থিত হন। ম্যানেজার ত গান্ধীকে দেখে অবাক। ম্যানেজার গান্ধীকে শ্রমিকদের সামনে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন। গান্ধী সম্মত হলেন। তখন মিল চলছিল। গান্ধীর সম্মতি পেয়ে মিল ম্যানেজার ছুটির ঘন্টা বাজিয়ে

দিতে দারোয়ানকে নির্দেশ দিলেন। ঘন্টা বাজলো। শ্রমিকরা দলে দলে এসে এক বড় জায়গায় জড়ো হল। শ্রমিকদের মধ্যে মহিলার সংখ্যাই ছিল বেশি। তারা গান্ধীকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালো।

কেউ কেউ তাদের শিশুপুত্রদের নিয়ে এসে গান্ধীর আশীর্বাদ চাইল। তিনি শিশুদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। মনে হচ্ছিল সমবেত জনতা পয়গম্বর জ্ঞানে পূজোর ডালি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে গান্ধীকে সেবা দেবার জন্য। মীরা গান্ধী সহ একদিন গাড়ি যোগে দীর্ঘ ভ্রমণের সময় তাঁর মামার বাড়ি মিল্টন হ্যাথে (Milton Heath) এসে হাজির। মীরার মনে ছোটবেলার স্মৃতি জাগ্রত হলো। মা-বাবা গত হয়েছেন। দিদি রোহনা থাকে ভারতে। স্বামী আই. সি. এস অফিসার। আত্মীয় পরিজন বলতে এখন কেউ নেই এখানে। তবে এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ নির্মল। অপূর্ব সব পাখির কলধ্বনি মীরার কানে ভেসে আসতে লাগল। মীরা তন্ময় হয়ে গেলেন। তাঁর মন ছোটবেলার স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগল। গান্ধী তাঁর মনের অবস্থা অনুধাবন করতে পারলেন।

মানুষ তার শৈশবের স্মৃতি সহজে ভুলতে পারে না। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে মানুষের জীবন হয় আবর্তিত। সাধ্বী মীরার ক্ষেত্রে একথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য।

নয়

গোলটেবিল বৈঠকের পরিবেশ গান্ধীর মনঃপূত হলো না। পরিষ্কার ভাষায় তিনি বলেছেন গোল টেবিল বৈঠকের বিফলতার মূলে রয়েছে ইংরেজেদের সৎইচ্ছার অভাব। গান্ধী বললেন গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধী ব্যতিরেকে ভারত থেকে আর যাঁবা যোগ দিতে এসেছেন তাঁবা কেউ ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধি নন। তাঁরা ইংরেজদের চাটুকার। তাই তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন একমাত্র কংগ্রেসই ভারতীয় জনগণের মুখপত্র। এটিই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার ডাকে দেশে চলছে স্বাধীনতা সংগ্রাম।

তিনি ব্রিটিশ সরকারকে স্পষ্টতই জানিয়ে দিলেন যে অসহযোগ ও অহিংসা আন্দোলন চলবে। ইংরেজেদের উচিত সম্মানজনক শর্তে ভারতকে পূর্ণ স্বরাজ দিয়ে তাঁরা ভারত থেকে পাততাড়ি গুটান।

একদিন কনফারেন্স হলের বাইরে গান্ধী উপস্থিত সুধীবৃন্দের সম্মুখে স্পষ্ট ভাষায় বললেন। "আমাদের অসহেযোগ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ভারতের জন্য পূর্ণ স্বরাজ আদায় করা-প্রত্যেক পরাধীন জাতি পূর্ণ স্বরাজ লাভকরুক এটা তাঁর কামনা তারা স্বরাজ পেলে দেশ শাসনে যোগ্যতা দেখাতে পারবে কি পারবে না- তা ইংলন্ডের দেখার প্রয়োজন নেই।"

গান্ধী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে সাবধান করে দিয়ে বললেন যে গান্ধীসহ সব কংগ্রেস নেতাদের জীবন ব্রিটিশ সরকারের উপর নির্ভরশীল। সরকার যে কোন সময় তাঁদের জেলে বন্দি করে রাখতে পারেন। কিন্তু কোটি কোটি স্বাধীনতাকামী ভারতীয়কে তাঁরা জেলে বন্দি করে রাখতে পারেন কি? সমস্ত ভারতবাসী স্বাধীনতালাভের জন্য মরণপণ-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। এত অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও ইংরেজ ভারতকে স্বাধীনতা দিতে নারাজ। এর

পবিণাম যে ভযঙ্কব হতে বাধ্য তা গান্ধী স্পষ্ট ভাষায ব্রিটিশদেব বুঝিযে দিতে চান।

গান্ধী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য কবে বললেন তিনি স্বাধীনতাব জন্য ভাবতেব কোটি কোটি লোকেব বক্ত ঝবাতে চান না। উনি যেন ভাবতেব অগ্নিগর্ভ পবিস্থিতিব কথা বিবেচনা কবে ভাবতেব স্বাধীনতাব ব্যাপাবে অচিবেই স্থিব সিদ্ধান্ত গ্রহণকবেন। তিনি আবও বললেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যেন স্মবণে বাখেন এটাই তৃতীয এবং শেষ গোলটেবিল বৈঠক। অতএব ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যেন সাবধান হোন। নচেৎ গান্ধী ভাবতবাসীদেব নিযে ব্রিটিশেব বিরুদ্ধে বক্তক্ষর্যী সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য হবেন।

দশ

মীবাবেনকে বলাঁ লিখেছিলেন যে গান্ধী লন্ডন থেকে ফেব্বাব পথে যেন তাঁব সঙ্গে দেখা কবেন। গান্ধীব অতিসত্বব ভাবতে ফেবাব জরুবি প্রযোজন। কেন না ভাবতে লোকেবা জানে তৃতীয ও শেষ গোল'টেবিল বৈঠক বিফল হযেছে। ভাবতবাসী তা গান্ধীব মুখ থেকেই শুনতে চায। প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেবাব অপেক্ষায। গান্ধীব ভাবতে ফেবাব অপেক্ষায বযেছে জনগণ। গান্ধীব নির্দ্দেশে তাবা তুমুল আন্দোলনে ঝাঁপিযে পডবে। তবুও গান্ধী বলাঁব সঙ্গে দেখা না কবে যাবেন না। গান্ধী বলাঁব সঙ্গে দেখা কবাব জন্য সুইজাবল্যান্ড যাবেন। সেখান থেকে বিনদেশী (Bındesı) হযে যাবেন ইতালী।

তাই গান্ধী ঠিক কবলেন একদিন প্যাবিসে এবং একদিন বোমে কাটাবেন। বলাব সঙ্গে তাঁব প্রচুব আলোচনা আছে।

মীবা খাস ইংবেজ বমনী। তিনি বিলক্ষণ জানেন ইংবজেবা কাউকে ভদ্রতা দেখাতে কার্পণ্য ক বে না। মনে বিষ থাকলেও তাদেব বাহ্যিক ব্যবহাব এতই মধুব যে তা কখনো মুখে প্রকাশ পায না। মীবা বলেছেন তাঁবা লন্ডন থেকে বিদায নিতে পেবে হাঁফ ছেডে বেঁচেছেন। সুস্থভাবে তাঁবা নিঃশ্বাস নিতে পাবছেন। কথা বলতে পাবছেন ভনিতা নেই। কপটতা নেই। নিজেকে গোপন কবাব চিন্তা নেই। মীবাব মন্তব্য যে কোন লোককে ইংবেজদেব চবিত্রেব স্বরূপ উদঘাটনে সাহায্য কববে। তিনি স্পষ্টভাষায বলেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদীবা তাদেব আসলরূপ কাউকেও বুঝতে দেয না। বাহ্যিক মিষ্টমধুব ব্যবহাবেব আডালে যে তাবা ছুবিতে শান দেয এই কথা অনেকেই বুঝতে পাবে না। সাম্রাজ্যবাদীবা হাসিমুখে লোক খুন কবতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ কবে না।

গান্ধী এব মধ্যে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিব সঙ্গে দেখা কবেছেন। অনেকেই তাঁব ব্যক্তিত্ব ও ব্যবহাবে মুগ্ধ। দু'জন ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চেব লোককে গান্ধীব দেখাশোনা কবাব জন্য সবকাব দিযেছিল। এই কযদিন গান্ধীব সঙ্গে কাটিযে তাঁবা তাঁব ব্যবহাবে মুগ্ধ। তাঁবা গান্ধীকে ছাডতে নাবাজ। তাঁবা গান্ধীব সঙ্গে বিনদিশী (Bındısı) যেতে আগ্রহী। কিন্তু সবকাবেব অনুমতি ব্যতিবেকে তাদেব পক্ষে গান্ধীব সঙ্গে যাওয়া সম্ভবনয়। গান্ধী Sır Samuel Hoare কে চিঠি লিখলেন। ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চেব অফিসারবা যে তাঁর সঙ্গে বিনদিশী যেতে চান তাও জানালেন। গান্ধীব চিঠিব ভাব ও ভাষা এতই সুললিত এবং যুক্তিপূর্ণ ছিল যে সরকাব ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের অফিসাবদ্বয়কে গান্ধীর সঙ্গে যাবাব সম্মতি জানাল। অফিসারদ্বয় গান্ধীর সঙ্গে ইতালির দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত এলেন।

গান্ধী প্রথমে এলেন প্যারিসে। এক বিশাল হলে প্যারিসের জনগণ জনসভার ব্যবস্থা করলেন। হলে প্রচুর লোক সমাগম হলো। তিল ধারণের জায়গা ছিল না। বাইরেও প্রচুর লোক জড়ো হয়েছিল। গান্ধীর বক্তৃতা সকলেই আগ্রহভরে শুনল। তারা লিখিত আকারে অনেক গুলি প্রশ্ন গান্ধীকে দিল। প্রশ্নের পরিমাণ এতই বিশাল ছিল যে তাঁর পক্ষে সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না এত অল্প সময়ের মধ্যে। গান্ধীকে সভাস্থল থেকে চলে আসতে হল যথাসময়ে। তবে তাঁকে মাউন্টপুলিশের সাহায্য নিতে হয়েছিল।

গান্ধী চলে এলেন অতিথিশালায়। বিশ্রাম করলেন। সেখান থেকে পরদিন Madam Guicysse র বাসভবনে এলেন। ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হলো। তিনি ছিলেন গান্ধীর পরমভক্ত। তিনি একটি সংস্থা গঠন করলেন। নাম দেওয়া হল Association of the Friends of Gandhi. গান্ধীর মতামত নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা চলত। পরদিনই গান্ধী মীরাও অন্যান্যদের নিয়ে ভিলন্যাভের পথে রওনা দিলেন। রলাঁ সেখানে গান্ধীর জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন।

এর মধ্যে রলাঁর একটা ভীষণ বিপদ ঘটে গেল। রলাঁর গৃহ দুষ্কৃতিকারিদের দ্বারা আক্রান্ত হলো। রলাঁর অনেক দামী জিনিস দুষ্কৃতিকারীরা নিয়ে গেল। রলাঁ তখন গুরুতর অসুস্থ। কঠিন ব্রঙ্কাইটিশ রোগে আক্রান্ত। সেই সময় গান্ধী-মীরাসহ রলাঁর বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। গান্ধীকে দেখে রলাঁ খুবই আনন্দিত। যেন কতদিন পরে এক অতি আপনজনের সাক্ষাত পেলেন তিনি।

রলাঁ অসুস্থ। তার মধ্যেও তিনি গান্ধীর জন্য দু'টো সমাবেশের ব্যবস্থা করলেন। জেনিভাতে একটি, লুই সানে-তে আরেকটি। মীরা রলাঁ সন্নিধানে এসে যেন একটু পাল্টে গেলেন। মীরা রলাঁর কাছে এসেছিলেন বিটোফেনের ফিফথ্ সিম্পোনি শোনার অভিপ্রায়ে। মীরা এখন আবার যেন তাঁর পুরনো গানের জগতে ফিরেযেতে আগ্রহী। কিন্তু গান্ধীর মোহজাল থেকে তিনি কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন না। মানসিক দ্বন্দ্বে তিনি ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু কোন উপায় নেই ফেরার। তাই মনের সুপ্ত অভিপ্রায়কে অবদমিত করলেন। বৃহৎ কাজের কথা চিন্তা করে।

রলাঁ তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন গান্ধী হচ্ছেন সন্ত ফ্রান্সিস বা সন্ত ডেমিনিক। অসাধারণ এই লোকটিকে রলাঁ ভগবানের মত শ্রদ্ধা করেন। তিনি বলেছেন ছোটখাটো দেখতে গান্ধীকে মনে হয় যেন এক অর্ধনগ্ন ফকির। তাঁর দাঁত নেই। চোখে বার্ধক্যজনিত চশমা। মাথা কামানো। তবে কিছু খোঁচা খোঁচা চুল রয়েছে। মুখে শান্ত ও মিষ্ট হাসি। মুখটি ফোলা। তাঁর মুখখানা দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা কুকুরের মুখ। সুন্দর রঙ দিয়ে আঁকা। গান্ধী রলাঁর ঘাড়ে চুমু খেলেন। মনেহচ্ছিল স্বর্গের একদেবদূতের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁর ঘরে। সত্যিই তিনি ছিলেন দেবদূত।

রলাঁর সঙ্গে গান্ধীর কথাবার্তার ভাষ্যকার ছিলেন রল্যাঁর বোন। মীরার সাহায্যেও তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা চলত। রলাঁ ও গান্ধীর কথপোকথনের সময় কিছু ফটোগ্রাফারও সেখানে উপস্থিত থাকত।

সন্ধ্যা সাতটার সময় একতলাতে প্রার্থনাসভা বসত। তখন আলো কমে আসতো। গান্ধীও তাঁর সঙ্গীরা বসত মাটিতে। কার্পেটে। গান্ধী সঙ্গীছাড়া আরও কিছু প্রবাসী ভারতীয়

ও সুইজবাসী সেখানে উপস্থিত থাকত। তাঁরা গান্ধীর উপদেশমূলক ও দার্শনিক কথাবার্তাগুলো মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন। গীতা থেকে আবৃতি করে তিনি তাঁর প্রার্থনাসভা আরম্ভ করতেন। তারপব পুরাণ থেকে সংস্কৃত ভাষায় তিনি প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করতেন। গান্ধী নিজেই আবার তা ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিতেন। তারপর রামসীতার কাহিনী অতি সুললিত ভাষায় বলে যেতেন। মীরা ইংরেজী এবং ফরাসী ভাষায় তা অনুবাদ করে অতি সুন্দরভাবে সুধীগণের সামনে বলে যেতেন। এক অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হতো তখন। পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক গান্ধীর প্রতিটি কথা যেন উপস্থিত সুধীবৃন্দকে মোহজালে আবৃত করে রাখতো। গান্ধী আবার রাত তিনটায় প্রার্থনা সভায় বসতেন। শরীরে ক্লান্তি বলে তাঁর কিছু ছিল না। অথচ তাঁকে দেখলে মনে হতো তিনি ক্লান্ত।

রোমের বুর্জোয়া ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ গান্ধীকে মোটেই ভালো চোখে দেখেননি। উগ্র জাতীয়তাবোধ, অস্ত্রের ক্রমাগত উৎপাদনবৃদ্ধি, মানুষের পরস্পরের বিরুদ্ধে রনং দেহি ভাব বিশ্বে যে অশান্তির সূত্রপাত ঘটাতে চলেছে তাতে গান্ধী চিন্তিত। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে মালিক-শ্রমিক সংঘাতকেও গান্ধী ভালো দৃষ্টিতে দেখেননি। এর বিরুদ্ধে তিনি কঠোর মন্তব্য করেছেন।

গান্ধীর মানসিক অবস্থা ঘটনাচক্রের আবর্তে ক্রমাগত পাল্টে গেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে তিনি সত্যকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। শৈশবে তাঁর ধারণা ছিল ভগবানই সত্য। এখন তাঁর মত হচ্ছে সত্যই ভগবান।

মীরা ও রলাঁর মত গান্ধীও ছিলেন গানের পরম ভক্ত। সুরশিল্পীদের গুণমুগ্ধ। বিটোফেন সম্পর্কে তাঁর ছিল বিশাল ধারণা ও শ্রদ্ধা। তার গানের সুর বাজাতে রলাঁ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। মীরা ত রলাঁ সন্নিধানে এসেছিলেন বিটোফেন-এর ফিফথ্ সিম্পোনি শোনার জন্য। ভাগ্যচক্রের আবর্তে রলাঁর মাধ্যমেই মীরা গান্ধীর পরিচয় পান। পরে মন্ত্রমুগ্ধের মত রলাঁর কাছে গান্ধীর কাহিনী শুনে মোহিত হন। তারপর গান্ধীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

রলাঁর বাজনাতে গান্ধী বিটোফেন-এর ফিফথ্ সেম্পোনির অপরূপ ঝঙ্কার শুনলেন। মোহিত হয়ে গেলেন। গান্ধীকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন রলাঁর বাজনা শুনতে শুনতে তিনি ধ্যানস্থ হয়ে পরমপিতা ভগবানের শ্রীচরণে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাজনার সুর গান্ধীর হৃদয়ে অপূর্ব মোহজালের সৃষ্টি করল।

রলাঁ বুঝতে পেরেছেন গান্ধীর মন প্রাণ জুড়ে রয়েছে হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিকতা। তিনি সত্যকেই ভগবান বলে মনে করেন। তাই তিনি ছিলেন আজীবন সত্যের উপাসক। রলাঁ ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারলেন যে গান্ধীর হৃদয় ছিল একদিকে কুসুমের মত কোমল অন্যদিকে বজ্রের মতন কঠিন। ইতালির বিদগ্ধজনেরা গান্ধীকে ভগবানের অবতাররূপে শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন।

ভিলন্যাভেতে থাকাকালীন গান্ধীর প্রাতঃ ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন দু'জন অধ্যাপক প্রাইভেট এবং তাঁর স্ত্রী। আর একজন খ্যাতনামা সমাজসেবী পিয়েরে সেরিসোল (Pierre Ceresole)। অধ্যাপক প্রাইভেট ও তাঁর স্ত্রী অধ্যাপিকা মিসেস প্রাইভেট গান্ধীর সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন। কিন্তু পিয়েরে সেরিসোলে ভারতে আসতে পারেননি। যদিও বা ভারতে আসার জন্য এবং গান্ধীর সঙ্গে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করার জন্য তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। কিন্তু তিনি

সেই সময় ওয়েলস-এ সমাজসেবার কাজে বিশেষভাবে জড়িয়েছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে ভারতে আসা সম্ভব হয়নি।

গান্ধীজি এরপর ছুটলেন রোমে। রোমে তিনি মুসোলিনীর সঙ্গে দেখা করলেন। রলাঁর বন্ধু রোমের জেনারেল মরিস। তিনি তাঁর কাছে চিঠি দিলেন। গান্ধীর যাতে রোমে থাকা-খাওয়ার কোন অসুবিধে না হয় তাঁর দিকে নজর দিতে অনুরোধ করলেন মরিসকে। গান্ধী ভ্যাটিকান-এ পোপের বিশাল প্রাসাদে যিশুর মূর্ত্তির দিকে গান্ধী নিবিষ্ট নয়নে তাকিয়ে ছিলেন বেশ কিছুসময়। মীরা গান্ধীর মানসিক অবস্থা অবলোকন করলেন। যিশুর ক্রুশ বিদ্ধ মূর্ত্তিটি গান্ধীর সমস্ত হৃদয় মনকে বিদারিত করল। গান্ধী অশ্রু সম্বরণ করতে পারলেন না।

রোমে গান্ধী, মীরা, মহাদেব ও অন্যান্যদের থাকা-খাওয়ার অপূর্ব ব্যবস্থা ছিল। গান্ধী, মুসোলিনীর ব্যবহারে মন্ত্রমুগ্ধ। গান্ধী চার দিন রোমে কাটালেন। তারপর জাহাজে করে দেশে ফিরলেন। ডিটেকটিভ্ ডিপার্টমেন্টের বিরাট মাপের দু'জন অফিসার গান্ধীকে বিদায় জানালেন।

জাহাজে ভারত অভিমুখে যাত্রাটা ছিল খুবই আরামপ্রদ ও স্নিগ্ধ। জাহাজটিও ছিল অপূর্ব। গান্ধী-মীরা-মহাদেব ও অন্যান্যদের এতদিন বিদেশ ভ্রমণের ক্লান্তি যেন জাহাজে উঠেই দূরীভূত। জাহাজ ধীরে ধীরে বম্বে বন্দরের দিকে এগোল।

অবশেষে জাহাজ এসে বম্বে বন্দরে নোঙর করল। গান্ধীকে দেখার জন্য হাজার হাজার জনতা উৎসুক। স্থির ছিল গান্ধী বম্বেতে এসে উপস্থিত হলে তাঁকে সরকাব গ্রেপ্তার করবে। কিন্তু গান্ধীদর্শনে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতি ভারত সরকারের ভীতির কারণ হয়ে দেখা দিল। সুচতুর ইংরেজ সরকার ডঃ আহমদকরকে গান্ধীর বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিল। আহমদকর তাঁর সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে কালোপতাকা হাতে গান্ধীর বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে লাগল। গান্ধী নির্লিপ্ত। আহমদকর-কে কোন কিছুই বললেন না।

তিনি সোজাসুজি মীরা ও অন্যান্যদের নিয়ে চলে এলেন "মণিভবনে"। এখানে দ্বিতলের এক বিশাল কক্ষে তার থাকার ব্যবস্থা হল। গান্ধী খবর পেলেন নেহরু জেলে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা এসে উপস্থিত হলেন মণিভবনে। গান্ধীর সঙ্গে নানান গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো। তখন আরউইনের স্থলে এসেছেন উইলিংডন। অত্যন্ত বদমেজাজী। গান্ধীজি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতকারের জন্য অনুমতি চাইলেন। ভাইসরয় উইলিংডন ঘৃণাভরে গান্ধীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন।

ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে আলোচনা হল। গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ডাক দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুযায়ী এই আন্দোলন কিছুকাল স্থগিত ছিল। এই চুক্তি অনুযায়ী এটা অনুমান করা গিয়েছিল ভারত অচিরেই স্বয়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করবে। কিন্তু উইলিংডন আসার পর থেকে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল।

বুঝা যাচ্ছিল গান্ধী অচিরেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবেন। সরকার চারদিন ধরে গান্ধীর উপর কড়া নজর রাখল। বিক্ষুব্ধ জনতার আক্রোশ কিছুটা প্রশমিত হল। সরকার সিদ্ধান্ত নিল এবার তারা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করবে। ৪ঠা জানুয়ারি গান্ধীজি গ্রেপ্তার হলেন।

সেদিন ছিল গান্ধীর মৌন দিবস। বম্বের পুলিশ কমিশনার স্বয়ং এসেছিলেন গান্ধীকে গ্রেপ্তার করতে। মীরা গান্ধীর সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে দিলেন। যাতে জেলে তাঁর কোন

অসুবিধে না হয়। গান্ধীকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হল Yarveda জেলে। গান্ধী জাতির উদ্দেশ্যে একটা সংক্ষিপ্ত লিখিত ভাষণ রেখে গেলেন।

বিপুল সংখ্যক জনতা গান্ধীর এই গ্রেপ্তার স্বচক্ষে দেখলেন। গান্ধীজি জিন্দাবাদ ধ্বনিতে আকাশবাতাস মুখরিত হলো। অদূরে দাঁড়িয়েছিল মহাদেব ও মীরাবেন। গান্ধীকে গাড়িতে তোলার সময় জোরপূর্বক অনেকেই তাঁর পা স্পর্শ করে প্রণাম করলেন। গান্ধী জেল থেকে পরদিনই মীরার কাছে একখানা চিঠি পাঠালেন। মীরা এই চিঠি থেকে জানতে পারলেন বল্লভভাই প্যাটেলও রয়েছেন সেই জেলে।

এগার

মীরা বম্বেথেকে সবরমতি আশ্রমে ফিরে এলেন। চারদিকে নানান গোলমালের খবর এসে পৌঁছতে লাগল তাঁর কাছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি-কে বেআইনী ঘোষণা করা হল। মহাদেব ও পিয়ারিলালকে গ্রেপ্তার বরণ করতে হলো। ইংরেজ সরকারের অত্যাচারের মাত্রা যেন ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। মীরা সবরমতি আশ্রমে থাকতে চাইলেন না।

বম্বে যাবার জন্য গান্ধীজির অনুমতি চেয়ে চিঠি দিলেন। তিনি উত্তরে মীরাকে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে বললেন। মীরার বহু গুণমুগ্ধ লোক বম্বেতে এসে উপস্থিত হলেন। মীরার বম্বে আগমনের সংবাদ চারিদিকি ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর কাছে লোক আসতে লাগল দলে দলে। যাঁদের গ্রেপ্তার হওয়ার ভয় ছিল তাঁরা এলেন ছদ্মবেশে।

ধনীদরিদ্র সকলেই মীরার সঙ্গে দেখা করতে লাগলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কিছু সদস্য জেলের বাইরে ছিলেন। তাঁরা সকলের কাছ থেকে চাঁদা তুলে মীরার জন্য একখানা টাইপিং মেশিন ও সাইক্লোস্টাইল মেশিন কিনে দিলেন। বম্বেতে ইংরেজ সরকারের অত্যাচারের কাহিনী স্বচক্ষে অবলোকন করে মীরা রিপোর্ট তৈরি করতে লাগলেন। এই সমস্ত রিপোর্টে গোপনে ইংলন্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের পাঠাতেলাগলেন। মীরার রিপোর্টের উপর গুরুত্ব আরোপ করে স্যার স্যামুয়েল হোর (Sir Samuel Hoare) হাউস অব কমন্স সভায় ক্ষোভ প্রকাশ্র করে তাঁর বক্তব্য পেশ করলেন। ভারত সরকারকে এ সমস্ত ব্যাপারে মতামত জানাতে ইংলন্ড থেকে নির্দেশ এলো। ভারত সরকার মীরাকে অবিলম্বে বম্বে ত্যাগ করতে নির্দেশ দিল।

মীরা কিন্তু নির্লিপ্ত। তিনি বম্বে ছাড়তে অনিচ্ছুক। মীরাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার বরণ করতে হল। বিচারের প্রহসন করে তাঁকে তিন মাসের কারাদন্ড দেওয়া হল।

আর্থার রোডের জেলে মীরাকে নিয়ে যাওয়া হল। জেল কর্তৃপক্ষ পড়ল বিপাকে। তাঁকে জেলে কিভাবে রাখা হবে তাই নিয়ে জেল কর্তৃপক্ষ চিন্তিত। জেলখানার সুপার, জেলার ও মেট্রন বসে স্থির করলেন মীরাকে অন্যান্য বন্দিদের সঙ্গে বিশাল এক কক্ষে থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা। জেলখানা গুজরাটি ও মারাঠী মহিলা আন্দোলন কারীদের দ্বারা পূর্ণ। তাঁর জন্য কোন আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা গেল না। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মীরাকে জেলখানার বারান্দায় থাকতে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তা

মীরাকে বলে দেওয়া হল। মীরা প্রস্তুত।

মীরার কয়েকদিন এইভাবে কেটে গেল। তারপর তাঁর জন্য একটা আলাদা ঘরের ব্যবস্থা হল। সে ঘরে রান্না করে কোনরকমে থাকার ঠাঁই হলো। কিন্তুপড়াশুনা করার জন্য একটি ছোট টেবেল রাখার জায়গাও সেঘরে ছিল না।

বার

জেল থেকে মীরা গান্ধীজিকে চিঠি দিলেন। গান্ধীজির কাছে জানতে চাইলেন কি ধরনের বই-তাঁর পড়া উচিত। গান্ধীজি মীরাকে উপনিষদ ও রামায়ন-মহাভারত মনোযোগ সহকারে পড়তে নির্দেশ দিলেন এবং বলে দিলেন এর মধ্যেই হিন্দুর সনাতন ধর্মের সত্য রূপটি প্রতিফলিত। মীরা কঠোর সাধনায় লিপ্ত হলেন। উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত হলো তখন থেকে তাঁর প্রাণের ও জ্ঞানের আধার। রামায়ণ মহাভারত ও উপনিষদ পাঠ করে তিনি হিন্দুর সনাতন ধর্মের আসল সত্যরূপটি উদ্‌ঘাটনের জন্য সচেষ্ট।

জেলখানায় মীরা আশ্রমজীবনের নিয়ম-কানুন ও রীতিনীতি গুলি কঠোরভাবে মেনে চলতেন। সন্ধ্যা-আহ্নিক-ও জপতপ ছিল তাঁর নিত্যদিনের সাথী।

এর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক নেত্রী কমলাদেবীকেও বন্দি করে সেই জেলে নিয়ে আসা হলো। 'বি' ক্লাশ বন্দিনী হিসেবে তাঁকে রাখা হয়েছে। একমাত্র মীরা, গান্ধীপত্নী কস্তুরাবা ও সরোজিনী নাইডুকে 'এ' ক্লাশ বন্দীনী হিসেবে রাখা হয়েছে সরকারি হুকুমে। মীরা ও কমলাদেবী-জেলে তুমুল সোরগোল শুরু করল জেল কর্তৃপক্ষের অবিবেচনা প্রসতি এ সমস্ত কার্যকলাপের জন্য। জেল সুপার অতিবিরক্ত হয়ে উঠলেন। কমলা দেবী ও মীরাকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। রাখা হলো এক আলাদা ঘরে। সিক্লাশ বন্দিনীদের ঘরের কাছেই। তার সামনে ছিল বিশাল এক ফুলের বাগান। বাগানে ছিল ছোট ছোট বেশ কিছু অপূর্ব সুন্দর ফুলের গাছ। গাছগুলি যেন সবুজের প্রতিমূর্ত্তি। মীরার মনে প্রকৃতি যেন দোল খেয়ে যাচ্ছিল।

সন্ধ্যা সমাগমে মীরাদের বাইরে থাকার উপায় থাকত না। ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হতো। মীরা চাইতেন ঘরের বাইরে প্রকৃতির কোলে ঘুমোতে। কিন্তু সেই অনুমতি মীরা পেলেন না।

পরদিন সকালে কমলাদেবী এলেন বাগানে। তাঁর মাথায় লালফুল। তাঁকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে এল ম্যাট্রন। অত্যন্ত ভালো মহিলা। তিনি কমলাদেবীর দিকে তাকালেন। মাথার গোঁজা ফুল লক্ষ্য করলেন। ম্যাট্রন নির্দেশ দিলেন যে এর পর যেন মাথায় লালফুল ব্যবহার না করেন।

দিনের প্রখর রোদ। মীরা ও অন্যান্য আশ্রমবাসিরা তাঁদের কাপড় ধুয়ে শুকোতে দিল রোদে। কিন্তু সন্ধ্যার সময় ম্যাট্রন এল ঘরে। রোদে কাপড় শুকোতে দিতে মীরাকে ম্যাট্রন বারণ করল। মীরা উত্তর দিলেন রোদে কাপড় শুকোতে দিতে আপত্তি থাকার হেতু কি? ম্যাট্রন উত্তর দিল সুপারের স্ত্রীর আদেশ।

আর একটা বিশ্রী পরিবেশ জেলের পবিত্রতা নষ্ট করল। বাইরের আবর্জনার দূষিত গন্ধ। রাস্তা দিয়ে চলত সারি সারি মরা পশুর মৃতদেহ। জেলের কাছেই ছিল ডাম্পিং গ্রাউন্ড।

সেখানেই মরা পশুর মৃতদেহ গুলিকে ফেলে দেওয়া হতো।

জেলের কাছেই ছিল শ্রমিকদের খাটা পায়খানা ও প্রস্রাবের জায়গা। জেলের কয়েদিরা বিশ্রী পরিবেশে এবং আশেপাশের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। সুপারের কাছে নালিশ জানিয়েও এর প্রতিকার তারা পেতো না।

আর্থার রোডের জেলখানার বিপরীত দিকে ছিল হাসপাতাল। সেইখানে প্রচুর বসন্ত রোগীকে রাখা হতো। দৈনিক পাঁচসাত জন বসন্ত রোগীর মৃত্যু হতো। মৃত্যুর পর মৃতদেহগুলি হরিনাম সংকীর্ত্তন করে দাহ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হতো আর কয়েদীদের জীবন হয়ে উঠত দুর্বিসহ।

এরকম পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবার জন্য মীরা কমলাদেবী ও অন্যান্য কয়েকজন চেষ্টা করতেন। বইপড়া, ব্যায়াম করা, প্রার্থনা বা দড়িনিয়ে লাফানো এ ছিল তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের কাজ। এর মধ্যে মীরার সাথি হল একটি বিড়াল। মীরা বিড়ালটিকে ভালবাসতেন। কিন্তু বিড়ালটি মীরার মাখন চুরি করে নিয়ে যেত। মীরা তাই অত্যন্ত বিরক্তবোধ করতেন। বিড়ালটিকে নজরে নজরে রাখতে হতো।

এভাবে মীরার বেশকিছুদিন কেটে গেল। এরমধ্যে হঠাৎ এক সরকারি নির্দেশে কমলাদেবীকে অন্য জেলে চলে যেতে হলো। মীরা হয়ে গেলেন একাকিনী। অবশ্য বেশিদিন তাঁকে একাকিনী থাকতে হয়নি। কয়েকদিনের মধ্যে সরোজিনী নাইডুকে গ্রেপ্তার করে এ জেলেই পাঠানো হলো।

তাঁর রাজসিক ব্যবস্থা এ ক্লাশ বন্দি। তার উপর তার জন্য রয়েছে বিশেষ সব ব্যবস্থা। মীরাও 'এ' ক্লাশ বন্দিনী। তবুও সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে তাঁর থাকার ব্যবস্থার ফারাক অনেক। সরোজিনী দেবীর জন্য নিয়মিত 'টাইমস অব ইন্ডিয়া'' পত্রিকা রাখার ব্যবস্থা হল। মীরার সঙ্গে সরোজিনীদেবীর হৃদ্যতা গাঢ় থেকে গাঢ়তম হয়ে উঠল। মীরা ও সরোজিনী দেবী দু'জনে মোটামুটি একটা সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলল জেলে। কিন্তু অচিরেই সরোজিনী দেবীকেও অন্যত্র বদলি করা হলো। মীরা আবার হয়ে গেলেন একাকিনী।

এর মধ্যে মীরার কাছে গান্ধীর একখানা চিঠি এলো। গান্ধীর চিঠিতে মীরা জানতে পারলেন সরকার সম্ভবত মীরাকে মুক্তি দেবেন। তখন বম্বে নগরী ধারণ করেছে এক হিংস্ররূপ। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার দাবানলে বম্বে নগরী জ্বলছে। এর মধ্যেই মীরা জেল থেকে মুক্তি পেলেন। গান্ধীশিষ্য ধর্মদাস এসে মীরাকে নিয়ে গেলেন গাড়ি করে। মালাবার হীলস-এ তাঁর ধর্মশালায়।

তের

মীরা উঠলেন ধর্মদাসের অতিথিশালায়। মীরার মাথায় তখন বিভিন্ন পরিকল্পনা। কিন্তু বাইরে চলছে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। মীরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করার জন্য উদ্‌গ্রীব। অস্থির চিত্তে মীরা চিন্তা করতে লাগলেন গান্ধীর সঙ্গে তাঁকে দেখা করতেই হবে। মীরাকে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিল না সরকার। মীরা কিন্তু সংকল্পে অটল। গান্ধীর সঙ্গে দেখা করবেনই। শেষ পর্যন্ত জেলে গিয়ে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলেন।

গান্ধীর নির্দেশে মীরা ছুটলেন ছাপড়াতে। রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। রাজেন্দ্র প্রসাদ তখন ম্যালেরিয়া রোগে গুরুতর অসুস্থ। এর মধ্যে মীরার উপর আবার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলো। কিন্তু তখন ছাপড়াতে মেয়েদের জন্য কোন জেলখানা ছিল না। তাই সরকার আপাতত মীরাকে জেলে পাঠাবার চিন্তা থেকে বিরত হল।

পরদিন সকালে মীরা ছুটলেন বেনারসে। মিলিত হতে চলেছেন মদনমোহন মালব্য-এর সঙ্গে। বেনারসে গিয়ে মীরা উঠলেন শিবপ্রসাদ গুপ্ত-র বাড়িতে। শিবপ্রসাদগুপ্ত ছিলেন মদনমোহন মালব্যের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দুর্ভাগ্য মীরাকে পিছুন পিছুন তাড়া করছে। মীরা শারীরিক ভাবে ভীষণ কাহিল। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। জ্বর নিরসন হচ্ছে না। ডাক্তার এলেন। শিবপ্রসাদবাবু মীরার জন্য একজন ইংরেজ সেবিকার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু দেখা গেল সেবিকাটি একজন ইংরেজ গুপ্তচর। মীরা তা উপলব্ধি করতে পারেননি। সেবিকাটিকে ছাড়িয়ে দেওয়া হলো। মীরা এরমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

রাজেন্দ্রপ্রসাদও এর মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। কংগ্রেসের প্রথম সারির বহু নেতা তখন জেলে। তবে অল্পদিনের মধ্যেই অনেকেই ছাড়া পেলেন। রাজেন্দ্র প্রসাদের পরামর্শে মীরা বম্বে ছুটলেন। গান্ধী সন্নিধানে। কিন্তু মীরাকে এবার জেলে যেতে হল। এক বছরের জন্য। জেলে কারও সঙ্গে মীরার সাক্ষাত করা সম্ভব হচ্ছিল না। সরকারের নির্দেশে। একবছরের জন্য মীরার আবার নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রা শুরু। বম্বের আর্থার রোডের জেলেই রয়েছেন মীরা।

চৌদ্দ

মীরার এখন অফুরন্ত সময়। পড়াশুনা করার। বেদ, উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত মীরার নিত্যসঙ্গী। গান্ধীর পরামর্শে মীরা এ সমস্ত পুস্তকের মধ্যে ডুবে রইলেন। গান্ধী মীরাকে পড়তে বললেন আমির আলির "spirit of islam" বইখানা। আর কোরাণ।

মীরার মনে নানান চিন্তা। গান্ধীচিন্তায় মীরা অস্থির। এর মধ্যে খবর এলো 'বাপু' অনশন করছেন। "সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা" আইনের বিরুদ্ধে এই অনশন। ম্যাকডোনাল্ড তখন ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী। তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য আলাদা সংরক্ষণ। ভোটের ব্যাপারে। গান্ধী তা মেনে নিতে পারলেন না। এ বিভাজন নীতি যে অচিরে ভারতকে কাবু করে দেবে। গান্ধী তার সঙ্গীদের তা বোঝাতে অপারগ। আহম্মদকর 'সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার' সপক্ষে অনেক যুক্তি দেখালেন। গান্ধী কোনটাই মানতে নারাজ। শেষ পর্যন্ত গান্ধীর চরম সিদ্ধান্ত। আমরণ-অনশন। দেশবাসি উত্তাল। আহম্মদকর ও মৌলানা আজাদ ছুটলেন পুনা জেলে।

শেষ পর্যন্ত 'সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা' বা 'Communal Award Bill' কিছুটা অদলবদল করা হলো। গান্ধীর নির্দেশে। গান্ধী অনশন ভঙ্গ করলেন। আহম্মদকর ও মৌলনার অনুরোধে তিনি আইনটা বলবৎ করার সম্মতি দিলেন। গান্ধীও ব্রিটিশ বিভাজন নীতির ফাঁদে পা দিলেন। যার বিষময় ফল দেশবাসি আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে। গুরুদেবও এসেছিলেন পুনা জেলে। গান্ধীকে অনশন ভঙ্গ করার জন্য অনুরোধ জানাতে।

গুরুদেবসহ ভারতবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। মীরাও নিশ্চিন্ত হলেন এ খবর শুনে। মীরার সঙ্গে জেলে একই ঘরে থাকত কিষাণ নাম্নী এক মহিলা। খুবই গরীব। নিজের সন্তানকে হত্যা করেছে অভাবের তাড়নায়। মীরার সঙ্গে তার গভীর ভাব। মীরা কিষাণের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের নিদর্শন দেখলেন। কিন্তু কিছুদিন পরই কিষাণকে অন্যত্র বদলি করা হল। মীরা নিজের ঘরে একাকিনী। জেলের নিয়ম অনুসারে তাঁকে একা থাকতে দেওয়া যায় না। মীরা কিন্তু কিষাণের পরিবর্তে অন্য কোন মেয়েকে তাঁর ঘরে স্থান দিতে নারাজ। এলেন হাসপাতালের Superintendent. মীরাকে বোঝালেন তাঁকে এক ঘরে একা থাকতে দেওয়া যাবে না। আইনের ধারানুযায়ী। অনেক জোরাজুরির পর মীরা সম্মতি দিলেন। তবে যে তাঁর কক্ষে থাকবে তার সঙ্গে মীরা আগে কথা বলতে চান।

জেলের ম্যাট্রন নিয়ে এলেন মহিলাটিকে। মহিলাটির বিরুদ্ধে চলছে ক্রিমিনাল কেস। স্বামী হত্যাকারিনী। মীরা মহিলাটির সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলেন। সুন্দরী, বিনয়ী, নম্রস্বভাবসম্পন্না যেন প্রকৃত করুণাময়ী এক নারীর আবির্ভাব ঘটেছে তাঁর সম্মুখে। মীরা তাকে তাঁর ঘরে জায়গা দিতে সম্মত হলেন।

তবে জেলে বিভিন্ন ধরনের মহিলা কয়েদিদের রান্না হতো। তাদের মধ্যে অনেকরই থাকত বিবিধ রোগ। এমনকি সিফিলিস রোগিনীকেও রাখা হতো। অবশ্য তাদের ঘর আলাদা। কিন্তু এসমস্ত ছোঁয়াচে রোগের ভয়ে ভীত থাকতো সুস্থ দেহের নারীরা। তাদের অবশ্য করার কিছু ছিল না।

তদুপরি জলের কল, পায়খানা ইত্যাদি সবই ছিল কমন। তাই ছোঁয়াচে রোগগুলি বিশেষত সিফিলিস রোগ ছড়াবার আশঙ্কা থাকত। মীরা এসমস্ত ব্যাপারে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে বরাবর সতর্ক করেছেন। আলাদা ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নিরুপায়। সরকারি অনীহা এর মূলে। তদুপরি জেলের কাছাকাছি কোন হাসপাতাল ছিল না।

তাই জরুরি প্রয়োজনে রোগীকে চিকিৎসার কোন সুযোগ হতোনা। এতে অনেক রোগীকেই অকালে প্রাণ দিতে হতো।

মীরা এরকম একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন তাঁর বইতে। এক গর্ভবতী মহিলাকে জেলে বন্দিনী করে রাখা হয়েছিল। ক্রিমিনাল কোন অফেন্স-এর জন্য। সে ছিল পতিতা সিফিলিস রোগিনী। মহিলাটি একদিন প্রসব বেদনা অনুভব করে। জেল থেকে হাসপাতালের দূরত্ব অনেকখানি জেল কর্তৃপক্ষ তাকে সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করল। গাড়ি এলো। গাড়িতে তুলতে যাবে—এমন সময় তার প্রসববেদনা প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিল দু'টি জমজ সন্তান। অবশ্য সন্তানদ্বয় বেশিক্ষণ বাঁচল না। মাত্র পনের মিনিটের মধ্যে সব শেষ।

জমাদারকে খবর দেওয়া হল। জমজ সন্তানদু'টিকে কাপড়ে জড়িয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। দূরে একটি জায়গায় গর্ত খুঁড়ে মৃত ছেলে দু'টিকে ফেলে এলো জমাদার। তারপর ব্লিচিং পাউডার আর কারবলিক এসিড দিয়ে ঘরটি পরিষ্কার করা হল। তবুও যেন অন্যান্য রোগিনীর এমনকি মীরার মনের ভীতি গেল না। অন্য কোন কারণে নয়। সিফিলিস রোগ যে মারাত্মক। সংক্রামক ব্যাধি। জেলের এরকম পরিবেশ যে কত মারাত্মক ছিল তা

মীরার লেখা থেকে আমরা জানতে পারি। এটা ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার নিন্দনীয়রূপ তা সহজেই অনুমেয়।

আর্থার রোডের এরকম এক পরিবেশে মীরা কিছুদিন কাটালেন। পড়াশুনাও চালাতে লাগালেন নিবিষ্টমনে। বেদ, উপনিষদ, কোরাণ হয়ে উঠল তাঁর প্রাণের সম্পদ। উপনিষদের স্তোত্র যেন তাঁর প্রাণে আনন্দের দোলা লাগাতো। উপনিষদের বাণী ছিল তাঁর চলার পথের পাথেয়। উপনিষদের স্তোত্রের মধ্যে তিনি যেন বীটোফেনের সুরের ঝংকার শুনতে পান।

তাঁর নিজের কথাই বলা যায়, "While reading the Upanishads, and a few extracts from the Vedas I heard the same note as in the music of Beethoven and my heart stirred and then hushed again as if waiting for later time."

রামায়ণ ও মহাভারত তাঁকে সমভাবে আকর্ষণ করল। রামও সীতার নল ও দময়ন্তীর, শৈব্যা ও হরিশচন্দ্রের কাহিনী পড়তে পড়তে তাঁর চোখদুটি অশ্রুতে ভরে যেতো। তাঁর সারা দেহ স্বর্গীয় মহিমায় আলোড়িত হত। কোরাণের মধ্যেও তিনি খুঁজে পেয়েছেন অসাধারণ জ্ঞানের ভান্ডার।

বম্বের আর্থার রোডের জেলে এভাবে মীরার দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু জেলের দুর্গন্ধযুক্তপরিবেশ মীরার শরীরের উপর গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। বাইরের খাটা পায়খানা ও পঁচা আবর্জনার দুর্গন্ধ ঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত। মীরার পক্ষে এ দুর্গন্ধ সহ্য করা সম্ভব হচ্ছিল না। অচিরেই মীরা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বাপুকে 'Yaravada' জেলে সব জানিয়ে চিঠি পাঠালেন। বাপু সব উপলব্ধি করলেন। মীরার স্বাস্থ্যের কথা ভেবে গান্ধী কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলেন। বলেছিলেন মীরাকে যেন অন্যকোন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়।

গান্ধীর চিঠিতে কাজ হলো। মীরার ইচ্ছে ছিল Yaravada জেলে যাবেন। সেই জেলে রয়েছেন গান্ধী। সরকার মীরাকে নিরাশ করলেন। সরকারি আদেশে মীরাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল সবরমতি জেলে।

মীরা বুঝতে পারলেন সরকার তাঁকে গান্ধীর সঙ্গে য়ারবেদা জেলে রাখতে নারাজ। তবে সবরমতি জেলের চারপাশে ছিল সবুজের সমারোহ। বিশাল বিশাল নিমগাছের সারি। বিভিন্ন ধরনের ফুল গাছের সমারোহ সবরমতি জেল প্রাঙ্গণকে যেন অপরূপ সৌন্দর্য্য ভরিয়ে তুলেছে। মীরা ছোট বেলা থেকে প্রকৃতির কোলে বড় হয়েছে. প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তাঁর মনোজগতের মণি-মুক্তো এবং হীরা জহরত। সবরমতি জেলে তখন কস্তুরাবাঈ গান্ধী রয়েছেন। মীরার সঙ্গে কস্তুরাবাঈ-র মিলন হলো। পুরনোদিনের কথা মনে পড়ল। দু' জনেই খুবই আনন্দিত। পরস্পরের মধ্যে গভীর হৃদ্যতা জন্মালো। এরকম পরিবেশে মীরার পড়াশুনাও জোরকদমে চলছিল। হঠাৎ খবর পেলেন গান্ধী আবার অনশন শুরু করার পরিকল্পনা নিয়েছেন।

কস্তুরাবা ও মীরা সমভাবে চিন্তিত। গান্ধীর শরীরও ভালো নয়। সরকারও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তারা গান্ধীকে অবিলম্বে জেল থেকে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিল।

বাপু মুক্তি পেলেন। মীরা ও কস্তুরাবা তখন সবরমতি জেলে। মীরা বাপুর চিঠি পেলেন। চিঠিতে গান্ধী হরিজনদের উন্নতিকল্পে কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চলেছেন

সবই জানালেন। এব মধ্যে মীবা এক উড়ো খবব পেলেন। খববটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গান্ধী সববমতি আশ্রম বন্ধ কবে দেবাব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মীবা এই খববে কিছুটা উৎকণ্ঠিত।

পনেবো

অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিতপ্রায়। কেননা সব নেতাই তখন জেলে। জনগণকে নেতৃত্ব দেবে কে? সববমতি আশ্রমছিল সত্যাগ্রহী তৈবি কবাব কেন্দ্র। তাই সবকাব সত্যাগ্রহীদেব বাড়িঘব বাজেযাপ্ত কবাব সিদ্ধান্ত নেয়। গান্ধী নানা কাবণে সববমতি আশ্রমে বন্ধ কবতে চলেছেন।

সববমতি আশ্রম থেকে সববমতি জেলেব দূবত্ব মাইল খানেক। মীবাব নজবে আসত কি ভাবে সবকাবি পুলিশ সববমতি আশ্রমেব উপব অত্যাচাব চালাতো। মীবা জেল কর্তৃপক্ষেব কাছে সববমতি আশ্রমে যাবাব অনুমতি চাইলেন মাত্র কিছু সময়েব জন্য। জেল সুপাব সম্মতি দিলেন না। মীবাব সব মূল্যবান বইপত্র বয়েছে আশ্রমে। বয়েছে গান্ধীবও বল্যাঁব বহু চিঠি পত্র।

মীবাব সববমতি আশ্রমে যাবাব অনুমতি মিলল না। ফলে মীবাব অনেক মূল্যবান বইপত্র হাবিয়ে গেল। গান্ধী ও বল্যাঁব চিঠিগুলিবও আব হদিস পাওয়া গেল না। তবে তাব সঙ্গে দু' চাবখানা চিঠি ছিল গান্ধীবও বল্যাঁব। সেগুলি বক্ষা পেল। অবস্থা বুঝে মাবা সেগুলি অন্যত্র সবিয়ে ফেলল।

এমন সময় জেল সুপাব এসে মীবাকে খবব দিলেন একজন জ্ঞানী লোক মীবাব সাক্ষাৎপ্রার্থী। মীবা সুপাবকে বলে দিলেন তিনি কাবও সঙ্গে দেখা কবতে পাববেন না। সুপাব যখন গান্ধীসহ মীবা সন্নিধানে এলেন মীবা আনন্দে ও অভিমানে তন্ময় হয়ে গেলেন। তিনি গান্ধীব সঙ্গে কোন কথা বললেন না। অভিমানে মীবাব চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। গান্ধী মীবাকে কাছে ডাকলেন। কন্যা স্নেহে মীবাব গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন। আশ্রম তুলে দেবাব ব্যাপাবে মীবাব সঙ্গে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কবলেন। মীবা বুঝতে পাবলেন আশ্রমেব পবিবেশ কলুষিত। কেউ কাউকেও মানতে চায় না। আশ্রমবাসিবা দিন দিন কুরুচিপূর্ণ কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। তাই গান্ধী আশ্রম তুলে দেবাব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত খুবই সঠিক। তাই তাঁব চোখে মুখে সন্তুষ্টিব চিহ্ন।

সেই বাতেই গান্ধী কস্তুবাবা ও ত্রিশজন অনুগামী নিয়ে সত্যাগ্রহ কবাব কথা চিন্তা কবছিলেন। সবকাব খবব পেল। তাঁবা গান্ধীকে গ্রেপ্তাবকবল। নিয়ে এলো সববমতি জেলে, মীবা ভেবেছিল গান্ধীকে হয়ত সববমতি জেলে বাখা হবে। না সবকাব অত কাঁচা কাজ কবতে যাবে এই কথা চিন্তা কবা বৃথা। গান্ধীকে পাঠিয়ে দেওয়া হল যাববেদা (yaraveda) জেলে।

সেখানে তাঁকে দু'দিন রাখল। তারপব তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলো। একটা শর্তে। গান্ধীকে সেইদিনই পুনা ছেড়ে চলে যেতে হবে। ওখানে কোন আন্দোলন করতে পারবেন না। গান্ধী সেই শর্ত প্রত্যাখ্যান করলেন। জেলের মধ্যেই গান্ধীর বিচার হলো। তাঁকে

একবছরেব জন্য সাধাবণ কযেদীব ন্যায জেলে বাখাব জন্য সবকাবি আদেশ জাবি হলো।

গান্ধী চূড়ান্ত অপমান বোধ কবলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন আমবণ অনশন কবাব। যেই কথা সেই কাজ। তখন তাব শবীব খুবই দুর্বল। হাটাব ক্ষমতা নেই। এমনকি জোবে কথা বলাব শক্তিও তিনি হাবিযেছেন। তবুও অনশন তিনি কবলেনই। মীবা ও কস্তুবাবা খবব পেলেন। কস্তুবাবা তখন জেল থেকে ছাড়া পেযেছেন। মীবাকেও দু একদিন পব ছেড়ে দেওযা হল। তাবা দুজনে গান্ধীব জন্য উৎকণ্ঠায দিন কাটাচ্ছেন। তাবা খবব পেলেন গান্ধী জল পর্যন্ত স্পর্শ কবছে না। কস্তুবাবা ছুটলেন পুনা। গান্ধীব শাবীবিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ কবে সবকাব তাকে হাসপাতালে পাঠালেন।

চার্লিএন্ড্রুজ সবকাবেব কাছে অনুনয বিনয করে চিঠি দিলেন গান্ধীকে বিনা শর্তে মুক্তি দেবাব জন্য। সবকাব নাবাজ। সবকাব চান গান্ধীব অনশনে মৃত্যু হোক। তাবা নিস্তাব পাবেন। সবকাব যখন এবকম এক সিদ্ধান্তে অটল তখন ভাবতবাসী গান্ধীব মুক্তিব দাবিতে উত্তাল। সবকাব বুঝতে পাবল গান্ধীব অনশনে মৃত্যু ঘটলে ভাবতে যে আন্দোলন শুরু হবে তাব ধাক্কা তাবা সামলাতে পাববে না। তাই গান্ধীকে বিনা শর্তে মুক্তি দেবাব সিদ্ধান্ত নিল সবকাব। এন্ড্রুজ সবকাবি আদেশেব কপি নিযে ছুটলেন পুনাতে। গান্ধী ছাড়া পেলেন। চাবদিকে আনন্দেব বোল।

গান্ধীকে অ্যাম্বুলেন্সে কবে হাসপাতাল থেকে নিযে আসা হল। মীবা, কস্তুবাবা ও অন্যান্য কযেকজন সঙ্গীসহ গান্ধী এলেন সববমতি আশ্রমে। কযেকদিন পূর্ণ বিশ্রাম নিলেন। শবীব একটু সুস্থবোধ কবলেন। তাবপব আবাব সিদ্ধান্ত নিলেন হবিজনদেব প্রতিষ্ঠাব জন্য শুরু কববেন অস্পৃশ্যতাদূবীকবণ আন্দোলন। ডাক্তাব কিন্তু তাকে আব ও দু'মাস পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বললেন। কিন্তু কে কাব কথা শুনে। নিরুপায কস্তুবাবা ও মীবা।

গান্ধী তাব হবিজন পত্রিকাব ও অন্যান্য গণমাধ্যমেব মধ্য দিযে বর্ণহিন্দুদেব কাছে আবেদন জানালেন। হবিজনদেব ভ্রাতৃত্ব বোধে আবদ্ধ কবতে বললেন। গান্ধীব ডাকে হযত কেউ কেউ সাড়া দিলেন। তবে কট্টব বর্ণহিন্দুবা গান্ধীব আকুলমিনতিকে ছলনা বলে উড়িযে দিল। গান্ধী স্থিব সিদ্ধান্ত নিলেন নভেম্বব মাসে তিনি অস্পৃশ্যতা দূবীকবণ আন্দোলন শুরু কববেন। সেইভাবে তিনি সকলকে নির্দেশ দিলেন। এব মধ্যে সববমতি আশ্রমে এসে উপস্থিত হল এক অল্পবযস্কা ইহুদি কন্যা। মীবা ত তাকে দেখে চমকে উঠলেন। অপূর্ব রূপসী জার্মানীব এই মেযেটি কোনবকমে নাৎসীদেব হাত থেকে বক্ষা পেযে ছুটে এসেছে গান্ধী সকাশে। নতুন জীবন শুরু কবাব প্রত্যাশা তাব। মীবাব সঙ্গে ভাব জমে গেল। গান্ধীব নির্দেশে মীবা তাঁকে আশ্রমজীবনেব বিভিন্ন দিকে ট্রেনিং দিতে লাগলেন। বেশকিছুদিন অতিক্রান্ত। মেযেটি আশ্রম জীবনেব সঙ্গে নিজেকে মানিযে নিল। মীবাব সঙ্গে নানা সমাজ সেবামূলক কাজে আত্মনিযোগ কবল।

মীবা অস্পৃশ্যতাদূবীকবণের নানা জটিল সমস্যায ব্যস্ত বর্ণ হিন্দুদেব সঙ্গে আলোচনাবতা। গান্ধীর নির্দেশেই। তখন এক আমেবিকান মহিলার ঘটল আবির্ভাব। তিনি আবার কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা। গান্ধী তাঁর নাম দিলেন নীলা। নীলা একদিন গান্ধীর অনুমতি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকুঞ্জ বৃন্দাবনে গিয়ে হাজির। সেইখানে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পা গেল কেটে। গায়ে জ্বর ও পা কাটানিয়ে ফিরে এলো সবরমতি। গান্ধী নীলাকে রাখতে চাইলেন

ভারতে। সরকারের অনুমতি মিলল না। নীলাকে বাধ্য হয়ে ফিরে যেতে হলো নিজের দেশে। নীলার উপাখ্যানের যবনিকা ঘটল আপাতত। গান্ধী এপ্রিল ১৯৩৪ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন বন্ধের কথা ঘোষণা করলেন।

৭ই নভেম্বর, ১৯৩৩ গান্ধী মীরা ও তাঁর অন্যান্য কিছু অনুগামী নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন নাগপুর। তিনি অস্পৃশ্যতাদূরীকরণ আন্দোলনে ভয়ানক ভাবেই ব্যস্ত। কি করবেন কোন পথে এগোবেন তার ছক কষছেন। এদিকে বর্ণহিন্দুরা গান্ধীর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে। এরকম এক সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে গান্ধী চললেন উড়িষ্যাতে। সেইখানে হরিজনরা গান্ধীকে বিপুল সম্বর্ধনা জানাল। বিশাল জনসমাবেশে গান্ধী ভাষণ দিলেন। উড়িষ্যাতে বর্ণহিন্দুদের আক্রমণে গান্ধীর আন্দোলন কিছুটাথমকে গেল। গান্ধী হাল ছাড়ার পাত্র নন। তিনি ছোট দলবল নিয়ে পদব্রজে উড়িষ্যা ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। বর্ণহিন্দুদের কাছে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশাধিকার দিতে অনুরোধ করলেন। এর পরে তিনি পুরীতে এক জন সমাবেশ সংগঠিত করলেন। সেই সমাবেশে প্রভূত লোকসমাগম হল। কট্টর হিন্দুত্ববাদী নেতা লাল নাথ এলো সমাবেশে তার দলবল নিয়ে। উদ্দেশ্য সমাবেশটা পন্ড করা। গান্ধী লাল নাথকে কাছে ডাকলেন। স্নেহের সুরে তাকে অনেক বোঝালেন। গান্ধীর অপ্রতিরোধ্য ব্যক্তিত্ব লালনাথকে আকর্ষণ করল। লাল নাথ গান্ধীর ব্যক্তিত্বের কাছে হার মানলেন।

এরপর গান্ধী ফিরে এলেন বম্বেতে। এদিকে ইংলন্ডের সর্বত্র গান্ধীর কুৎসা রটনায় উঠেপড়ে লেগেছে। মীরা সব খবর সংগ্রহ করলেন। গান্ধীকে সবকিছু বিস্তারিত ভাবে বললেন। মীরা এ সমস্ত ব্যাপারে প্রতিবাদ জানাবার জন্য লন্ডনে যেতে চান। গান্ধীর সম্মতি মিলল। লন্ডনে যাবার খরচ অনেক। গান্ধী তাই ব্যবসায়ী অম্বালাল-এর স্মরণাপন্ন হলেন। অম্বালাল মীরার লন্ডনযাবার ব্যয়ভার বহনে রাজী হলেন।

মীরা জাহাজযোগে লন্ডন যাত্রা করলেন। কিছুটা পথ অতিক্রান্ত। এর মধ্যে তারে খবর এলো পুনাতে গান্ধীকে বর্ণহিন্দুরা আক্রমণ করেছে। তাঁর গাড়ির কাঁচ দিয়েছে ভেঙ্গে। গান্ধীর কয়েকজন সঙ্গী গুরুতর আহত। তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। মীরা ভীষণভাবে চিন্তিত। এসময় মীরা গান্ধীর সঙ্গে নেই। অবশ্য তিনি গান্ধীর সঙ্গে থাকলেও বা কি করতে পারতেন?

সাত পাঁচ ভেবে লাভ নেই। মীরা তাই সব কিছু ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিলেন। জাহাজ এর মধ্যে মার্সাই বন্দরে এসে নোঙর করল। মীরা সেখান থেকে ছুটলেন রল্যাঁর সঙ্গে দেখা করতে। রল্যাঁর সঙ্গে রয়েছেন বোন। মীরা দু'দিন কাটালেন সেখানে। গান্ধী ও ভারত সম্পর্কে রল্যাঁর সঙ্গে মীরার বিস্তারিত আলোচনা হলো। মীরা এবার চললেন লন্ডন। তাঁর মনে কত পুরনো স্মৃতি উদিত হতে লাগল। প্রায় এক যুগ পরে ফিরছেন নিজ দেশে। তবে তাঁর ধ্যানজ্ঞান গান্ধীসম্পর্কে ইংলন্ডবাসীকে পরিজ্ঞাত করা।

যথাসময়ে তিনি লন্ডনে গিয়ে পৌঁছলেন। গান্ধী ভক্তের দল মীরাকে সাদরে বরণ করল। তবে তারা চিন্তিত। মীরা বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিতে গেলে কি পরিস্থিতি দাঁড়াবে এই চিন্তায় তারা অস্থির।

মীরাকে ইংলন্ড যাত্রায় সময় গান্ধী নির্দেশ দিয়েছিলেন মীরা যেন লন্ডন পৌঁছে স্যার

সাম্যুয়েল হোর এর সঙ্গে দেখা করে তাঁর কর্মপন্থা ঠিক করেন। মীরা হোর-কে জানালেন তিনি লন্ডন এবং ইংলন্ডের বিভিন্ন জন সমাবেশে গান্ধীর সম্পর্কে আসল সত্য ব্যক্ত করতে চান। হোর-এর কাছ থেকে সম্মতি মিলল। ইংলন্ডের বিভিন্ন জায়াগায় গান্ধী ভক্তের দল জনসভার ব্যবস্থা করল।

এর মধ্যে মীরা গান্ধীর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলেন। চিঠিতে গান্ধী লিখেছেন যতদিন ইচ্ছে মীরা যেন ইংলন্ড-এ থাকেন। লন্ডনে "ফ্রেন্ডস্ অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি"-তে· মীরা বক্তৃতা দিলেন। পরিস্থিতি ছিল খুবই সংকটজনক। তবুও সভায় উপস্থিত সুধীবৃন্দ মীরার বক্তব্যকে সাধুবাদ জানালেন। ইংলন্ডের বিভিন্ন স্থানেও মীরা তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখলেন। বিভিন্ন সমাবেশে মীরার বক্তব্য শোনার জন্য লোকের মধ্যে গভীর আগ্রহ দেখা দিল।

মীরা বুঝতে পারলেন ইংলন্ডের প্রভূত মানুষের মধ্যে গান্ধী সম্পর্কে কৌতূহল রয়েছে। সকলেই তাঁর বক্তব্য আগ্রহভরে শুনেছে। কেউ কোন বিরূপ মন্তব্য করেনি। গান্ধী সম্পর্কে সকলের মনেই রয়েছে একটা শ্রদ্ধার ভাব। মীরা এতে আনন্দিত। মীরা মুগ্ধ। ইংলন্ডের বিভিন্ন প্রদেশে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মীরাকে বিভিন্ন ধরনের লোকের বাসায় আশ্রয় নিতে হয়েছে। কোন সময় থেকেছেন শ্রমিকদের আস্তানায়। কোন কোন সময় গাড়ির চালকের বাড়িতে। একবার তিনি একজন তাঁতির ঘরেও রাত কাটান। ইংলন্ডে গান্ধী আনুগামীরা মীরার বিভিন্ন স্থানে থাকার ও খাবার ব্যবস্থা করতেন। মীরার ইংলন্ড ভ্রমণ যে সফল হয়েছে তা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করলেন। মীরা গেলেন স্কটল্যান্ডে। সেখানে দেখা করলেন পুরনো বন্ধু-বান্ধব এবং বান্ধবীদের সঙ্গে। মীরা বেশ কিছুদিন স্বদেশে আনন্দেই কাটালেন। তাঁর এই ভ্রমণ সফল হল।

এদিকে গান্ধী আবার অনশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কংগ্রেসের ভেতরকার গোলমাল, কংগ্রেস সদস্যদের নৈতিক অবনতি কংগ্রেসীদের মধ্যে অবক্ষয় গান্ধীকে বিচলিত করে তুলল। গান্ধী মীরাকে চিঠিতে জানালেন তিনি কংগ্রেসের সদস্যপদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মীরা চিন্তিত। তবে এবার গান্ধী শরীর ছিল অনেকটা সুস্থ। তাই অনশনের ধকল গান্ধী সহ্য করতে পারবেন এটা ছিল মীরার ধারণা। মীরা ভারতে পাড়ি দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

ভারতে রওনা দেবার আগে মীরা 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি'র এক বিশাল সমাবেশে বক্তৃতা দিলেন। মীরাকে আমন্ত্রণ জানালেন 'লর্ডজর্জ'। লর্ডজর্জের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন মীরা। তাঁর অসামান্য পান্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব, সাহসিকতা, উপস্থিত বুদ্ধি ও স্পষ্টবাদিতা মীরাকে মুগ্ধ করল। মীরার কাছে লর্ডজর্জ গান্ধী সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করলেন।

তিনি গান্ধী সম্পর্কে বললেন যে তিনি জানতেন যে গান্ধী একজন সন্ত। তবে গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতে কথা বলার আগে গান্ধী-যে একজন বড় Statesman তা তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি।

কথা বলতে বলতে লর্ডজর্জ মীরাকে তাঁর ড্রয়িংরুমে নিয়ে যান। মীরাকে একটা সোফা দেখিয়ে বললেন যে তিনি গান্ধীকে ঐ সোফায় বসতে দিয়েছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে গান্ধীর অনেক গূঢ় আলোচনা হয়েছিল। লয়েড জর্জ মীরাকে এক অদ্ভুত কাহিনী শোনালেন।

লর্ড জর্জ বললেন গান্ধী তাঁর গৃহে অতিথি হয়ে আসার একদিন আগে একটা বিড়াল

তাঁর ঘরে এসে হাজির হয়। সেটা তাঁর কোন পোষা বিড়াল ছিল না। সেই বিড়ালটিকে তিনি এর আগে দেখেননি। তাই তিনি বিড়ালটি তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। গান্ধীর বসার জন্য যে সোফাটি ঠিক করে রেখেছিলেন লয়েড জর্জ সেই সোফার কাছেই বিড়ালটি শুয়েছিল। নির্বিবাদে ঘুমিয়ে ছিল একটি রাত। কাউকেও বিন্দুমাত্র বিরক্ত করেনি।

পরদিন গান্ধী এসে যখন সোফাটিতে বসলেন বিড়ালটি ধীরে ধীরে গান্ধীর কোলে আশ্রয় নিল এবং যতক্ষণ পর্যন্ত গান্ধী সোফাটিতে বসে লর্ডজর্জ-এর সঙ্গে আলোচনারত ছিলেন ততক্ষণ পর্যন্ত বিড়ালটি ছিল গান্ধীর কোলের মধ্যে। এক সেকেন্ডের জন্যও বিড়ালটি নড়াচড়া করেনি। গান্ধী তাকে আদর করেছে গভীর স্নেহে। গান্ধীর ঘর থেকে প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালটি ঘর থেকে কোথায় যে চলে গেল তা জর্জ বুঝতে পারেননি। লর্ডজর্জ মীরাকে জানালেন এরপর একদিনের জন্যও তিনি সেই বিড়ালটিকে আর দেখেননি। এই ঘটনা লর্ডজর্জ-এর মনে এক বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি করল। গান্ধী যে একজন অতি উঁচুধরনের আধ্যাত্মিক পুরুষ-এ ব্যপারে লর্ডজর্জ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী। একথা দৃঢ় ভাষায় তিনি মীরার কাছে ব্যক্ত করেন।

মীরা লন্ডনে এসে এর মধ্যে বোন রোহনা ও তাঁর অন্যান্য আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে দেখা করলেন। রোহনার স্বামীর তখন অবসর জীবন। সিভিল সার্ভিস থেকে অবসর নিয়ছেন। মীরার কানে এখন বিটোফেনের পঞ্চম সুরের আওয়াজ ধ্বনিত হয়না। তিনি যেন একজন সন্যাসিনী। ভারতের সার্বিক মঙ্গলবিধানে ও স্বাধীনতালাভের জন্য কর্মযোগীনীর ভূমিকায় অবতীর্ন। গান্ধীর সুযোগ্যা শিষ্যা। গান্ধী জানিয়েছেন মীরা ভারতে ফিরবেন স্থির করলেন। কিন্তু এর মধ্যে গান্ধীর একটা তার পেলেন তিনি। গান্ধী জানিয়েছেন মীরা যেন আর কিছুদিন লন্ডনে থাকেন। ২০শে অক্টোবর অ্যান্ড্রুজ ভারতে ফিরবেন। মীরা যেন তাঁর সঙ্গেই আসেন।

মীরা ভাবলেন তাঁকে আরও একমাসের উপর লন্ডনে কাটাতে হবে। ইংলন্ডের বন্ধু-বান্ধব ও বান্ধবীরা মীরাকে বিভিন্ন প্রদেশে জনসমাবেশে বক্তৃতা দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। কেননা ইংলন্ডের বিভিন্ন প্রদেশের বেশ কিছু সংখ্যক লোকের গান্ধী সম্পর্কে কিছু কিছু প্রশ্ন করার আছে। বিশেষত গান্ধীর ব্যক্তিগত দিক সম্পর্কে অনেকেই জানতে আগ্রহী।

তবে মীরা তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের এই অনুরোধে সাড়া দিতে পারলেন না। স্থির করলেন সময় যখন পেয়েছেন আমেরিকায় যাবেন। সেইখানে গান্ধী ও ভারত সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু বক্তব্য রাখবেন। এর জন্য বাপুর কাছে তারযোগে সম্মতি চাইলেন। বাপু সম্মতি দিলেন।

মীরা গান্ধীর সম্মতি পেয়ে বন্ধু Dr. John Haynes Holmes এর সঙ্গে ফোনে কথা বললেন। আমেরিকায় হোমস মীরাকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। মীরা আমেরিকায় যাবার জন্য সবেচেয়ে বড় জাহাজ 'ম্যাজেস্টিক'-এর টিকিট কাটলেন। আটলান্টিক পাড়ি দিতে হবে তাঁকে। প্রলয়ঙ্করী মহাসাগর। বিশাল তার ঢেউ। সবকিছু ভেবে মীরা যেন একটু ভীত সন্ত্রস্ত।

মীরার প্রথম আমেরিকা যাত্রা। সেটাও স্ট্রীমার-এ চড়ে। মীরা যথা সময়ে জাহাজে

উঠলেন। গিয়ে বসলেন উপরের ডেকে। অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা মীরার দেহমনকে আচ্ছন্ন করে রাখল। তবে সেই শোভা বেশি সময় তিনি উপভোগ করতে পারলেন না। আবহাওয়া ক্রমেই দুর্যোগপূর্ণ হয়ে উঠল। প্রচন্ড ঢেউ-এর তোড়ে জাহাজ অস্বাভাবিক ভাবে দুলতে আরম্ভ করল। আশিফুট উঁচু ঢেউ-এর ঝাপটা উপরের ডেকে এসে সজোরে আঘাত করতে লাগল। যাত্রীদের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহিরব উঠল। মীরা একমনে ভগবানের সাধনায় মগ্ন। চব্বিশঘন্টা ধরেই ঝড়েব দাপট। ধীরে ধীরে সমুদ্র শান্ত হল। তবে আমেরিকা পৌছতে প্রায় একদিন দেরি হয়ে গেল।

জাহাজ এসে যথাস্থানে নোঙর করল। মীরার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য দল বেঁধে সাংবাদিকেরা ছুটে এল। মীরা বুঝতে পারলেন আমেরিকায় মীরার পক্ষে একমিনিট সময় নষ্ট করা সম্ভব হবে না। শুধু কাজ আর কাজ। এদিকে সাংবাদিকরা এসে মীরার সাক্ষাতকার নিতে চাইলেন। মীরা তখন ক্লান্ত। তবুও সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা কবেননি। ক্যামেরা ম্যান এসে মীবার ফটো তুললেন। কিছু সময় পর এসে উপস্থিত হলেন ডঃ জন হেইনস হোমস ও মীরার অন্যান্য বন্ধুরা। তাঁরা জানালেন জাহাজ নির্ধারিত সময়ের প্রায় একদিন পরে আসাতে মীরার বক্তৃতা দেবার পূর্বনির্ধরিত সময়সূচীর পরিবর্তন করতে হয়েছে। নিউইয়র্কে পদার্পন -করেই সেই রাতে "বার বিজন প্লাজা হোটেল"-এ প্রথম সমাবেশে বক্তৃতা করলেন। তারপর থেকেই দু'সপ্তাহ ধরেই চলল বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা। মীরার মনে হতে লাগল তিনি সাঁতার প্রতিযোগিতায মনপ্রাণ সমর্পন করে জয়ী হবার চেষ্টায়রত। বিশ্রাম করার যেন একটুও ফুরসত নেই তাঁর।

মীরাব প্রধানকার্যালয় ছিল নিউইর্কের "henrey Street House Settlement"-এ। এখানেই তিনি আমেরিকার প্রকৃত গরীব জনগণকে নিজের চোখে দেখার সুযোগ পেলেন। এই হোটেলের পেছনেই ছিল গরিব লোকদের বস্তি। তবে হোটেলের ভেতরে দারিদ্র্যের কোন ছায়া পড়েনি। ভারতের যে কোন হোটেলের চেয়ে এই হোটেলের পরিবেশ, আভিজ্যত্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন। থাকাটা অনেক আরামপ্রদ।

নিউইয়র্ক শহরের বাইরে মীরা ফিলাডেলফিয়া, ওয়েষ্ট চেষ্টার বোষ্টন, হারভার্ড প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করলেন। এ সমস্ত জায়গার সুধীবৃন্দ গান্ধী ও ভারত সম্পর্কে জানার জন্য কৌতূহলী। ওয়াশিংটনে হোয়াইট হলে। মিসেস রুজ, ভেল্ট-এর সঙ্গে মীরার অনেক আলোচনা দহল। কয়েকটা নিগ্রো সমাবেশেও মীরা তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য রাখলেন।

মীরা যেখানেই বক্তৃতা করত সেখানকার সভাকক্ষগুলি লোকে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে থাকত। American League for India's Freedom" আয়োজিত এক সভায় মীরা জোরালো ভাষায় বক্তব্য রাখলেন। মীরা ১৪ দিনে ২২ টি জন সমাবেশে বক্তৃতা দিলেন। পাঁচটি ছিল বেতার ভাষণ। মীরা একা, তাই শারীরিক দিক থেকেও তিনি এত পরিশ্রমের ধকল সইতে পারছিলেন না। মীরা ইংলন্ড অপেক্ষা আমেরিকায় সমাদর পেলেন বেশি।

আমেরিকায় জনগণ গান্ধীর রাজনীতিক দিক সম্পর্কে জানতে ততবেশি আগ্রহী নন। তাঁরা মানুষ গান্ধীকে জানতে চান। জানতে চান তাঁর সামাজিক কার্যকলাপ। তাঁরা জানতে চান মানুষ গান্ধীকে, শিক্ষক গান্ধীকে এবং সত্যের পূজারী গান্ধীকে আমেরিকার জনগণের গান্ধী সম্পর্কে জানার আগ্রহ মীরাকে বিস্মিত করেছে। মীরা পরিচয় পেল আমেরিকাবাসির

বিশাল হৃদযেব, পবিচয পেল তাদেব মহানুভবতাব। আমেবিকা ভ্রমণ মীবাব মনেব গভীবে নাড়া দিল। গান্ধীব প্রতি আমেবিকাবাসিব গভীব শ্রদ্ধা ও ভালবাসাব কথা মীবা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মবণ কবলেন। আমেবিকা থেকে বিদাযেব আগেব দিন মীবাব অপূর্ব বেতাব ভাষণে আমেবিকাবাসিব প্রতি মীবাব গভীব কৃতজ্ঞতাব কথা সুন্দবরূপে ফুটে উঠেছে।

অক্টোবব মাসেব শেষেব দিকে মীবা ভাবতে ফেবাব জন্য প্রস্তুত। এমন সময গান্ধীব কাছ থেকে একটা তাব এলো। তাতে মীবাকে তিনি লিখেছেন আসাব সময যেন খান আব্দুল গফুব খাঁনেব ইংবেজ স্ত্রীব কন্যাকে সঙ্গে আনেন। কন্যাটি মাযেব কাছে থেকে লন্ডনে পড়াশুনা কবত। তখন তাব বযস মাত্র চৌদ্দ। মাযেব ইচ্ছে ছিল না মেযেকে ভাবতে পাঠাবাব। মীবাব অনুনয় বিনয এবং গান্ধীব চিঠি আব্দুল গফুব খানেব ইংবেজ পত্নীব হৃদয বিগলিত কবল। শেষ পর্যন্ত কন্যাটিকে মীবাব সঙ্গে ভাবতে পাঠাতে সম্মতি দিলেন। মেযেটিব নাম Mehar Taj দুর্ভাগ্যেব বিষয মেযেটিব পাশপোর্টেব হদিস মিলছিল না। অনেক কষ্টে পাশপোর্টেব হদিস মিলল। মীবাব মানসিব দুশ্চিন্তা প্রশমিত হল।

সতেব

লন্ডনেব মাটি থেকে পাড়ি দেবাব কযেকদিন আগে মীবা ইংলন্ডেব বাজনীতিবিদদেব সঙ্গেদেখা কবলেন। ১৯৩৪ সালেব ১লা নভেম্বব মীবা লর্ড আবউইনেব সঙ্গে দেখা কবলেন। ২বা নভেম্বব দেখা কবলেন স্যাব মাজ্যুযল হোব-এব সঙ্গে। পবে দেখা কবলেন উইনস্টন চার্চিলেব সঙ্গে। তাঁদেব সঙ্গে মীবা গভীব আলোচনা কবলেন। ভাবতেব স্বাধীনতাব জন্য মীবাব অন্তবে গভীব চিন্তা। লর্ড আবউইন, চার্চিল হোব-এদেব মানসিক অবস্থা মীবা অনুধাবন কবতে পাবলেন।

মীবা লন্ডন থেকে এলেন প্যাবিসে। সেখান থেকে ব্রিন্দিশি যাবেন ব্রিন্দিশি থেকে স্টীমাবে কবে ভাবত অভিমুখে যাত্রা কববেন। প্যাবিসে মীবা কযেকজন বন্ধু বন্ধবেব সঙ্গে দেখা কবলেন দু' একটা জনসমাবেশে গান্ধী ও ভাবত সম্পর্কে বক্তব্য বাখলেন। এবপব চললেন ব্রিন্দিশি। নির্দিষ্ট দিনে আগাথা হ্যাবিশন যান শাহেবেব কন্যা মেহেব তাজ-কে নিযে ব্রিন্দিশি এলেন। মীবাব তাই কোন অসুবিধে হল না। মীবা মেহেব তাজকে সঙ্গে স্টীমাবে কবে ভাবতাভিমুখে যাত্রা কবলেন।

তখন আবহাওযা ছিল অপূর্ব। সমুদ্র ছিল শান্ত। মীবাব মন আনন্দে ভবপুব। সমুদ্রেব অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ কবতে কবতে তাঁবা চলেছেন ভাবতে। যথাসময়ে জাহাজ এসে পৌছল বম্বেতে। মেহেব তাজ-কে নিযে যাবাব জন্য খান সাহেব লোক পাঠিযেছিলেন। মীবা তাকে তাদেব হাতে তুলে দিলেন। মীবা স্বযং চললেন বাপুব কাছে ওযার্ধাতে। বাপুব সঙ্গে অনেক কথা বলাব ছিল তাঁব। বলাব সময হলো না। বাপু তখন ভীষণভাবে ব্যস্ত।

হবিজনদেব নিযে বাপুব চিন্তাব শেষ নেই। অস্পৃশ্যতা দূবীকবণ আন্দোলন তখন চলছে জোব কদমে। এব সঙ্গে বাপু আব একটি নতুন কাজে হাত দিয়েছিলেন। অল ইন্ডিয়া ভিলেজ

ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হল বাপুর প্রচেষ্টায়। গ্রামের কুটির শিল্পকে চাঙ্গা করার জন্য এই পরিকল্পনা।

বাপু তখন কংগ্রেসের চার আনার সদস্যও নন। কিন্তু ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি ও গ্রামীন কুটির শিল্পের সম্প্রসারণ কল্পে তিনি মনপ্রাণ সমর্পণ করেছেন।

আঠার

গান্ধী কংগ্রেস ছেড়েছেন কিন্তু কংগ্রেস তাঁকে ছাড়তে পারে নি। কংগ্রেস নেতারা কোন সমস্যায় পড়লে ছুটেন তাঁর কাছে। মীরা দেখলেন বাপুর বাহ্যিক চালচলন বেশ খোলামেলা কিন্তু তাঁর অন্তর বেদনায় ভরপুর।

এতদিন তিনি জনগণকে চালনা করেছেন কংগ্রেস প্ল্যাটফরম থেকে। এখন তিনি ও একজন সাধারণ ভারতবাসী ভিন্ন আরকেউ নন। কংগ্রেসীরা সাহায্য চাইলে সাহায্য করেন তবে ঘুরানপথে। সোজাসুজি সাহায্য করার সুযোগ ও তার আর নেই। লবন সত্যাগ্রহের সভায় তাঁর যে রকম মানসিক অবস্থা ছিল এখন তা স্তিমিত। সমস্ত দেশের অবস্থা গুরুতর। অত্যাচারিত ভারতীয়রা ক্ষুব্ধ।

ডিসেম্বরের শেষ, বাপু চলেছেন দিল্লীতে। হরিজন কলোনীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে। এই কলোনী স্থাপনের জন্য অর্থ সাহায্য করছে ঘনশ্যাম দাস বিড়লা। কলোনীর অধিবাসীরা প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাতে কলমে শিক্ষালাভেরও সুযোগ পাবে। মীরা গান্ধীর সঙ্গ ী। গান্ধীর দেখভাল করছেন। প্রায় একমাস কেটে গেল। গান্ধী ও মীরাকে দিল্লীতে থাকতে হলো। একমাস পর দিল্লী থেকে ফিরলেন ওয়ার্ধা।

শেঠ যমনলাল বাজাজ, বম্বের বিরাট ব্যবসায়ী। গান্ধীকে তিনি তাঁর "গড ফাদার" বলে মনে করতেন। বিনোবা ভাবেও ছিলেন যমনলালের গুরু। ওয়ার্ধাতে বিনোবা আশ্রম স্থাপিত হয় তারই অর্থ সাহায্যে।

যমন লাল ওয়ার্ধাতে গান্ধীকে দান করলেন কুড়ি একর জমি, এই-বিশাল জমিতে ছিল বিভিন্ন ধরনের ফলের বাগান। এরমধ্যে বিশাল এলাকা নিয়ে ছিল যমনলালের বিশাল বাড়ি। বিশ্রামের জায়গা। সবই যমনলাল গান্ধীর হাতে সমর্পণ করলেন। এই বিশাল জমির উপর স্থাপিত হলো Village Industries Association-এর প্রধান কার্যালয়। গান্ধীর ভাগ্নে মগনলাল এ সমস্ত জায়গা জমির তদারকি করতেন। তিনি ছিলেন সবরমতি আশ্রমের ম্যানেজার। বিহারে গিয়েছিলেন প্রয়োজনে। সেখানে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। মগনলাল মারা যাওয়ার পর সবরমতি আশ্রম দেখশুনার জন্য উপযুক্ত লোক পাওয়া গেল না। আশ্রমের পরিস্থিতি হয়ে উঠেছিল জটিল। শেষ পর্যন্ত গান্ধী সবরমতি আশ্রম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন।

গান্ধী দিল্লী থেকে ফিরে ছুটলেন ওয়ার্ধা। বিনোবাজীর আশ্রমে তার কাছেই দেওয়া যমনলাল-এর কুড়ি একর জমিতে স্থাপিত হতে চলেছে Village Industries Association এর প্রধান কার্যালয়। দক্ষিণ ভারতীয় খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ জে. সি. কুমারাপ্পা এলেন নতুন জায়গায়। অবশ্য গান্ধীর অনুরোধে। তাঁর জন্য আলাদা একটা বড় ঘরের ব্যবস্থা করা হলো।

এ ছাড়া বিভিন্ন জায়গা থেকেও অনেকেই এলো। এলো সবরমতি আশ্রমের অনেকেই। তবে বেশির ভাগই সুবিধেবাদী। গান্ধীর সন্নিধ্যে এসে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধিই যেন তাদের মূল উদ্দেশ্য। দিনে রাতে শুধু হৈ চৈ লেগেই থাকত। এর মধ্যে আবার একজনা মহিলা ছিলেন মানসিক দিক থেকে অসুস্থ। রাতে ঘুমের মধ্যে তিনি হেঁটে বেড়াতেন। অনেকেই তাঁকে ভূত ভেবে ভয় পেত। গান্ধী এখানে সয়াবিন-এর উপকারিতা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজে হাত দিলেন। সকলেই গান্ধীর সঙ্গে গবেষণার কাজে লেগে গেল। সয়াবিনের গুণাগুণ বিশ্লেষণে মেতে উঠল গান্ধী। বেশিদিন এ কাজে মনোসন্নিবেশ করতে পারলেন না। তার সয়াবিনের উপর গবেষণা হয়ে গেল বন্ধ।

মীরা এরপর অন্যত্র একটি গ্রামের কাজে হাত লাগান, গান্ধীরই অনুরোধে। গ্রামটির নাম 'সিন্দি'। অত্যন্ত নোংরা গ্রামের পরিবেশ। ওয়ার্ধা থেকে মীরা নিয়মিত সিন্দি যেতেন। রাস্তাঘাট নর্দমা ইত্যাদি পরিষ্কার করার দায়িত্ব নিলেন তিনি গান্ধীর পরামর্শে। সিন্দিতে মীরার সমাজসেবার কাজ জোরকদমে চলতে লাগল। গ্রামের লোকেরা মীরার সঙ্গে হাত মিলাল। মীরা তাঁদের নেত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হলেন।

২৫ শে মে, গান্ধীকে জরুরি কাজে যেতে হল বরসাদে। সেখানকার লোকেরা তাঁর সাহায্যপ্রার্থী। সরকারি কর্মচারী ও অফিসারদের দ্বারা অত্যাচারিত বরসাদের লোকজন অসহায় অবস্থায় বিচরণ করছে। তাই তাঁরা গান্ধীর স্মরণাপন্ন। বরসাদে গান্ধী এসেছেন। সেখানকার লোকেরা গান্ধীর উপস্থিতিতে সতেজ।

বরসাদ থেকে গান্ধী মীরাকে চিঠি দিলেন। সিন্দিতে সমাজসেবা মূলক কাজ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। আর জানিয়ে দিলেন মীরা যেন তাঁর পড়াশুনার কাজটি চালিয়ে যান।

গ্রীষ্মকালে ওয়ার্ধাতে অসম্ভব গরম। সমস্ত বাড়িঘর আসবাবপত্র যেন আগুন। হাত দেবার সাধ্য কারুর থাকে না। গায়ে ভেজা কাপড় জড়িয়ে থাকতে হয়। জুন-জুলাই মাসে বৃষ্টি পড়লে আবহাওয়া একটু ঠান্ডা হয়। মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

গান্ধীকেও কাজ করে যেতে হয় এরকম পরিবেশে। এখানে গান্ধী সন্দর্শনে বিভিন্ন ধরনের লোক আসা যাওয়া করত। তাঁদের মধ্যে Holide Edib Hanum অন্যতম। তিনি একজন সমাজসেবী ও খ্যাতনামা লেখিকা। গান্ধী অনুরাগিনী।

সময় সময় একজন সাপুড়ে এসে উপস্থিত হত আশ্রমে। সাপুড়েটি গান্ধীর প্রিয় ভক্ত। সাপ খেলা দেখাতে দেখাতে গান্ধীর গলায় জড়িয়ে দিত একবিশাল ময়াল সাপ। সাপটি তাঁর গলা জড়িয়ে ধরত। তিনি মৃদু মৃদু হাসতেন। দেখে মনে হত যেন কোন শিশু গান্ধীর গলা জড়িয়ে তাকে আদর করছে। এই বিচিত্র দৃশ্য উপস্থিত সকলেই উপভোগ করত।

উনিশ

এর মধ্যে হঠাৎ গান্ধীর শরীর খারাপের দিকে যেতে লাগল। বৃদ্ধি পেয়েছে রক্তচাপ। শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন। মীরা চিন্তাক্লিষ্ট। গান্ধী সিন্দি গ্রামের লোকজনদের মনোভাব পর্যবেক্ষণ করে ক্ষুব্ধ। হতাশায় তিনি মুহ্যমান। সিন্দি গ্রামের উন্নতির জন্য মীরার অক্লান্ত পরিশ্রম পন্ডশ্রমে পরিণত। অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন জীবন যেন সিন্দি গ্রামের লোকজনদের চলার পথের পাথেয়।

গান্ধীজি স্থির করলেন তিনি সেই গ্রামে যাবেন। সেখানকার লোকজনদের সঙ্গে কথা বলবেন। যেই কথা সেই কাজ। মীরাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চললেন সিন্দি গ্রামে। গ্রামের প্রায় সব বাড়িই মাটি দিয়ে তৈরি। গান্ধীর ও মীরার জন্য আলাদা থাকার ব্যবস্থা করা হলো। গান্ধীর ও মীরার জন্য আলাদা থাকার ব্যবস্থা করা হলো ইটের ওপর ইট সাজিয়ে অস্থায়ী ভাবে বাড়ি বানানো হল। গান্ধীজি ও মীরা এরকম দুখানা আলাদা আলাদা ঘরে থাকতেন।

প্রত্যেক জাতের জন্য আলাদা আলাদা কুঁয়ো ছিল। কেউ কারুর কুঁয়োতে জল স্পর্শ করতে পারত না। মীরা ত এ সমস্ত জিনিসের জন্য প্রস্তুত নন। তিনি এ সমস্ত সামাজিক রীতি নীতি দেখে ভীষণভাবে চিন্তাগ্রস্ত।

মীরা প্রথমে হরিজনদের জন্য স্থাপিত একটা কূঁয়োতে জল আনতে গিয়েছিলেন। হরিজনরা মীরাকে টিউবওয়েল বা কুঁয়ো স্পর্শ করতে দিল না। মীরা তাঁর জলের বালতিটিকে বেশ দূরে সরিয়ে রাখতে বাধ্য হলেন। যাতে তাঁর বালতির ছোঁয়া অন্য কারুর গায়ে লাগতে না পারে। মীরা হরিজনদের একটা বালিকাকে তাঁর বালতিতে জল দিতে অনুরোধ করলেন। হরিজন বালিকাটি তার জলের পাত্র করে জল তুলে মীরার বালতিতে দূর থেকে ঢালতে লাগল। অনেক সময় এমন অবস্থা দাঁড়াতো যে মীরা টিউবওয়েলের পাশে অন্যকাউকেও দেখতে পেতেন না। মীরার ত টিউবওয়েল বা কুঁয়োতে হাত দেওয়া বারণ। এদিকে কুঁয়ো থেকে জল তোলা সম্ভব হচ্ছিল না। কেন না সকলেই হয়ত চলে গেছে মাঠে। কাউকেও ডেকে যে কিছু বলবে সেই সুযোগও নেই। কোন উপায় না দেখে মীরা খালি বালতি নিয়ে হতাশ মনে তাঁর ঘরে ফিরে যেতেন। অস্পৃশ্যতা জিনিসটা কি বাস্তব এ অবস্থা থেকে মীরা উপলব্ধি করলেন।

এর কিছুদিন পর সিন্দিতে প্রাদুর্ভাব ঘটল কলেরা রোগের। অপরিচ্ছন্ন অপরিশোধিত জলই এ বিপত্তির কারণ। এর মধ্যে আঠার বছরের একটি ফুটফুটে যুবক আক্রান্ত হলো কলেরা রোগে। মীরা ছুটলেন হাসপাতালে ঔযধের জন্য। ডাক্তার আনা হলো। ঔষধও দেওয়া হল। কিন্তু কোনই ফল হলো না। ছেলেটা রক্তবমি করতে করতে নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

ছেলেটাকে যে ঘরে রাখা হয়েছিল সেটা ছিল ছোট। মা ছেলের মাথাটা নিজের কোলের উপর রেখে তার সেবা করছিল। বমি পরিষ্কার করছিল হাত দিয়ে। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে কলেরা যে সংক্রামক ব্যাধি সেটা তার পক্ষে বুঝা সম্ভব হচ্ছিল না। তার কোলের উপরই মাথা রেখে ছেলের ঘটল মৃত্যু। মীরা সামনে দাঁড়িয়ে। পাশে ছিল খাবার জলের জার। মহিলাটি সেই জলের মধ্যেই নোংরা হাতখানা ডুবিয়ে জলনিল। বুঝতে পারল না কলেরার জীবনু কি ভয়ঙ্কর। তাঁর অপরিচ্ছন্ন হাতের স্পর্শে খাবারের জল বিষাক্ত হয়ে পড়ল। মীরা মহিলাটিকে বুঝালেন। মহিলাটি মীরার কথায় কর্নপাত করলেন না। মীরা বুঝলেন শিক্ষার অভাবে এসমস্ত গ্রাম্যমহিলা কিভাবে কলেরা রোগ প্রতি বাড়িতে বাড়িতে ছড়াচ্ছে। তবে মীরার আপ্রাণ-প্রচেষ্টায় টিকা এবং অন্যান্য ব্যবস্থা নেবার ফলে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব কমল। মীরা ছোট ছোট সভা করে গ্রামবাসীদের স্যানিটেশন সম্পর্কে বুঝাবার চেষ্টা করলেন। দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রমে মীরার অসুস্থ হয়ে পড়ার উপক্রম।

তবে মীরার এই পরিশ্রম এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচারের ফল ফললো। গ্রামবাসীরা

মীরার কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারল। তারা বুঝতে পারল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কলেরার টিকা-পরিশোধিত পানীয় জল কলেরা নিবারণের অন্যতম উপায়।

এরপর সিন্দি গ্রামের মাহার এবং হরিজন গোষ্ঠীর লোকেরা মীরাকে বোঝার চেষ্টা করল। সন্ধ্যার সময় তারা দলে দলে মীরার ঘরে এসে জড়ো হতে লাগল। নানান গল্পগুজবের মধ্যে দিয়ে মীরা সমস্ত গ্রামবাসীদের শিক্ষা-দীক্ষার ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতেন। গ্রামবাসীরা নিবিষ্টমনে মীরার কথা শুনত। মীরার বক্তব্য যেন তারা তন্ময় হয়ে শুনত। মীরাকে তারা কীর্ত্তন গেয়ে শোনাতো। তাদের সুখ দুঃখের কথা বলত। ধীরে ধীরে মীরাকে ঘিরে গ্রামে গড়ে উঠল এক সংগঠন। গ্রামের বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দল মীরাকে নিজেদের কন্যার মত দেখতে লাগলো। মীরার বিপুল কর্মকান্ড সিন্দি গ্রামের চেহারা পাল্টে দিল। মীরাকে তারা ছাড়তে নারাজ।

কিন্তু মীরা সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি এরপর অন্য একটি গ্রামে যাবেন। সেইখানে সবরমতির অদলে একটা আশ্রম গড়বেন। মীরা চেয়েছিলেন সিন্দির কাছাকাছি কোন গ্রামকে বেছে নেবেন। সিন্দির কাছাকাছি কোন গ্রাম মিলল না। অনেকদিন ঘোরাঘুরির পর সিন্দি থেকে প্রায় ছমাইল দূরে তিনি একটি গ্রামের সন্ধান পেলেন। দেখলেন সেই গ্রামেব লোকেরা কিছুটা প্রগ্রেসিভ। মীরা জায়গাটাকে বেছে নিলেন নিজের কাজের জন্য।

গ্রামটির নাম সেঁগাও। এখানেও রয়েছে যমনলালজীর বিশাল ফলের বাগান। রয়েছে খামার বাড়ি। গ্রামবাসীদের সঙ্গে মীরা কথা বললেন। মীরার কথাশুনে তারা মীরাকে তাদের নেত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করল না। মীরা গান্ধীকে সেঁগাও এব ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে লিখলেন। গান্ধী যমনলালকে চিঠি দিলেন। যমনলাল গান্ধী সকাশে এলেন। সেঁগাওতে নতুন করে আশ্রম গড়ার ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে কথা হলো। যমনলালকে মীরার চিঠিখানা দেখালেন গান্ধী। মীরার কাজ কর্মের ও মনের ইচ্ছের কথা যমনলাল জানলেন।

এর কিছুদিন পর মীরা গান্ধীর কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন। গান্ধীকে মীরা যে চিঠি দিয়েছিলেন সেই চিঠিতে মীরার পরিকল্পনাটি বিস্তারিতভাবে বলা ছিল। সেগাঁওতে কি কি করতে চান-ম্যাপ এঁকে তার একটা খসড়া তিনি করে পাঠালেন গান্ধীকে।

গান্ধীর মনে খুশির জোয়ার বইতে লাগল। বুঝতে পারলেন মীরা একজনা সাক্ষাত ভগবতী। রূপে-গুণে চিন্তাশক্তিতে এক অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারিনী। গান্ধীর অনুমতি পেলেন মীরা। সিন্দি গ্রামের দিকে মীরার এখন নজর দেওয়া সম্ভব নয়। সিন্দিগ্রামে তাই অন্য লোককে পাঠালেন কাজের জন্য।

মীরা গান্ধীর সম্মতি পেয়ে কাজে হাত দিলেন। তিনি যমনলালের খামার বাড়িতে গিয়েছিলেন প্রথমে। নিজের থাকার জন্য জায়গা করে নিলেন খামার বাড়িতে রাখা একটা খালি গরুর গাড়ির ভেতর। কেন না তাঁর থাকার জন্য সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি সেখানে।

এরপর মীরা গ্রামের ভেতরে যেতে আরম্ভ করলেন। গ্রামবাসীদের সঙ্গে তাঁর একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠতে লাগল। মীরা গ্রামবাসীদের কাছে তাঁর স্থায়ীভাবে থাকার জন্য

একটা ঘর তৈরি করে দিতে অনুরোধ করলেন। শেষ পর্যন্ত গ্রামের প্রান্তে একটা ফাঁকা জায়গা মীরা পছন্দ করলেন। জায়গাটা ছিল একটি কামারশালার পাশে। সেখানে সাতফুট দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুট প্রস্ত বিশিষ্ট একটি ছোট কুটির তৈরি হল। গ্রামবাসীদের প্রচেষ্টায়। কাঠ, বাঁশ, মাটি আর তালপাতার ছাউনি। সঙ্গে ঢাকা একটা বারান্দা চার ফুট দৈর্ঘ্য ও তিনফুট চওড়া।

মীরা গ্রামবাসীদের নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গ্রামটির নাম দেওয়া হল সেঁগাও। গ্রামে শুরু হল সাফাই আন্দোলন। গ্রামবাসীদের নেত্রী মীরা। গান্ধী মীরার উৎসাহ দেখে প্রীত। ইংলন্ডের নৌবাহিনীর সর্বাধিনায়কের কন্যা খাঁটি ইংরেজ রমনী আজ ভারতের গ্রাম সমাজের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আত্মনিবেদিতা। গান্ধীজির টানে তিনি এসেছেন ভারতে। নিবেদিতা, অ্যানিবেশান্ত প্রমুখ বিদেশিনী মহিলার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতের নিপীড়িত জনগণের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছেন। ধনীর দুলালী মীরাকে হয়ত এরকম সমাজ সংস্কার মূলক কাজে আত্মনিবেদন করতে প্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছেন স্বয়ং বিশ্বপিতা।

দৈহিক সুখ, যৌবনের সব সুখ-শান্তি পরিত্যাগ করে মীরা এখন যোগিনীর বেশ ধারণ করেছেন। ভারতমাতার শৃঙ্খল মুক্তিই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। গ্রামসংগঠন ও সমাজ সংস্কারের কাজে তিনি আত্মনিবেদিতা। মীরার দেহমন এখন সেগাঁওর উন্নতি বিধানের জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টায় উদ্বেল। সেজন্যই পরিকল্পনামত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার কথা চিন্তা ভাবনা করছেন আর বিবিধ পরিকল্পনাও গ্রহণ করছেন তিনি।

মীরা এখন ব্যস্ত। ব্যস্ত দারুণভাবে। হঠাৎ খবর পেলেন বাপু অসুস্থ। উচ্চ রক্তচাপ। সঙ্গে রয়েছে স্নায়বিক দুর্বলতা। বিনোবা ভাবের ওয়ার্ধা আশ্রমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল। ডাক্তারের পরামর্শে বাপু সেখানে সম্পূর্ণ বিশ্রামরত। সেঁগাও থেকে ওয়ার্ধার বিনোবার আশ্রমের দূরত্ব মাত্র মাইল তিন-চার। মীরা ছুটলেন ওয়ার্ধা। বাপু যে ঘরে রয়েছেন সেই ঘরের দিকেই মীরা ছুটলেন। কিন্তু তাঁকে সেই ঘরে যেতে দেওয়া হলো না।

সেখানকার কর্তাব্যক্তিরা বললেন মীরাকে দেখলে বাপু আরও অস্থির হয়ে পড়বেন। মীরা বাপুর ঘরের সামনে বারান্দায় থাম ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। অভিমানে দুঃখে অঝোরে কাঁদলেন। কিন্তু কোন ফল হলো না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। বাপুর সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব নয় দেখে নীরবে সেঁগাওর পথে রওনা দিলেন। মীরা বলছেন ওয়ার্ধা আশ্রমের কর্তাব্যক্তিদের এরকম ব্যবহার মীরার মনে বহুদিন বিরাজমান ছিল। এ ঘটনা তাঁকে বছরের পর বছর কষ্ট দিয়েছে। বাপু অবশ্য মীরার আগমন বার্তা জানতেই পারলেন না। গান্ধীভক্তের দল মীরাকে এই বলে সতর্ক করে দিলেন যে তিনি যেন সেঁগাও ছেড়ে ওয়ার্ধাতে আর না আসেন। আরও জানিয়ে দিলেন যে এটা স্বয়ং বাপুর নির্দেশ। অথচ বাপু এ সমস্ত ব্যাপারে কিছুই জানেনা। বাপুর ভক্তের দল যেন বাপুর কর্তা।

কুড়ি

এর মধ্যে গান্ধীর স্বাস্থ্য অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠল। তবে উচ্চরক্তচাপ কমে নাই। ডাক্তার তাই তাঁকে আহমেদবাদ-এ স্থানান্তরিত করতে নির্দেশ দিলেন। বাপু যাবেন আহমেদাবাদে। এর মধ্যে মীরার সঙ্গে বাপুর দেখা হল কয়েকবার। মীরা কিন্তু গান্ধীকে কোন কথাই খুলে

বলতে পারলেন না। মীরাকে যেন অনেকেই সহ্য করতে পারছিল না। বাপু আহমেদাবাদে যাওয়ায় মীরার সুবিধে হলো। বাপুকে চিঠিতে সব কিছু বিস্তারিতভাবে জানাবার সুযোগ হলো মীরার।

মীরা বাপুকে জানালেন যে সেঁগাওতে তিনি ভয়ে ভয়ে থাকেন। কেন না সেগাঁওতে অনেকেই তাঁকে বিদ্বেষের চোখে দেখেন।

গান্ধী মীরার চিঠি পেলেন। মীরার চিঠিটা আদ্যন্ত পড়লেন তিনি। গান্ধী ভক্তের দল মীরা সম্পর্কে কটু মন্তব্য করতে পিছপা হল না। গান্ধী মীরাকে ভুল বুঝলেন। অত্যন্ত কটূ ভাষায় মীরাকে চিঠি দিলেন। মীরাকে তিনি স্পষ্টতই লিখে দিলেন যে মীরা যদি সেগাঁওতে থাকতে না চান তাহলে তিনি যেন অন্যত্র চলে যান। সেগাঁওতে কাজ করার জন্য মীরার বিকল্প লোক তিনি ঠিক করে রেখেছেন।

মীরা বাপুর চিঠি বার বার পড়লেন। পড়লেন নিবিষ্ঠমনে। চিঠি পড়তে পড়তে তাঁর চোখ দুটি অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। নীরবে ভগবানের কাছে আপনমনে আকুল প্রার্থনা জানালেন। হায় বিধাতা এরকম সতী-সাধবী রূপসী বিদেশিনীর আজ কি অবস্থা।

মীরা শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তবুও ভগবানে ভরসা করে মনে বল সঞ্চয় করলেন। স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন সেগাঁওতেই কাজ করবেন। তা বাপুকে ফেরৎডাকে জানিয়ে দিলেন তিনি।

সেগাঁও সিন্দি গ্রামের চেয়ে অনেকাংশে ভালো। সেগাঁওর পরিবেশ অনেক সুন্দর। মানুষের রুচিবোধ-ও বেশি। স্যানিটেশন্ ব্যবস্থা অনেক সুষ্ঠু। ধীরে ধীরে মীরার মন শক্ত হয়ে উঠল। নবউদ্যমে কাজ শুরু করলেন।

বাপু এখন শারীরিক দিক থেকে অনেক অনেক সুস্থ। আগেরমতই তিনি তাঁর চলা ফেরা করার ক্ষমতা ফিরে পেয়েছেন। গান্ধী ছুটলেন স্যাবলি নামক একটি জায়গায়। সেখানে গান্ধী সেবা সঙ্ঘের প্রথম অধিবেশন। গান্ধী গেছেন যোগ দিতে। মীরা সেখানে যাননি। বাপুর সম্মতি মিলেনি-তাই মীরার যাওয়া হলো না। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মীরা সেগাঁওতে রয়ে গেলেন।

'গান্ধী সঙ্ঘের' অধিবেশন শুরু হল। গান্ধীর চাটুকাররা গান্ধী দর্শন নিয়ে আলোচনা করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। তারা গান্ধীকে তোষণের সুরে বলতে দ্বিধাবোধ করলেন না যে তাঁরা গান্ধী দর্শন নিয়ে ব্যাপক প্রচারে নামতে চান। গান্ধী তাঁদের কথাতে আমল দিলেন না। তিনি তোষামোদকারিদের বলে দিলেন গান্ধী দর্শন বলে কিছুই নেই। তবে তাঁর অন্তরের কথাই তিনি জনগণের মধ্যে প্রচার করতে বদ্ধপরিকর। তাঁর জীবনই তাঁর বানী। সত্য ও অহিংসই তাঁর জীবনের ব্রত।

গান্ধীর মন এখন অনেকটা শান্ত। সুস্থির চিন্তাধারা তাঁর মনের অলিন্দে ঘোরপাক খাচ্ছে। তাঁর ভক্তদের কথাই এখন তিনি আর বিশেষ আমল দিতে চান না। মীরার আত্মত্যাগের কথা তাঁর মনে জাগে। মীরাকে চিঠি দিলেন স্যাবলি থেকে। বুঝিয়ে বললেন মীরা যেন আপন মনে তাঁর কাজ করে যান। গান্ধী ভক্তের দল মীরার উপর দারুণ অসন্তুষ্ট। তাঁরা গান্ধীকে সেগাঁওতে থাকতে দিতে নারাজ। তবে মীরার উপর গান্ধীর আস্থা যেন আবার ফিরে এসেছে। মানুষের মন তোষামদে ভুলে যায়। স্বয়ং ভগবানও তোষামদের ভক্ত।

অতএব রক্তমাংসের মানুষ গান্ধী তো এর ব্যতিক্রম হতে পারেন না। মীরা এসব কথা শুনতে শুনতে অস্থির হয়ে পড়েছেন। কিন্তু কারও সম্পর্কে একটি বারের জন্যও গান্ধীকে নালিশ করেন নি. নীরবে ভগবানের কাছে তাঁর মনের আকুল মিনতি জানিয়েছেন।

মীরার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে অ্যানিবেশান্ত ও নিবেদিতার চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অ্যানিবেশান্ত ভারতে এসেছিলেন স্বামীপুত্র-সংসার ত্যাগ করে। ভারতের মাটিতেই তিনি দেহ রাখেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অকল্পনীয় অবদান ভারত তথা বিশ্বইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। অথচ ভারতের জ্ঞানী গুনীদের কেউ কেউ তাঁকে রাক্ষসি পুতনার সঙ্গে তুলনা করতে কার্পণ্য করেননি। অ্যানিবেশান্তও কিন্তু কারও বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেননি। নীরবে নিভৃতে কাজ করে গেছেন। ভারতে মুক্তি সংগ্রামে করেছেন আত্মনিবেদন।

নিবেদিতার জীবনও ভারতের মাটিতে শেষ হয়ে গেছে। সশস্ত্র বিপ্লবের মূলমন্ত্র তিনিই প্রচার করলেন। ভারতের স্বাধীনতা দেখে যাবার সুযোগ তার বা অ্যানিবেশান্তের হয়নি। তবে মীরা বেন ভারতের স্বাধীনতা স্বচক্ষে দেখেছেন। দেখেছেন গান্ধীর মৃত্যু স্বচক্ষে। স্বাধীনতার পর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। চেষ্টা করেছেন গান্ধীর গ্রাম স্বরাজ পরিকল্পনা কার্যকরী করতে। কিন্তু সফল হননি। মনের দুঃখে স্বদেশে ফিরে গেছেন।

একুশ

গান্ধী স্যাবলি থেকে ছুটলেন দিল্লী। হরিজন কলোনীতে সেখানে কিছুদিন থাকবেন তিনি। কিছুদিন কাটালেন লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের বাৎসবিক অধিবেশন। মীরার কাছে আবার পূর্বের মত গান্ধী চিঠি পাঠাতে লাগলেন।

১৯৩৭, ১৪ই মার্চ। এক চিঠিতে গান্ধী মীরাকে লিখলেন যে সেগাঁওর জন্য তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠেছে। অতিশীঘ্রই তিনি সেগাঁও যাবেন। তবে তাঁর ভক্তবৃন্দ তাঁকে সেখানে যেতে দিতে ভীষণভাবে নারাজ।

সেখানে এর মধ্যে প্রচন্ড গরম পড়ে গেছে। মীরার পক্ষে সেখানে থাকা যেন অসম্ভব হয়ে উঠল। রোদ উঠলেই মীরা বের হতে পারেন না। হেঁটে চলাফেরা করা তাঁর পক্ষে ক্লান্তিকর হয়ে উঠে। মীরা অনেক চিন্তাভাবনা করে একটা ছোট টাট্টু ঘোড়া কিনলেন। ঘোড়াটির নাম দেওয়া হলো সেজিতা।

সেজিতা ছিল মীরার অকৃত্রিম বন্ধু। হিংসা, ঘৃণা, দ্বেষ তার মধ্যে ছিল না। সেই ছিল সেগাঁওতে মীরার একমাত্র অকপট সঙ্গী। ঘোড়াটির খাওয়ান-দাওয়ান পরিচর্যা ইত্যাদি মীরাকেই করতে হতো। সেজিতা যেন মীরার নিজের সন্তান। সন্তান ও মায়ের সম্পর্ক সেজিতাও মীরার মধ্যে গড়ে উঠেছে।

মীরা গরমে অস্থির হয়ে উঠত। তাই সেজিতার পিঠে চড়ে মীরা চলে যেতেন যমনলালজীর ফলের বাগানে। দিনের বেলাতে। সেখানে গাছের শীতল পরিবেশে ছোট একটা ঘর বানালেন। সেজিতাও মীরা সেখানে থাকত। সন্ধ্যা সমাগমে ধীরে ধীরে সেজিতার পিঠে চড়ে আবার সেগাঁওতে ফিরে আসতেন মীরা। তখন আবহাওয়া অনেকটা শান্ত। তবে

মীরার কাজকর্মের বেশ কিছুটা ব্যাঘাত সৃষ্টি করত প্রচন্ড গরম।

এর মধ্যে মীরা গান্ধীর একখানা চিঠি পেলেন। তিনি সেগাঁওতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান বলে মীরাকে জানিয়েছেন।

গান্ধী জানতে পেরেছেন যে সেগাঁওতে মীরা গরমে খুবই কষ্ট পাচ্ছেন। মীরা প্রচন্ড গরমে দিনের বেলায় বেশি চলা ফেরা করতে পারেন না। গান্ধী চিন্তিত। তিনি মীরাকে লিখে জানালেন যে মীরা যেন দিনের বেলায় বিনোবাজীর ওয়ার্ধা আশ্রমে চলে যান। ওয়ার্ধা আশ্রম সেগাঁও থেকে তিন-চার মাইল দূরে।

গান্ধীর নির্দেশমত মীরা সেজিতার পিঠে চড়ে খুব ভোরে সূর্য ওঠার আগেই ওয়ার্ধা আশ্রমের দিকে রওনা দিতেন। ফিরে আসতেন সন্ধ্যাসমাগমে। এসে অধিক রাত অবধি সেগাঁওর লোকজনদের নিয়ে কাজ কর্মে মেতে থাকতেন।

এর মধ্যে গান্ধী চলে এসেছেন সেগাঁওতে। যমনলালজীরই জায়গা পুরো সেগাঁও। এখানে গান্ধী তাঁর গ্রাম স্বরাজের পরিকল্পনা কার্যকরি করার কাজে হাত দিলেন। সেগাঁওর নাম দেওয়া হল সেবাগ্রাম।

সেগাঁওর নাম সেবাগ্রাম দেবার কারণ এই যে সেগাঁও নামে আর একটি বড় গ্রাম ছিল। তাই চিঠিপত্র এলে পোষ্ট অফিস অসুবিধেয় পড়ত। নানান চিন্তাভাবনা করে গান্ধী মীরার পরামর্শে সেগাঁওর নাম পরিবর্তন করে রাখেন সেবাগ্রাম।

গান্ধী কিছুদিন মীরার ছোট কুটিরে আশ্রয় নিলেন। মীরাই গান্ধীর থাকার সব ব্যবস্থা করলেন। একটি সুন্দর বলিষ্ঠ ছাগী আনা হলো। গান্ধী তার দুধ খেতেন। আর মীরার ছিল একটা ছোট ঘোড়া ও একটা গাভী।

মীরা যমনলালজীর অনুমতি নিয়ে সেগাঁওর উত্তর দিকে বিরাট জায়গার একটি অংশ (প্রায় এক একর) নিয়ে বাপুর জন্য কুটির তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। কাজ হলো শুরু। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন গান্ধী স্বয়ং মীরার অনুরোধে।

স্থির হলো বিশাল জায়গার মাঝখানে ৩০ / ১৫ একখানা বড় ঘর তৈরি করা হবে, তার সঙ্গে থাকবে সম পরিমাণ লম্বা বারান্দা। গান্ধী নিজেই দু' চারদিন কাজ দেখাশুনা করলেন। এরপর সমস্ত কাজ দেখাশুনা করার দায়িত্ব পড়ল মীরার উপর।

বাইশ

এর মধ্যে বাপুর আবার রক্তচাপ বৃদ্ধি পেল। ডাক্তার বললেন তাঁর বিশ্রাম প্রয়োজন। স্থির হলো বিশ্রামের জন্য তাঁকে নন্দীহিলস্-এ নিয়ে যাওয়া হবে। গান্ধী চললেন নন্দী হিলস্-এ। মীরা রয়ে গেলেন সেবাগ্রামে। গান্ধীর দুজন একান্ত অনুগামী মীরাকে সাহায্য করার জন্য থেকে গেলেন সেবাগ্রামে।

এঁদের একজনের নাম বলবন্ত সিং। কৃষক পরিবারের সন্তান। অন্যজন হলেন মুন্নালাল শা। আইনজীবি। গান্ধীর আহ্বানে আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যোগ দেন সমাজ সেবার কাজে।

সেবাগ্রামে মীরা এঁদের সাহায্যে জোর কদমে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। চেষ্টা

করতে লাগলেন বর্ষার আগে যাতে বাড়ির কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলতে পারেন। গান্ধী একমাস থাকবেন নন্দী হিলস্-এ সেখান থেকে সোজা চলে আসবেন সেবাগ্রামে। বাড়িটি তৈরি হচ্ছিল মাটি দিয়ে। বাড়িটির ছাদ তৈরি হাবার আগে বৃষ্টি এসে গেলে মাটির বাড়ি মাটিতেই মিশে যাবে। মীরার মাথায় রয়েছে ঘোর চিন্তা। কাজ শেষ করতেই হবে যে কোন প্রকারে। পুরুষ এবং মহিলা শ্রমিকরা কর্মে ব্যস্ত। মীরা তাদের সব বুঝিয়ে বললেন।

গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করা হল পাথরের টুকরা ও অন্যান্য জিনিসপত্র বয়ে আনার জন্য। সঙ্গে একটি গোয়ালঘরও তৈরি হচ্ছে। দিনে-রাতে কাজ চলছে। মীরা-বলবন্তসিং-মুন্নালাল আর শ্রমিক ভাই বোনদের নিয়ে।

বাড়ি তৈরির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এমন সময় মীরা আক্রান্ত হলেন ম্যালেরিয়া রোগে। একে গরম। তার উপর গায়ে প্রায় ১০৫° ডিগ্রীর উপর জ্বর। দিনের বেলায় মীরা জ্বরের প্রকোপে ছটফট করতেন।

বলবন্ত সিং আর মুন্নালাল মীরাকে শীঘ্রই সারিয়ে তোলার জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা করতে লাগলেন। মীরার জ্বরের খবর পৌঁছে গেল যমনলালজীর কাছে। উনি মীরাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ডাক্তারের সুচিকিৎসায় মীরা সুস্থ হয়ে উঠলেন। বিশ্রাম নিলেন কিছুদিন। তারপর চলে এলেন সেবাগ্রামে।

মীরার শরীর দুর্বল। তবুও সেবাগ্রামে গান্ধী কুটিরের নির্মাণ কাজের ওপর নজর রাখতে লাগলেন তিনি। মাটির বাড়ি। এর মধ্যে শুকিয়েছে চার দেওয়াল। তবে মেঝেটা শুকোয়নি পুরোপুরি। চারকোল জ্বালিয়ে মেঝেটা শুকোতে হলো।

বাপুর চিঠি এলো। লিখেছেন আবহাওয়া একটু ভালো হলেই তিনি আসবেন সেগাঁওতে। কিন্তু আবহাওয়া বেশ কিছুদিন খারাপ চলল। মীরা ভাবলেন বাপু তো আপাতত আসছেন না। কিন্তু না, বাপুর খেয়াল চাপল খারাপ আবহাওয়ার মধ্যেই তিনি সেগাঁওতে আসবেন। মীরার কাছে খবর গেল বাপু আসছেন।

মীরা, মুন্নালাল, বলবন্ত সকলেই বিস্মিত ও হতচকিত। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই দেখলেন খারাপ আবহাওয়া বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সঙ্গীদের নিয়ে বাপু এসে হাজির হয়েছেন সেগাঁওতে। বাপু মীরাকে জানিয়ে দিলেন সেঁগাঁওতে তিনি একাই থাকবেন। মীরাকে 'ভেরোদা' গ্রামে যাবার জন্য নির্দেশ দিলেন। ভেরোদা কুটির নামে একটা কুটির সেখানে তৈরি করা হলো। মীরা সেখানে থাকবেন। মীরা তাঁর ছোট ঘোড়া 'সেজিতা'কে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। তার থাকার জন্য একটা আস্তাবলও তৈরি করা হলো সেখানে। তৈরি করা হলো ছোট একটি গেয়ালঘরও। বলবন্ত সিং ও মুন্নালাল থাকলেন সেগাঁওতে। মগনাদি থেকে লীলাবতি বেন এলেন।

সেগাঁওতে বাপু যেভাবে থাকতে চেয়েছিলেন তার একটু অদলবদল হলো। মীরা বাপুকে মুখে কিছু খবর পরিবেশন করেছিলেন। এটা ভেরোদা গ্রামে যাবার একুশদিন পর। এর উত্তরে বাপু মীরাকে যা লিখেছিলেন তা খুবই দুঃখজনক। ২০ শে জুলাই গান্ধীর ছিল মৌন দিবস। সেই দিনই তিনি মীরাকে এ চিঠিখানা লিখলেন।

গান্ধী লিখলেন, No one understands what message the bearer has brought. Lilavati is too careless too understand. I can not speak, Munnalal is half-dead

Balavant threatens to follow the suit. In these circumstances it is better to write out what you want. This has become a confused house hold instead of a hermitage it was expected to be. Such has been my fate! I must find my hermitage from within".

গান্ধী ভর্ৎসনার সুরে মীরাকে যা লিখলেন তা সত্যি বেদনাদায়ক। এখানে গান্ধী চরিত্রের এক অদ্ভুত দিক ফুটে উঠেছে। মীরাকে এক এক সময় প্রচন্ড রকমের বিশ্বাস করেন। মীরার কাজকে স্বীকৃতি দেন। আবার এক এক সময় মীরার কোন কথাই যেন তাঁর সহ্য হয় না। তিনি মীরাকে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ভাষায় আঘাত করতে কার্পণ্য করেন না।

মীরার সঙ্গে গান্ধীর চিঠি-পত্র ও কথা বার্তার মধ্যে এমন কিছু জিনিস প্রকট হয়ে উঠে যাতে মনে হয় রূপসী মীরার দৈহিক সৌন্দর্য আশ্রমের অনেক গান্ধীভক্তের আকর্ষণের বস্তু। গান্ধী সেটা যেন বুঝেও বুঝেন না। আর মীরা এত লাঞ্ছনা ও কটুবাক্য সহ্য করে নিজেকে তিলে তিলে দগ্ধ করেছেন। এক এক সময় হয়ত তিনি ভেবেছেন দেশে ফিরে যাবেন। কিন্তু অদৃশ্য কোন শক্তির আকর্ষণ যেন তাঁকে গান্ধীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি।

মীরা ভেবেছিলেন ভেরোদা গ্রাম থেকে রোজ এসে অন্তত একবার বাপুর সঙ্গে দেখা করবেন। কেননা ভেরোদা আর সেবাগ্রামের দূরত্ব খুব বেশী নয়। কিন্তু বাপুর কড়া নির্দেশ সপ্তাহে একদিনের বেশী তিনি সেগাঁওয়ে যেতে পারবেন না। মীরা বিস্মিত। মীরা হতাশ। রান্না বান্না খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি ব্যক্তিগত কাজ সেরে মীরা যা সময় পেতেন তা ব্যয় করতেন ভেরোদা গ্রামের সেবার কাজে। মীরা আবার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কালা জ্বরে। দেখার লোকজন বিশেষ কেউ নেই। ঘরের কাজকর্ম করার বা মীরাকে দেখার মতন লোকজন নেই বললেই চলে।

গান্ধী মীরার অসুখের সংবাদ পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন বিশ্বস্ত লোককে পাঠিয়ে দিলেন মীরার কাছে। মীরাকে সেবাশুশ্রূষা করার জন্য। কিন্তু মীরার জ্বর কমার কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হল না। গান্ধী গভীরভাবে চিন্তিত। অন্যকোন উপায় না দেখে তিনি নিজে মীরার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। গান্ধী মীরার অবস্থা দেখে চিন্তিত। তিনি স্থির করলেন মীরাকে সেবাগ্রামে নিয়ে যাবেন।

গরুরগাড়ি এলো গান্ধীর নির্দেশে, গাড়িতে মীরাকে তোলা হলো। গান্ধী বা আর কেউ সেই গাড়িতে উঠলেন না। গান্ধী তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে মীরার গাড়ির পেছন পেছন হেঁটে চললেন। মীরা অসুস্থ শরীরে কেঁদে আকুল। গান্ধীর মানবিকতা তাঁকে আকৃষ্ট করল। একটা কথাও গান্ধীকে বললেন না। চুপচাপ গরুর গাড়িতে শুয়ে রইলেন-তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে।

গরুরগাড়ি ক্রমে মীরাকে সেবাগ্রামে নিয়ে এল। সেখানে মহিলা বলতে আর কেউ ছিল না. কেবলমাত্র মীরাই একমাত্র মহিলা। এরমধ্যে বলবন্ত সিং চলে গেছেন। চলে গেছেন লীলাবতি। তবে এসে উপস্থিত হয়েছেন সীমান্ত গান্ধী। অর্থাৎ খান আব্দুর গফুর খান। তিনি বাদশা খান নামে সমধিক পরিচিত। গান্ধী তাঁকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখার কাজে ব্যস্ত। এর মধ্যে মীরা অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

মীরার দিন মোটামুটিভাবে চলে যাচ্ছিল। বাদশা খান আর গান্ধী ছাড়া সেবাগ্রামে

এসেছেন নানাবতি আর পীয়ারিলাল। কিছুদিন পর উপস্থিত হলেন বলবন্তসিং। গায়ে তাঁর প্রচন্ড জ্বর। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাঝে মাঝে আপন মনে কি যেন বলে যেতে থাকে। মীরা ও পিয়ারীলাল তাঁকে প্রচুর সেবাযত্ন করলেন। এমনসুন্দর সেবাযত্নে ক্রমেই সেরে উঠল বলবন্ত।

এর মধ্যে কর্মব্যপদেশে বাপুকে ছুটতে হলো বেনারস সেখান থেকে রাজকোট, সেখান থেকে আহমদাবাদ। মীরার শরীর এখন অনেক সুস্থ। বাপু বাইরে ছিলেন মাসেক কাল। মীরা এর মধ্যেই সেবাগ্রামে তৈরি করেছেন তাঁর নিজের জন্য থাকার একটি কুটির। গান্ধীর কুটিরের কাছেই ছিল তাঁর সেই কুটির।

গান্ধী ফিরে এলেন সুস্থ শরীরে। আছেন বেশ খোসমেজাজে। তখন সেবাগ্রামে চলছে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। গান্ধী ক্রমেই দু'একদিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আক্রান্ত হলেন ম্যালেরিয়া রোগে। যমনলালজী, মীরা, বলবন্ত, মহাদেব সকলেই সমভাবে চিন্তিত। যমনলালজীর অনুরোধে বাপু ওয়ার্ধা সিভিল হাসপাতালে ভর্ত্তি হলেন। গান্ধী ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠলেন।

মীরা নিয়মিত বাপুকে দেখতে যেতেন। একদিন অদ্ভুতভাবে এক সাপুড়ে এসে হাজির হলো হাসপাতালে। বাপুর খোঁজে। সাপুড়ের থলিতে বেশ কিছু সাপ। বিষধর তো বটেই। সাপুড়ে গান্ধীভক্ত। গান্ধীর অনুমতি নিয়ে সাপুড়ে বেশ কয়েকটা সাপ ছেড়ে দিল বাপুর বিছানার ওপর। এর মধ্যে একটা সাপ ছিল দেখতে অপূর্ব। দেখলে চোখে তাক লেগে যায়। সেই সাপটিকে বাপুর কম্বলের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সাপটি মাথা উঁচু করে শরীরটাকে দুলিয়ে দুলিয়ে নৃত্য করছিল। বাপু পাদুটো রেখেছিলেন সোজা করে। স্থির ভাবে। পায়ের নড়নচড়ন যেন কোন এক যাদুমন্ত্র বলে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। বাপু বেশ কিছুক্ষণ নিবিষ্টমনে সাপ খেলা দেখলেন। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী ভীত সন্ত্রস্ত। তবে সাপের খেলা দেখে তাঁদের হৃদয় মন যেন আপ্লুত। কয়েকমিনিট মাত্র দেখানো হলো এই সাপ খেলা। তারপর সাপগুলোকে করা হলো বাক্সবন্দি। মীরার বুকে যেন বল সঞ্চিত হলো।

কিন্তু না এর কিছু পরেই সাপুড়ে দুটো গোখরো সাপকে ছেড়ে দিল হাসপাতাল চত্বরে। সাপ দু'টি ফোঁস ফোঁস করতে করতে হাসপাতালের এক তলায় উঠে এল। গান্ধী সব জিনিস নিবিষ্ট মনে অবলোকন করছিলেন। গান্ধীর মনে ভীতির সঞ্চার হলো। সাপগুলি তুলে নিতে বলে দিলেন। হাসপাতাল চত্বরের উপস্থিত সুধীবৃন্দ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

দু' একদিনের মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হল বাপুকে হাসপাতাল থেকে। ডাক্তারের পারামর্শে বাপু এসে উঠল মীরার কুটিরে। মীরা বাপুর সেবা করার সুযোগ পেলেন। বাপু প্রায় একমাস মীরার কুটিরে ছিলেন। বাপু সুস্থ হয়ে ছুটলেন দক্ষিণে। সেখানে হরিজনদের মন্দিরে ঢোকার অধিকার ছিল না। হরিজনদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করলেন। বাপু দক্ষিণদেশ ভ্রমণে ব্যস্ত।

মীরা বাপুর অনুমতি না নিয়ে যমনলালজীর সঙ্গে পরামর্শ করে কুটিরটিকে অপূর্ব সাজে সজ্জিত করলেন। কুটিরটির খোল নলচে পাল্টে দেওয়া হলো। ছোট কুটিরটিকে দেখতে

লাগছিল অপূর্ব। দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ-সমাপনান্তে বাপু সেবাগ্রামে এসে হাজির হলেন। তাঁর কুটিরের অপূর্ব চেহারা দেখে তিনি প্রীত হলেন বটে কিন্তু তার জন্য প্রভূত অর্থব্যয় হওয়াতে তিনি মীরাকে বকলেন। তবে কুটিরে বাস করতে অসম্মত হলেন না।

সেবাগ্রামে গান্ধীর সেই কুটিরটি এখনো বর্তমান। হাজার হাজার দর্শক ও গান্ধী ভক্তের দল এখনো সেবাগ্রামে যান এবং গান্ধীর কুটিরে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের সঙ্গে কেউ কেউ সেবাগ্রামের তুলনা করে থাকেন। তবে এই তুলনা কতখানি যুক্তিগ্রাহ্য তা বলা মুশকিল।

এতৎসত্ত্বেও মীরার মন নানান চিন্তাতে উদ্‌গ্রীব। কেন না তিনি জানেন গান্ধী তাঁকে স্থায়ীভাবে সেবাগ্রামে থাকতে দেবেন না। অন্যত্র সমাজসেবার কাজে চলে যেতে নির্দেশ দেবেন।

ধীরে ধীরে সেবাগ্রামে বিস্তর জ্ঞানী-গুনী পুরুষ ও মহিলার দল এসে জড়ো হতে লাগল। গান্ধীর সমস্ত কাজকর্ম দেখা শুনার ও কাজকর্মে সাহায্যের জন্য রইলেন প্রভাবতী বেন। বিখ্যাত সমাজতান্ত্রিক নেত্রী। বিখ্যাত সমাজতান্ত্রিক নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের স্ত্রী। আর রইলেন আমতাস সালাম, পাতিয়ালার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রীলোক, লীলাবতিবেন ও পিয়ারীলালের ভগ্নি সুশীলা।

সুশীলা সম্প্রতি ডাক্তারী পাশ করেছেন। আর রয়েছেন কাপুর তলার রাজকুমারী অমৃতকাউর। গান্ধীর লোকের অভাব হলো না। গান্ধীর সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব নিলেন রাজকুমারী অমৃত কাউর। অতএব মীরার এখন বিশেষ প্রয়োজন নেই গান্ধীর ব্যক্তিগত কাজে। মীরা এখন গ্রামের কিছু ছেলেমেয়েকে চরকায় সুতো কাটা সেখাবার কাজে ব্যস্ত।

এটা ছিল ঘরে বসে কাজ। মীরার তা আবার খুব পছন্দসই ছিল না। তিনি চাইতেন ঘুরে ঘুরে কাজ করতে। অর্থাৎ যাতে বেশি সংখ্যক লোকের সংস্পর্শে আসা যায়। আর প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মা হয়ে কাজ করে যেতে পারেন।

মীরা এসময়ে পশুপালন সংক্রান্ত ব্যাপারে একটা কাজের সন্ধান পেলেন। কাজটা ছিল তাঁর মনের মতন। এ ব্যাপারে বলবন্ত সিং এর সঙ্গেও তিনি আলোচনা করলেন। কিভাবে গোয়ালাদের গরুগুলোর স্বাস্থ্যসুন্দর ও অটুট রাখা যায়, কিভাবে তাঁদের সেবা যত্ন করলে বেশি দুধ পাওয়া যায়। সে সমস্ত ব্যাপারে মীরা চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন।

তবে গান্ধী মীরাকে এখন কোন স্পেসিফিক কাজের দায়িত্ব দেননি। মীরা তাই মানসিক দিক থেকে অবসাদগ্রস্ত। এলো মেলো কাজ তাঁর পছন্দের নয়। তাই মীরা খানিকটা উদ্‌ভ্রান্তা। পাগলিনীপ্রায়। গান্ধী তাঁর মানসিক অবস্থা খানিকটা উপলব্ধি করতে পারলেন।

মানসিক দিক থেকে যে মীরা অসুস্থ তা গান্ধীর বুঝতে অসুবিধে হলো না। তাই গান্ধী তাঁকে কিছুদিনের জন্য ডালহৌসীতে ডাঃ ধরমবীরের কাছে রাখার ব্যবস্থা করলেন। ডালহৌসী হিমালয়ের কোলে অবস্থিত। ছয় থেকে আট হাজার ফুট ওপরে অবস্থিত এই ডালহৌসী শহর। সুভাষ বোসও তখন ছিলেন ডালহৌসীতে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য। ডাঃ ধরমবীর সুভাষ-এর চিকিৎসা করছিলেন। এখানেই মীরার সঙ্গে সুভাষের প্রথম সাক্ষাত ঘটে। মীরা বলেছেন সুভাষ ছিলেন অসাধারণ। বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের ছাপ রয়েছে তাঁর চেহারাতে।

অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সুভাষের মনের মিল ছিল অতি সামান্যই।

মীরা ও সুভাষ সকালে ভ্রমণে বের হতেন। হিমালয়ের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তাঁদের মন আচ্ছন্ন হয়ে থাকতো। এরকম এক অপূর্ব পরিবেশে সুভাষকে জানার সুযোগ ঘটেছিল মীরার। তবে মীরা যে সুভাষকে সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছিলেন তা মনে হয় না।

কেন না মীরা লিখেছেন যে জওহর এর মধ্যে দু'বার কংগ্রেস সভাপতি হয়েছেন। সুভাষের মনেও কংগ্রেস সভাপতির হওয়ার আকাঙ্খা ছিল প্রবল। এবং তিনি কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন। তবে মীরা লিখেছেন সুভাষ পরবর্তী জীবনে নাৎসি হয়ে গিয়েছিলেন।

মীরার নিজের ভাষায় বলি, "Subhas achieved that office, but even that left him unsatisfied and restless. Then when war came he vanished, turned Nazi, went to Japan and Gathering up elements of the Indian Army in Burma announced that he would help free India from the British in co-operation with the Japanese. A wild ambition to serve his country which ended in a fatal air crash"—spirits Piligrimage by Mira Ben.

সুভাষ "turned Nazi" অর্থাৎ সুভাষ নাজি বনে গিয়েছিলেন মীরার একথাটা সম্পূর্ণই ভ্রান্ত। কেন না সুভাষ কোনদিনই নাজি বনে যাননি। তবে নাজি পার্টির শৃংখলাপরায়ণতা দেশের প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভক্তি, তাঁদের স্বদেশিকতাবোধ, হিটলারের প্রতি তাদের প্রাণ ঢালা আনুগত্য সুভাষকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। তাই সুভাষ অকপটে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি আজাদহিন্দ ফৌজের সৈন্যদের মধ্যে নাজি পার্টির শৃঙ্খলাবোধ, স্বদেশপ্রেম, নির্ভীক ভাব জাগাতে বদ্ধপরিকর। প্রয়োজনবোধে তিনি নাজিদের দিয়ে আজাদহিন্দ বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে আগ্রহী। মীরা কিন্তু এখনো মনের মতন কাজ না পাওয়ায় মানসিকভাবে অসুস্থ।

তেইশ

এর মধ্যে কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। গান্ধী কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা গান্ধীর সাহায্য ব্যতিরেকে চলতে অক্ষম। ১৯৩৭ সাল। জুলাই মাস। মীরা ডালহৌসী থেকে ফিরে এলেন সেবাগ্রামে। সেই সময় ভারতে এগারটির মধ্যে নয়টি প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করেছে কংগ্রেস। তাই নয়টি প্রদেশের সমস্যা ও সেগুলোর সমাধানের দায়িত্ব বর্তেছে কংগ্রেস এর উপর।

গান্ধী সেবাগ্রামে বিশ্রামরত। তাঁর রক্তচাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। রক্তচাপ বৃদ্ধি পাওয়াতে ডাক্তাররা চিন্তিত। ডাক্তারদের পরামর্শে গান্ধী চলে গেলেন বম্বেতে। সেখানে থাকতেন জুহু বীচের কাছে। বিড়লাভবনে। বেশ কিছুদিন সেখানে কাটিয়ে গান্ধী একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন। ফিরে এলেন আবার সেবাগ্রামে। সেবাগ্রাম তখন জমজমাট। বিভিন্ন জায়গা থেকে কংগ্রেস নেতারা দলে দলে আসতে লাগলেন। গান্ধীর পরামর্শ তাদের একান্তভাবে কাম্য। সেগাঁও সত্যি সেবাগ্রামে পরিণত। জায়গাটা আশ্রমের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এখানে গড়ে উঠেছে খাদি সঙ্ঘ পশু পালন কেন্দ্র, গুড় তৈরির কারখানা, কেননা সেখানে প্রচুর তালের রসের যোগান ছিল। গ্রামটিতে ছিল তালগাছের সমারোহ। তালগাছ খেজুর গাছ যেন সমস্ত গ্রামটিকে ঘিরে রেখেছে। গড়ে উঠেছে চিনি তৈরির কারখানা।

এভাবে সেবাগ্রাম হয়ে দাঁড়িয়েছে কুটির শিল্পের পীঠস্থান। গান্ধী এখানে বসেই তাঁর নতুন শিক্ষা পরিকল্পনা রূপায়নে ব্রতী হলেন। তাঁর বেসিক এডুকেশন অর্থাৎ হাতে কলমে শিক্ষা দেবার পরিকল্পনা এখানেই প্রথম রূপ পরিগ্রহ করে।

এব মধ্যে এখানে এসে হাজির হয়েছেন আর্যনায়কুম এবং আশাদেবী। একজন সিংহলের আর একজন বাংলার। দুজনই শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী। তাঁরা দুজনই অত্যন্ত উচ্চ চিন্তাধারায সমৃদ্ধ। গান্ধী এঁদের দুজনকেই তাঁর পরিকল্পনামত বেসিক এডুকেশনের কাজে নিয়োজিত করলেন।

মীরার সঙ্গে এঁদের দু'জনের গভীর ভাব জমল। এঁদের মানসিকতা ছিল অনেকটা মীরার মতন। এঁদের সঙ্গী হিসেবে পেয়ে মীরা অনেকটা মানসিক শান্তি পেলেন। মীরার উপরও বেসিক এডুকেশন-এর কিছু দায়িত্ব বর্তাল। মীরা কিন্তু রাজী হতে চাইলেন না।

মে মাস। গান্ধীকে জরুরি কাজে যেতে হলো দিল্লী। মীরা রইলেন সেবাগ্রামে। তবে তাঁর মনমরা ভাবটা কিছুটা কমেছে। এমন সময় হঠাৎ খবর এলো দিদি রোহনা হৃদরোগে আক্রান্ত হযে ইহলোক থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছে। মীরার মাথায় যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হলো। রোহনাব হৃদবোগের কথা মীরার চিন্তার আগোচরে ছিল।

মীরা ভগবানে বিশ্বাসিনী। গীতার তত্ত্বে তাঁর গভীর বিশ্বাস। তাই গভীর শোকে মুহ্যমান হলেও মীরা ভগবানের শ্রীচরণে সব সুখ দুঃখ সঁপে দিয়ে নিজে শান্তি পেতে চাইলেন। বেশ কিছুদিন মীরা রোহনার স্মৃতি ভুলতে পারেননি। সময় ধীরে ধীরে মীরাকে গভীর শোকের হাত থেকে মুক্ত করল। মীরা এখন মুক্ত মানসিকতায় নিজেকে মহীয়সী করে তুলতে আগ্রহী।

সেবাগ্রামে একদিকে চলছে বেসিক এডুকেশনের উপর গবেষণা, আর একদিকে কুটির শিল্পের উপর। গান্ধী ভারতের প্রতিটি গ্রামে গ্রামে বেসিক এডুকেশন ও কুটির শিল্পের চিন্তাধারা ছড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। সঙ্গে তিনি চান এর বাস্তবরূপায়ণ।

গান্ধীর এ চিন্তাধারা অনেক তাবড় কংগ্রেস নেতা মেনে নিতে নারাজ। কংগ্রেসের মধ্যে শুরু হল অন্তর্দ্বন্দ্ব। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে সবরমতি আশ্রম গান্ধী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মূলত সত্যাগ্রহী তৈরি করতে এবং সত্যাগ্রহ পরিচালনা করার জন্য। চম্পারণ ও খেদার সত্যাগ্রহ পরিচালনা করার জন্য সবরমতির রয়েছে কৃতিত্ব। এর মধ্যে দিয়েই গান্ধী'চেয়েছিলেন রাজনীতির উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত হতে। চেয়েছিলেন কংগ্রেস রাজনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটাতে।

১৯২০ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস রাজনীতি ছিল তিলক ও অ্যানিবেশান্তের হাতে। যার মূলগত পরিবর্তন তিনি চেয়েছিলেন। তিলক যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন তাঁর অসুবিধে হচ্ছিল। ১৯২০ সালেই তিলকের ঘটল তিরোধান। গান্ধী সুযোগ পেলেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতার আসনে অধিষ্ঠিত হবার।

অ্যানিবেশান্তের হোমরুল লীগের ছত্রছায়ায় গান্ধীর কংগ্রেস রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ। তারপর অহিংস, অসহযোগ, আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি দেশ বাসীর মন করলেন জয়। লবন সত্যাগ্রহ প্রমাণ করল গান্ধী ভারতের জনগণের এক নম্বর নেতা।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মীরা বেন গান্ধীর আকর্ষণে

ভারতে আসেন। আশ্রয় নেন সবরমতি আশ্রমে। সবরমতি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১৫ সালে। দশবছর পর এই আশ্রমে মীরার আগমন ঘটে। মীরা হয়ে ওঠেন সবরমতি আশ্রমের প্রাণপুরুষ। অনেকেই তাই মীরাকে সহ্য করতে পারত না।

ক্রমে ক্রমে আশ্রমিকরা পরস্পরের মধ্যে কলহ, বিবাদ ও ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের নানান রকম মানসিক বিকৃতি অহরহ গান্ধীর কানে আসতে থাকে। মীরা আশ্রমিকদের এরকম মানসিক বিকৃতি দেখে হতাশায় ভুগতেন। বাপুকে এ সমস্ত খবরাখবর পরিবেশণ করতেন। শেষ পর্যন্ত বাপু তিক্ত-বিরক্ত হয়ে সবরমতি আশ্রম বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। মীরার সঙ্গে এই ব্যাপারে তিনি গভীর আলোচনা করলেন। ভারতসরকারের হোমসেক্রেটারীকে সবরমতি আশ্রম বন্ধ করে দেবার জন্য সুপারিশ করলেন।

এরপর গান্ধী গ্রহন করেন সেবাগ্রামের পরিকল্পনা। সেবাগ্রামে তিনি ছোট কুটির তৈরি করে বাস করতে চেয়েছিলেন. সেখানে বিরাটাকারে কোন অশ্রম তৈরি করতে তিনি চাননি। সবরমতির তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে এরকম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু তাহলে কি হবে? ধীরে ধীরে সেবাগ্রাম হয়ে উঠল যেন ভারতসরকারের নতুন রাজধানী। কুমারাপ্পা যথার্থই বলেছেন, "The defacto capital of India".

তবে সেবাগ্রাম মীরাবেনেরই হাতে গড়া। ১৯৩৪ সালে গান্ধীজি কংগ্রেস ছাড়েন। কংগ্রেসের অন্যান্য নেতার সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটতে থাকে। এরপর থেকেই তিনি সেবাগ্রামে গ্রামসংগঠনের কাজে হাত দেন। সবরমতির আন্দোলনপর্ব হল শেষ। আরম্ভ হলো সেবাগ্রামে পল্লীজীবনে তাঁর গঠনমূলক কাজকর্ম। গান্ধীজি তাঁর Constructive Programme পুস্তিকায় লিখলেন যে স্বরাজের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন সংগঠনমূলক কাজ।

তবে ইংরেজ সরকার গান্ধীজির সেবাগ্রামে গ্রাম সংগঠনের কাজের মধ্যে গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সন্ধান পান। সরকার ভিত। সরকার ভাবল গান্ধীজি এবার গ্রামের লোককে সংগঠিত করে ব্রিটিশের সঙ্গে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

যাই হোক ১৯৩৩ সালে গান্ধীজি হরিজনদের মধ্যে কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তৈরি করেন হরিজন সেবক সঙ্ঘ। সারা ভারত তিনি পরিভ্রমণ করেন। উদ্দেশ্য একটাই অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলন চালানো। পরিশেষে বেছে নেন সেবাগ্রামকে। আদর্শ মডেল হিসেবে। হরিজনদের জন্য কাজ করার ব্যাপারে সেবাগ্রাম ছিল তাঁর গবেষণাগার।

হরিজন সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে গান্ধী সব চেয়ে বেশি সমালোচিত হন। একদিকে হরিজনদের প্রতিভূ ডঃ আহম্মদকর ছিলেন গান্ধীমতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী. অপর দিকে বর্ণহিন্দুরা তাঁকে সমর্থন জানায়নি। বর্ণাশ্রমকে সমর্থন করতে গিয়ে তিনি হরিজনদের দ্বারা কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছেন। আবার বর্ণাশ্রমের নতুন বিশ্লেষণ বর্ণহিন্দুদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

সেবাগ্রাম ছিল মহারাষ্ট্রের ছোট একটি গ্রাম। জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৬৩৯। গ্রামের মোট জমির পরিমাণ ছিল ১৫৫০ একর। লোক সংখ্যার অধিকাংশই ছিল মাহার, মাং, চামার আর ভাঙ্গি। এদের মধ্যে মাহার আর মাংরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

বর্ণহিন্দুদের মধ্যে কুনবিরাই ছিল প্রধান। ব্রাহ্মণ ছিল মাত্র এক ঘর। গ্রামবাসীদের নিয়ে যমনলাল বাজাজ এক সভার আহ্বান করেন। মীরা ও গান্ধীজি ছিলেন এই সভার মূল

আকর্ষণ। গান্ধীজি সভায় পৌরোহিত্য করেন। সেবাগ্রাম প্রকল্পের আসল উদ্দেশ্যের কথা গান্ধীজি বুঝিয়ে বলেন উপস্থিত গ্রামবাসীদের গ্রাম উন্নয়নের ব্যপারে তাঁর সংকল্পের কথা তিনি ঘোষণাকরেন।

জোর দেন অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের উপর। কিন্তু গ্রামে মোড়ল বর্ণহিন্দু। কুনাবির সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি নিজেই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ব্যপারে ঘোর প্রতিবাদ তুলেন। মোড়লদের মারাঠী ভাষায় বলা হয় পাটিল। মোড়লের বক্তব্য পল্লীউন্নয়নের ব্যাপারে তিনি সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু গান্ধীজির হরিজন মুক্তি আন্দোলনে তিনি বিশ্বাসী নন। তিনি গান্ধীমতবাদে বিশ্বাসী নন।

সেবাগ্রামেই হরিজনরা ভীষণভাবে নিগৃহীত হয়েছে। তাদের মন্দিরে যাবার অধিকার ছিল না। সর্বসাধারনের রাস্তা তারা ব্যবহার করতে পারত না।

গান্ধীজি একজন হরিজন-সন্তানকে পোষ্য নেন। কিন্তু গ্রামের নাপিত তার চুল কাটতে আপত্তি জানাল। রান্নাঘরে কয়েকজন হরিজন বালককে তিনি কাজে নিয়োগ করেন। কিন্তু বর্ণহিন্দুরা তাঁর এই কাজকে মেনে নিতে পারল না। গান্ধীজি স্পষ্টত বুঝতে পারলেন মানুষের নৈতিকতাবোধ এক জটিল অভ্যাসের গ্রন্থি দিয়ে তৈরি। সামাজিক নৈতিকতা এখানে তুচ্ছ ব্যাপার। সংস্কারের পরিবর্তন সহজ সাধ্য নয়। বর্ণহিন্দুরা গান্ধীজির কাজকে আমল দেয়নি। হরিজনরাও তাদের সামাজিক কাজের পরিবর্তনকে স্বাগত জানাতে পারেনি। "গান্ধীজির হরিজনদের জন্য সহানুভূতি, প্রতিদিন গ্রামের গলির আবর্জনা পরিষ্কার, হরিজন বালককে নিজেদের পুত্র বলে গ্রহণ করা, আশ্রমের রসুই ঘরে হরিজন ও অন্যান্য বালকের মধ্যে কোনো পার্থক্য না রাখা, তাদের শিক্ষার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা-এতদসত্বেও গান্ধীজি এদের কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পারেননি। এই দৈন্য ছিল মূলত গ্রামের মানুষের। সেবাগ্রামের মানুষ, বর্নহিন্দু ও হরিজন গান্ধীজির ব্যক্তিত্বের দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিল তার সঠিক মূল্যায়ন এখনো হয়নি।"

গান্ধীজি অবশ্য এর জন্য হাজার বছরের সামাজিক অন্যায়কে দায়ী করেছেন। তিনি দেখেছেন বাইরে থেকে গ্রামবাসীদের মনের পরিবর্তন আনা যায় না। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে গান্ধীজির সমাজ সংস্কারের চেষ্টা গান্ধীজির অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় একটা নাড়া দিয়েছিল। যার জন্য পরবর্তী কালে কিছুটা পরিবর্তনের আলো ধীরে ধীরে আসতে থাকে।

গ্রামসংগঠনের ভূমিকায় গান্ধীজির অবদানকে ছোট করা যায় না. তিনিই প্রথম সমাজবিজ্ঞানী যিনি গ্রাম উন্নয়নে বিভিন্ন বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তাধারার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত একটি সম্পূর্ণ উন্নয়নের কথা বলে গেছেন।

গান্ধীজির "Inter disciplinary approach for intergated development"-এর আগে কেউ ভেবেছেন কিনা এবং ফলিতরূপ দেখার চেষ্টা করেছেন কিনা সন্দেহ। সঠিকভাবে প্রাণিধানের চেষ্টা করলে দেখা যাবে যে, যে কোনো সমস্যার কথা ভাবা যাক না কেন সেই সমস্যা সামাজিক অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কেন না একটা সমস্যাকে আর একটা সমস্যা থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। গান্ধীজি যথার্থই বলেছেন যে সমাজপরিবর্তন কেবলমাত্র অর্থনৈতিক পরিবর্তন দ্বারা সম্ভব নয়। সত্যি বলতে কি তিরিশের

দশকে গান্ধীজি সমাজ বিবর্তনের ব্যাপারে যে বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন তার তুলনা মেলা ভার।

গান্ধীজি স্পষ্টত বুঝতে পেরেছিলেন যে, গ্রামসংগঠনের পরিকল্পনা জনগণ গ্রহণ করতে অপারগ। ক্ষোভে দুঃখে ১৯৪৪ সালে সেবাগ্রামকে মডেল হিসেবে গড়ার চিন্তা তিনি পরিত্যাগ করেন। মীরাবেন গান্ধীজির হতাশার কথা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। গান্ধীজি মীরাবেনকে কিছু খুলে বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি।

সেবাগ্রামে মডেলের মধ্যে দিয়ে গান্ধীজি প্রত্যেক মানুষের মঙ্গল কামনা করেছিলেন। তাই তিনি কোন বড় প্রতিষ্ঠানকে মনে স্থান দেননি। বৃহৎ শিল্প স্থাপনের কথা তিনি চিন্তা করতে পারেননি। ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতি ঘটিয়ে প্রত্যেক মানুষ আপন সৃজনশীল প্রতিভার উম্মোচন ঘটাক এ ছিল তাঁর একমাত্র ভাবনা। কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর চিন্তাধারা কংগ্রেস নেতাদের মনে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি।

সুভাষ হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি। নেহরু ও সুভাষ এবং কংগ্রেসের অনেক নেতা বুঝতে পারলেন ভারি শিল্প স্থাপন ব্যতিরেকে দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি অসম্ভব। ন্যাশানেল প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হয়েছে। গান্ধীর সঙ্গে ভারতে ভারি শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে নেহরু সুভাষের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠেছে। গান্ধী ক্ষুব্ধ। নেহরু তাঁর বশংবদ হলেও এ ব্যাপারে নেহরুর সঙ্গে গান্ধীর মতপার্থক্য বিরাজমান। নেহরু প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান। নানান দিক থেকে সুভাষের সঙ্গে গান্ধীর মানসিক সংঘাত জোর কদমে চলতে লাগল। গান্ধীর কথাতে কর্ণপাত না করে সুভাষ ত্রিপুরি কংগ্রেস-এর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসেবে গান্ধী মনোনীত প্রতিনিধি পট্টভি সীতারামাইয়ার সঙ্গে ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। এবং তিনি জিতলেন। গান্ধীর মনে দারুণ আঘাত লাগলো।

ছলে বলে কৌশলে সুভাষকে আক্রমণ করলেন গান্ধী। গান্ধী চক্রান্তে সুভাষকে কংগ্রেস ছাড়তে হলো। সুভাষ কংগ্রেসের বামপন্থী সদস্যদের নিয়ে গঠন করলেন 'ফরওয়ার্ড ব্লক। শেষ পর্যন্ত নানা চিন্তাভাবনা করে পাড়ি দিলেন বিদেশে। বিদেশীদের সহায্য ও সহযোগিতায় ভারতকে ব্রিটিশের হাত থেকে মুক্ত করবেন এছিল তাঁর ইচ্ছে।

১৯৩৯ সাল। হিটলার বীর বিক্রমে দাপিয়ে চলেছেন। সমগ্রবিশ্ব সন্ত্রস্ত। যুদ্ধ আসন্ন এ ভয়ে ইয়োরোপ কম্পিত। বিশ্বের অনেক তাবড় তাবড় নেতা গান্ধীকে অনুরোধ করলেন গান্ধী যেন হিটলারকে সংযত করার চেষ্টা করেন। হিটলার গান্ধীর কথাই কর্ণপাত করবেন এটা বিশ্বাসের অযোগ্য। গান্ধী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় শঙ্কিত। আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডমস্' গ্রন্থে লিখেছেন যে গান্ধী এ সময় তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করেছিলেন। আসন্ন যুদ্ধের বীভৎসরূপ কল্পনা করে তাঁর হৃদয়-মন শিহরিত হয়ে উঠেছিল। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর অহিংসা নীত্তি বিফলতায় পর্যবসিত হতে চলেছে।

মীরাকে গান্ধী তাঁর মনের কথা খুলে বললেন। মীরা শত হলেও ইংলন্ডের মেয়ে। মীরা গান্ধীর বার্তা নিয়ে ইংলন্ডে যেতে মনস্থির করলেন, গান্ধীর তাতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু সেই সময় ঘটে গেল এক বিচিত্র ঘটনা।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে রয়েছেন গান্ধীর একান্ত অনুরক্ত ভক্ত সীমান্ত গান্ধী। বাদশা খান। তিনি গান্ধীকে একখানা চিঠি দিলেন। তিনি চিঠিতে লিখলেন গান্ধীর একজন

অতি বিশ্বস্ত এবং গান্ধীমতবাদে অভিজ্ঞ একজন বিদগ্ধ জনকে যেন তাঁর কাছে পাঠান। গান্ধী কাকে পাঠবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত নানান চিন্তাভাবনা করে তিনি কথাটা মীরাকে জানালেন। মীরা খানিক চুপ করে থাকলেন। শেষে অনন্যোপায় হয়ে বাপুকে বললেন-অন্যকাউকেও পাওয়া না গেলে তিনি নিজেই বাদশাখানের কাছে যাবেন। গান্ধী পুলকিত। তিনি মীরাকে আর্শীর্বাদ করলেন। এবং বাদশাখানের সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দিলেন।

নভেম্বর মাস। পেশোয়ার শীতের দাপটে কাঁপছে। সেই সময় বাদশা খানের দাদা খান সাহেব উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী। মীরা গান্ধীর নির্দেশে চললেন পেশোয়ার। পেশোয়ারে মীরা উঠলেন খান সাহেবের বাডিতে। খান সাহেবের বাড়িতে মীরার আতিথেয়তার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না।

কয়েকদিনের মধ্যে মীরা চলে গেলেন বাদশাখানের গ্রামের বাড়িতে। বাদশাখানের দেশের বাড়ি উত্‌মনজাই নামক জায়গাতে। অসম্ভব ঠান্ডা সেখানে। মীরার যাতে ঠান্ডায় কোন অসুবিধে না হয় বাদশাখান সেভাবে সব ব্যবস্থা করলেন।

মীরা জানতে পারলেন বাদশাখান-এর লালকুর্ত্তা দলের সদস্যরা গান্ধীবাদ বা গান্ধীনীতি সম্পর্কে কিছু জানতে চান। সমাজ সেবা মূলক কাজের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে অনেকেরই জানার আগ্রহ। লালকুর্তা দলের সদস্যরা মীরা সমীপে আসতে লাগল। তারা মীরাকে তাদের মনের কথা জানাল।

মীরা প্রথমে বেশ সঙ্কোচবোধ করছিলেন। গান্ধীনীতি বা গান্ধীবাদ সম্পর্কে তিনি কতটুকুই বা জানেন। গান্ধীদর্শন বা গান্ধীমতবাদ সম্পর্কে কিভাবে তিনি তাদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন। লালকুর্ত্তা দলের সদস্যরা গান্ধী এবং বাদশাখানকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। তাই মীরার কাছ থেকে তারা কিছু জানতে চায় গান্ধী সম্পর্কে। মীরা তাঁর সাধ্যমত গান্ধী সম্পর্কে তাদের কাছে বললেন। তাতেই লালকুর্ত্তাদলের সদস্যদের মনে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল।

বাদশাখান মীরাকে একাকিনী ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। এমনকি কিছু কেনাকাটার জন্যও তিনি একাকিনী মীরাকে ঘরের বাইরে যেতে বারণ করলেন। মীরা ঘরকুনো হয়ে দু'একদিন কাটালেন। কিন্তু বেশিদিনতো এভাবে থাকা যায় না। মীরা প্রকৃতি প্রেমে মাতোয়ারা। প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করা থেকে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করতে চান না। বা পারেন না।

মীরা তাই একদিন একাকিনী কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লেন। রাস্তাঘাটে পেলেন প্রভূত সমাদর। মীরা বলেছেন সেখানকার অধিবাসীরা অত্যন্ত অতিথিবৎসল ও সেবা পরায়ণ। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় তাঁরা মীরাকে জানান তাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

পাঠানরা বাদশাখানকে পয়গম্বরের ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করে। মীরা রাস্তায় বের হতেন একাকিনী। তবে ভয়ের কারণ ছিল না বলা যায় না।

বাদশাখান ছিলেন বিশাল লম্বা। অপূর্ব ছিল তাঁর দেহের গঠন। চলার সময় হাতে তার কিছুই থাকতো না। এমনকি একটা ছোট লাঠিও না।

একদিন বাদশাখান মীবাকে নিযে পাশেব একটা গ্রামেব দিকে বওনা দিলেন। সেই গ্রামে থাকতেন বাদশাখানেব একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মীবা ও খানসাহেব চলেছেন টাঙ্গা কবে। টাঙ্গাটা ঘোড়াতে টানছে। টাঙ্গাটা খানসাহেবেব। বাস্তায যেতে যেতে খান সাহেব মীবাকে পাঠানদেব সম্পর্কে নানান বিচিত্র সব গল্প বলে যেতে লাগলেন।

টাঙ্গাটি যাচ্ছিল বিশাল শষ্যক্ষেত্রেব পাশ দিযে। বাদশা খান মীবাকে জাযগাটিব দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ কবে বলছিলেন যে এগুলি কতকগুলি পাঠানেব পাবিবাবিক সম্পত্তি এ সমস্ত জাযগা জমি নিযে নিযমিত লেগে আছে পাবিবাবিক গৃহবিবাদ। এ সমস্ত যাযগাজমিব ভাগবাঁটোযাবা নিযে নিজেদেব মধ্যে লেগে আছে খুনোখুনি, বক্তাবক্তি। এ যেন এখানকাব দৈনন্দিন ঘটনা। এবা এই খুনোখুনিকে ভীতিব চোখে দেখে না। মনে কবে পবস্পবেব দাবী আদাযেব এবং প্রতিহিংসা চবিতার্থ কবাব অন্যতম পন্থা এই খুনোখুনি। এতে তাবা adventure এব গন্ধ পায।

বিচিত্র মানব মনেব বিচিত্র গতি। সংযম্ ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা যেন তাদেব হৃদয থেকে বিলুপ্ত। বাদশা খান আবও বললেন যে এদেব মধ্যে তিনি সুস্থ মানবিকতাবোধ এবং আধ্যাত্মিক বোধ জাগ্রত কবাব আপ্রাণ চেষ্টা কবে যাচ্ছেন। এতে যে কিছুটা সুফল পাওযা যাযনি তা নয, তবে প্রযোজনেব তুলনায সামান্য। মীবাকে নিযে খান সাহেব এসে উপস্থিত এবকম একটি গ্রামে। বাদশহা খানেব বন্ধুব বাডিতে গিযে তাঁবা বসলেন। বাদশাখান মীবাব পবিচয দিলেন। মীবাকে দেখে সেই পবিবাবেব তথা গ্রামেব লোকজন মোহিত, মুগ্ধ। চপলমতি ছোট ছেলে-মেযেবা মীবাকে দেখাব জন্য ছুটে আসতে লাগল। তাবা কথা বলে পুস্ত ভাষায। অন্য ভাষায তাদেব কোন জ্ঞান নেই। মীবা মেযেদেব সঙ্গে হাতমুখ ও চোখ নেড়ে কথা বলেন। বাদশাখান-এব বন্ধুটি ছিলেন জাতিতে কৃষক। খুবই সমৃদ্ধ। বিশাল তাঁব শস্যক্ষেত্র। বিশাল তাঁব গোলাবাডি।

স্ত্রীলোকেবা মীবাকে নিযে গেল সব্জি বাগানে। মাংস ছাড়া সব্জি কিভাবে বান্না কবে খেতে হয তা বুঝিযে বলল পুস্ত ভাষায। মীবা কতখানি বুঝলেন তা ভগবান জানেন। শুধু হাত মুখ নেড়ে তাদেব কথাতে সায দিলেন। আব পবস্পবেব মধ্যে কথোপোকথনেব সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে লাগল হাসিব ফোযাবা।

দিন গডিযে বাত এলো। সব্জি বাগান থেকে ঘবে এলেন সকলেই। এবপব মীবাকে তাঁব বাতেব শোযাব ঘবে নিযে যাওযা হল। ঘবেব উপবতলায তাঁব শোযাব ব্যবস্থা কবা হযেছে। অনেকটা নিবাপদ স্থান। বেশ উঁচু জায়গা। মীবা কিছুক্ষণ সেখানে বিশ্রাম কবলেন। তাবপব বাত ন'টায মীবাকে ডাকা হল খাবাব জন্য।

মীবা সিঁডি বেযে নিচে লামলেন। মীবাব খাবাব ব্যবস্থা হল একটি নির্দিষ্ট স্থানে। সকলেব কাছ থেকে একটু তফাতে। পাঠানবা পুরুষ মেয়ে একসঙ্গে বসে আহাব কবে না। মেযেবা পুরুষদেব সঙ্গে খেতে পাবে না। এটা তাদের নীতি বিরুদ্ধ।

মীবা খেতে খেতে কিছুটা গল্পগুজব কবলেন। খাবার সময় দাঁড়িয়েছিল পবিবারের দু'তিনজন মহিলা। মীরা খেতে খেতে দেখতে পেলেন যে, প্রতি ঘরে ঘরে রয়েছে আগ্নেযাস্ত্র। মীরা ভীতি বিহ্বল নয়নে তা দেখলো কিন্তু কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। স্থির করে রাখলেন পরে বাদশাখানকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন।

মীরাকে রাতে যে ঘরে শুতে দেওয়া হয়েছিল-সেই ঘরটি ছিল অতীব চমৎকার সাজানো গোছানো। কিন্তু মীরা শুয়ে শুয়ে কি যেন ভাবছিলেন। আর অনুভব করছিলেন তাঁর পিঠে শক্ত কোন বস্তু ঠেকছে। মীরা পরিবারের একজন মহিলাকে আকারে ইঙ্গেতে তা বললেন। মহিলাটি তার স্বামীকে নিয়ে এলেন মীরার শোয়ার ঘরে। মীরাকে একটু উঠতে বললেন বিছানা থেকে। মীরা উঠলেন।

মহিলার স্বামী বিছানার তোষকের নীচ থেকে বের করলেন একটি রাইফেল। তা নিয়ে এসে অন্যত্র রেখে দেওয়া হল। মীরা কিছুটা স্বস্তিবোধ করলেন।

পরের দিন মীরা যাচ্ছে উতমনজাইতে। সঙ্গে বাদশাখান। যেতে যেতে বাদশাখান বললেন যে একজন পাঠানের সঙ্গে তাঁর প্রচন্ড মতোবিরোধ আছে। সেই পাঠানটি সুযোগ পেলে তাঁকে খুন করবে। সে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে লুকিয়ে আছে। সে আছে সুযোগসন্ধানে। বাদশাখান তাই সবসময় সন্ত্রস্ত হয়ে থাকেন। তাঁর সঙ্গে থাকে দু'জন বডিগার্ড। বাদশাখান-এর পকেটে থাকে একটা রিভলবার।

উতমনজাইতে পৌঁছে বাদশাখান পেলেন এক ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ। তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এক আততায়ীর গুলির আঘাতে সবে মারা গেছে। খবরটা বাদশাখানের হৃদয়ে কঠোর আঘাত করল। কিন্তু তাঁর ত করার কিছুই নেই। বাদশাখান মীরাকে বললেন গুলি খরচ করতে হয় না তাদের। একটা গুলিতেই তারা তাদের ইপ্সিত বস্তুকে খতম করে দিতে সিদ্ধহস্ত।

জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাস অত্যন্ত গরমের সময়। সেখানে বসে চরকায় সুতো কাটা অসম্ভব ব্যাপার। মীরা তাই চলে এলেন পেশোয়ারে। বাদশাখানের ভাইয়ের বাড়িতে। প্রাইম মিনিষ্টারের বাড়িতে।

ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহ। মীরা খবর পেলেন বাপু চলেছেন রাজকোটে। সেখানে শাসকবর্গের সঙ্গে সাধারণ লোকের চলছে মারাত্মক সংঘাত। গান্ধী রাজকোটে আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। ভাগ্যক্রমে গোলমাল গেল মিটে। বাপু ফিরে এলেন সেবাগ্রামে।

মে মাসে পেশোয়ার গ্রীষ্মের প্রবল তাপে দগ্ধ হয়। মীরার পক্ষে বেশিদিন সেখানে থাকা সম্ভব নয়। বাপু মীরাকে সেবাগ্রামে ফিরে আসতে চিঠিতে জানিয়ে দিলেন। আগষ্ট মাস, ওয়ার্ধায় চলছে কংগ্রেস অধিবেশন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকার সম্পর্কে কি মনোভাব গ্রহণ করবে এই ছিল আলোচনার প্রধান বিষয়। বাপু ভাইসরয় এর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সেগাঁওতে তখন বাপুর স্থায়ী আস্তানা। এসময়ে সেগাঁওর নাম পরিবর্তিত হয়ে সেবাগ্রাম হয়। এই ব্যাপারে এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

পঁচিশ

মীরা গান্ধীর নির্দেশে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে চলে গিয়েছিলেন বাদশাখানের কাছে। সেই সময় পৃথ্বিসিং নামক একজন পাঞ্জাবী চরমপন্থী আন্দোলনের নেতা নিয়মিত গান্ধীর কাছে আসতে আরম্ভ করেন। পৃথ্বিসিং এর গল্প মীরা শুনেছেন মহাদেব এর কাছে

বিস্তারিতভাবে। পৃথ্বিসিং বহুদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। শেষ পর্যন্ত গান্ধীর সান্নিধ্যে এসে গান্ধীনীতিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেন। গান্ধীর কাছে সব কিছু খুলে বলেন পৃথ্বিসিং।

গান্ধী পৃথ্বিসিংকে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করার পরামর্শ দেন। পৃথ্বি যথারীতি পুলিশের কাছে ধরা দেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করল। নিয়ে যাওয়া হল জেলে। গান্ধী পৃথ্বিসিংকে জেল থেকে ছেড়ে দেবার জন্য অনুরোধ করে চিঠি দিলেন। গান্ধীজির অনুরোধে কাজ হল। পৃথ্বি সিং ছাড়া পেল।

একদিন মীরা গান্ধীর ঘরে বসে কথা বলছিলেন। জরুরি কথা। হঠাৎ দরজায় করাঘাত হল। মীরা এসে দরজা খুললেন। দেখলেন একজন সুদর্শন পাঞ্জাবী এসেছেন গান্ধী সকাশে। মীরা তাঁকে চিনতে পারলেন না। কেন না এর আগে ত মীরা তাঁকে দেখেননি। গান্ধী কিন্তু তাঁকে চিনতে পারলেন। পৃথ্বিসিং গান্ধীর কাছে যে কৃতজ্ঞ তা বুঝিয়ে দিলেন। গান্ধীর সান্নিধ্যে এসে পৃথ্বিসিং এর মানসিক অবস্থার বিরাট পরিবর্তন ঘটল। পৃথ্বিসিং আর চরমপন্থী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে আগ্রহী নন। তিনি এখন থেকে গান্ধী প্রদত্ত চরকার সুতো কটতে আগ্রহী। গান্ধীনীতিতে তিনি মনপ্রাণ সমর্পণ করতে চান।

পৃথ্বি সিং-এর অপূর্ব সুন্দর দৈহিক সম্পদ, অপূর্ব মুখশ্রী মীরার মনে দোলা দিল। মীরা তন্ময় দৃষ্টিতে পৃথ্বি সিং এর মুখপানে চেয়ে রইলেন। পৃথ্বি সিং তাঁর সংগ্রামী জীবনের বিস্তারিত কাহিনী লিখে গান্ধীকে পড়তে দিলেন। লেখাটা ছিল ইংরেজিতে। গান্ধীজি লেখাটা মীরাকে পড়তে বললেন। মীরা নিবিষ্টমনে লেখাটা পড়লেন। অসাধারণ তাঁর লেখনীশক্তি মীরাকে মুগ্ধ করল। পৃথ্বি সিংকে মীরা মনের গভীরে স্থান দিলেন। পৃথ্বিসিং-এর সান্নিধ্য পাবার জন্য মীরার দেহমন উদ্বেল হয়ে উঠল।

পরাশরমুনি যেমন মৎস্যগন্ধার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে খেয়াপারাপারের সময় তাঁর জৈবিক কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন এটাও যেন অনেকটা সেরকম। মীরা তাঁর এতদিনের সুপ্ত দৈহিক কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য অপরূপ বীর্যবান এক ব্যক্তিত্বের সন্ধান পেলেন পৃথ্বিসিং এর মধ্যে। পৃথ্বিসিংকে মীরা তাঁর স্বামীর আসনে বসাতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করলেন না।

পৃথ্বিসিং ছিলেন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী। ধরা পড়ে তাঁর বিচার হয়। বিচারে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেওয়া হয়। আন্দামান জেলে। কিন্তু ট্রেনে করে নিয়ে যাবার সময় তিনি ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে পড়ে পালিয়ে যান। সেই থেকে তিনি গুপ্ত আস্তানায় থাকতেন। এবং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। আর চরমপন্থী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেন।

শেষ পর্যন্ত চরমপন্থী আন্দোলনে তিনি বিশ্বাস রাখতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন স্বাধীনতার জন্য ঐ পথ সঠিক নয়। নানা ভাবনা চিন্তার পর তিনি গান্ধীর শরণাপন্ন হন। পরে গান্ধীর একান্ত আপনজন হয়ে উঠেন।

মীরা বাইরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ব্যস্ত ভীষণভাবে। পৃথ্বিসিং তাঁর মনে দোলা লাগিয়েছে। মীরার তখন মোটামুটি বয়স হয়েছে, বয়স তাঁর প্রায় পঁয়তাল্লিশ। তবুও দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজনে মীরা তাঁর একজন একান্ত আপনজন চান। বাস্তবকে তো আর অস্বীকার করা যায় না। বাপুকে মীরা তাঁর মনের কথা খুলে বললেন। বাপু স্পষ্ট বলে দিলেন মীরা পৃথ্বিসিংকে তাঁর কাজের সঙ্গী হিসেবে নিতে পারেন তাতে তাঁর সম্পূর্ণ মত আছে। তবে পৃথ্বিসিং যেন মীরাকে বিয়ে করেন।

মীরা বলেছেন, "প্রথম প্রথম পৃথ্বিসিং তাঁর বেশির ভাগ সময় সেবাগ্রামেই কাটাতেন। আমি তাঁর মধ্যে অনেক সদ্‌গুনের পরিচয় পেলাম। আমি তাঁর মধ্যে আমার অন্তরাত্মাকে যেন খুঁজে পেলাম। তাঁর সরল এবং ভয়লেশহীন ব্যবহার আমাকে যারপরনাই বিস্মিত করল। আমি বুঝতে পারলাম পৃথ্বিসিংই একমাত্র লোক যাঁকে আমি সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়ে বাইরের কাজকর্মগুলি করতে পারি স্বাধীনভাবে। বাপু এতদিন আমার জন্য এরকম একজন লোকের সন্ধান করছিলেন। বাপুকে আমার মনের এই গোপন কথা বলার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম। শেষ পর্যন্ত সাহসে ভর করে আমি বাপুকে তাই বললাম। বাপু আমার দিকে অত্যন্ত কঠোর ভাবে তাকালেন এবং বললেন আমি যদি পৃথ্বিসিংকে এইভাবে চিন্তা করি তাহলে আমার উচিত পৃথ্বি সিংকে বিয়ে করা।"

মীরা বাপুর কাছ থেকে এরকম কথা আশা করেননি। তবে এটা যে তাঁর মনের কথা। বাপু যে ভগবানের মতন তাঁর অন্তরের কথাটা প্রকাশ করেছেন মীরা তার জন্য গভীর আনন্দ অনুভব করছেন। মীরা বাপুর অকপট এবং সত্য ভাষণের জন্য যারপরনাই আনন্দিত। মীরা এতদিন পর পেয়েছেন তাঁর মনের মানুষ। যাঁকে স্বামীত্বে বরণ করতে তাঁর বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

গান্ধী রক্তমাংসের মানুষ। দৈহিক সুখভোগকে তিনি অবহেলা করতে পারেন না। বা পারেন না অস্বীকার করতে। নিজের পিতার মৃত্যু মুহূর্তে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। তিনি সেই সময় কস্তুরাবার সঙ্গে দৈহিক সুখভোগে প্রচন্ডভাবে ব্যস্ত ছিলেন। সত্যের পুজারী গান্ধী-এই সত্য কথাটি তাঁর বইতে অকপটে স্বীকাব করেছেন।

বাপু মীরার মনের অবস্থা বুঝলেন। পৃথ্বিসিংকে মীরার মনের কথাটি জ্ঞাপন করলেন। বাপু দ্বিধাহীন চিত্তে পৃথ্বিসিংকে বললেন তিনি যেন মীরাকে বিয়ে করে সুখের সংসার বাঁধেন। দু'জনে মিলে সমাজসেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পৃথ্বিসিং গান্ধীরকথা অবনত মস্তকে শ্রবণ করলেন। কিন্তু মীরাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করে বৈধ স্বীকৃতি দিতে অনীহা প্রকাশ করলেন। পৃথ্বিসিং বাপুকে স্পষ্টতই বলে দিলেন তিনি মীরাকে গার্ল-ফ্রেন্ড হিসেবে পেতে চান।

গান্ধীজি দেখলেন দু'জন দু'জনকেই ভালবেসেছেন। তবে পৃথ্বিসিংকে তিনি বিয়ের প্রস্তাবে রাজি করাতে পারলেন না। অগত্যা পৃথ্বিসিং-এর কথাতে গান্ধী নিমরাজি হয়ে গেলেন। পৃথ্বিসিং মীরাকে নিয়ে চললেন হরিয়ানাতে। তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধুটির নাম পন্ডিত জগতরাম ভরদ্বাজ। পৃথ্বিসিং ও জগতরাম দুজনই চরমপন্থী আন্দোলনের নেতা ছিলেন। দু'জনই একই সঙ্গে জেলে ছিলেন। ভরদ্বাজ একুশ বছর জেলে জীবনযাপন করেন। হরিয়ানার পাঞ্জাব হাউসে ছিলেন। এটা হোসিয়ারপুর জেলার সন্নিকটে অবস্থিত। ভরদ্বাজ অতীব সৎ এবং নিষ্ঠাবান বিপ্লবী ছিলেন। এখানে সপরিবারে ছিলেন তবে খুবই অসুস্থ অবস্থায়।

পৃথ্বিসিং মীরাকে নিয়ে ভরদ্বাজ-এর বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। ভরদ্বাজ পৃথ্বিসিংকে অনেকদিন পর দেখলেন। দু'বছর পর দু'বন্ধুর মিলন দৃশ্য বড়ই করুণ। দু'জন দুজনের দিকে তাকাচ্ছেন বিস্ফারিত নয়নে। চোখে দু'জনেরই জল। পুরনো কত কথাই তাঁদের আজ মনে পড়ছে। এতদিন পর দেখা। আনন্দের আতিশয্যে একজন আর একজনকে জড়িয়ে ধরলেন। পরস্পর পরস্পরের হাতে চুমু খেলেন।

পৃথ্বিসিং এর পাশে দাঁড়িয়ে মীরা আর ভরদ্বাজ-এর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর স্ত্রী, দু'জনই এই দৃশ্য বিহ্বল নয়নে উপভোগ করতে লাগলেন। প্রেমপ্রীতি ভালবাসা বিশ্বজনীন। এর স্বাভাবিক গতিরোধ করার ক্ষমতা বিশ্বের কারুরই নেই। প্রেমের বন্ধনে বাধা পড়েছেন ভরদ্বাজ আর পৃথ্বিসিং। মীরা যেন ভাবে তন্ময় হয়ে গেলেন। ভরদ্বাজ-এর সঙ্গে মীরা নানান ব্যাপারে আলোচনা করলেন। ভরদ্বাজ-এর স্ত্রীকে দেখে মনে হচ্ছিল নিষ্ঠাবতী নিছক ভালো মানুষ। মীরা তাঁদের সঙ্গ উপভোগ করলেন গভীরভাবে। আর চিরকালের জন্য বন্ধুত্বের নিগড়ে বাধা পড়লেন। পৃথ্বিসিং মীরাকে তাঁর গার্ল ফ্রেন্ড হিসেবে পেয়েছেন। গান্ধীর সম্মতি নিয়েই মীরা পৃথ্বিসিংকে তাঁর বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পৃথ্বিসিং বিয়ে করতে রাজি হলো না মীরাকে। না হলে মীরা ও পৃথ্বিসিং বিয়ে করে ভারতেই সুখে দিন কাটাতে পারত স্বামী-স্ত্রীরূপে। বিয়েটা হলো না অবশ্য পৃথ্বিসিং-এর অনিহার জন্য। তবে মীরার সঙ্গে যদি পৃথ্বিসিং এর দৈহিক মিলন ঘটে থাকে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

মীরা ও পৃথ্বিসিং ভরদ্বাজ-এর বাড়িতে কয়েকদিন আনন্দেই কাটালেন। সেখান থেকে তাঁরা দু'জনে গেলেন শিবালিক পাহাড়ে। ওখানে রয়েছে একটা আশ্রম। পাহাড়ের গায়েই আশ্রমটি। আশ্রমের অধিবাসীরা বড়ই সরল। গ্রাম্যজীবনে অভ্যস্ত। কোলাহলময় শহর জীবনের পঙ্কিলতা তাদের স্পর্শ করতে পারেনি। আশ্রমবাসীদের সারল্য মীরাকে আকৃষ্ট করল। মীরা তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন।

আশ্রমবাসীরা আশ্রমের জন্য একটা বাড়ি তৈরির কাজে হাত দিয়েছে। কিন্তু বাড়ি তৈরির খরচ অনেক। অর্থের সংস্থান করা আশ্রমবাসীদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। মীরা তাদের অবস্থা অনুধাবন করলেন। তাদের অর্থনৈতিক আবস্থার কথা সম্যক উপলব্ধি করলেন। মীরা তাদের পরামর্শদিলেন শক্তমাটি দিয়ে যেন বাড়ির দেওয়াল তৈরি করা হয়। তাতে খরচ পড়বে কম। তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ি তৈরির কাজ করাচ্ছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাড়ি তৈরির কাজ সম্পন্ন হল। খরচ বেশি পড়ল না।

পৃথ্বিসিং ও মীরা স্থির করলেন কিছুদিন শিবালিক পর্বতের আশ্রমে কাটাবেন। মীরার খাঁটি দুধের প্রয়োজন। তাই পৃথ্বিসিংকে নিয়ে তিনি গ্রামের ভেতরে বাছুর সহ গাভির সন্ধানে ঢুকে পড়লেন। বাছুর সহ গাভির সন্ধানও পাওয়া গেল। গাভির মালিকের সঙ্গে তাঁদর কথাবার্তা হলো। মালিক মীরা ও পৃথ্বিসিংকে হুঁকো খেতে দিল।

পৃথ্বিসিং মনের সুখে হুঁকো টেনে চলেছেন আর মীরা ত বিস্মিত। মীরা লন্ডনে থাকাকালীন হয়ত কোন কোন সময় ধুমপানে আসক্তি বোধ করতেন। ভারতে এসে একদিনের জন্যও তিনি ধুমপান করেননি। গাভির মালিক বিস্মিত। গ্রাম্য রীতি অনুযায়ী কোন কিছু কেনা বেচা করার সময় আতিথেয়তার নিদর্শনস্বরূপ হুঁকো খেতে দেওয়া মালিকের কর্তব্য। এবং গ্রাহক অন্তত ভদ্রতার খাতিরে মালিকের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারে না। তবে মীরার মনে এক বিচিত্র অনুভূতি জাগল। পৃথ্বিসিং মীরাকে কি যেন বলতে চাইছিলেন। মীরা তাঁকে চুপ করে থাকতে বললেন। মীরা পৃথ্বিসিংকে গাভির মালিকের সারল্যে যে বিস্মিত তা বুঝিয়ে দিলেন।

মীরা সাতটাকা দিয়ে গাভিটি কিনে নিলেন বাছুর সহ। নিয়ে এলেন আশ্রমে। তখন শিবালিক পার্বত্য অঞ্চলে প্রচণ্ড গরম। রাতে লোকে ঘরে ঘুমোতে পারতো না। আশ্রমবাসীরা

বাইরে গাছতলায় ঘুমোত। মীরা-পৃথ্বিসিং সকলেরই রাতের শোয়ার জায়গা আশ্রমের বাইরে গাছতলায়। রাতে শোয়ার সময় মীরা বাছুরসহ গাভিটিকে তাঁর কাছেই বেঁধে রাখতেন। খড়কুটো দিয়ে তাদের শোয়ার জায়গা করে দিতেন।

গাভিটি নিয়ে আসার পর এভাবে তাঁর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। হঠাৎ এক গভীর রাতে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। নিঝুম রাত। মীরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এক ভয়ঙ্কর চিৎকারে মীরার ঘুম গেল ভেঙ্গে। মীরাকে লক্ষ্য করে একটা লোক বিকট চিৎকার শুরু করল। সে বলতে লাগল গাভিটি তার। মীরা সেটা চুরি করে এনেছে। মীরাত ভয়ে কাঁপছেন। কি করবেন বুঝতে পারছেন না। আশ্রমবাসীরা ছুটে এলো। তারা বুঝতে পারল লোকটা বদ্ধ পাগল। পাগলটাকে তারা দু' একটা ধাক্কা দিল। কিন্তু সে সরতে নারাজ। এমন সময় এক বিরাট দেহধারী ভদ্রলোক এসে হাজির তিনি ছিলেন জগতজীবনরামের বন্ধু। এবং লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার একজন আসামী। লোকটা এসে পাগলটাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে বলল। পাগলটি তাঁর রুদ্রমূর্ত্তি দেখে ভীত হয়ে সরে পড়ল। কথাই বলে মারকে পাগলেও ভয় পায়। পাগলটা চলে যাওয়াতে মীরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

শিবালিকের পার্বত্য অঞ্চলে বেশ কিছুদিন এভাবে কাটল মীরার। তবে গরমটা যেন দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল। মীরা তাই অন্যত্র চলে যাবার কথা চিন্তা করছিলেন। এর মধ্যে পৃথ্বিসিংও মীরার কাছ থেকে সরে যেতে চাইলেন। মীরা জোর করে কাউকেও কাছে টানতে চান না। তাই মীরাও নির্বিবাদে পৃথ্বিসিংকে তাঁর মনোবাসনা অনুযায়ী চলতে বলে দিলেন।

পৃথ্বিসিং তারপর কোথায় গেলেন তার কোন বিবরণ জানা যায়নি। মীরা একাকিনী। মীরা যেন আবার নিঃসঙ্গ। একাই তিনি চললেন কাঙ্গরা জেলার পালাম্পুরে, সেখানে লালাজি নামক এক ভদ্রলোকের রয়েছে বিরাট চা বাগান। বাগানের প্রাকৃতিক পরিবেশ অতি মনোরম।

লালাজি মীরাকে নিয়ে আশে পাশের অনেক গ্রামে গেলেন। এর আগে মীরা বাপুর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে হিমাচল প্রদেশে গেছেন। বিভিন্ন স্টেশনে থেকেছেন কয়েকদিন। কাজের প্রয়োজনে. তবে হিমাচল প্রদেশের গ্রামগুলিকে এবং সেখানকার পরিবেশকে ভালোভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ তখন তাঁর হয়নি। মীরা তাই লালাজির সঙ্গে মনের বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে ঘুরতে লাগলেন নানা গ্রামে।

লালাজি মীরার মানসিক অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করতে পারলেন। নিঃসঙ্গ একাকীত্বের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মীরা যে বেশ কিছুদিন কাঙ্গরা জেলায় লালাজির চা বাগানে কাটাতে চান লালাজি তা বুঝলেন। মীরা লালাজির টি এস্টেটের কাছে একাট জায়গা পছন্দ করলেন। লালাজিকে জানালেন সেখানে তিনি থাকতে চান। লালাজি কিন্তু মীরাকে সেখানে একাকী রাখতে একটু ইতস্তত করছিলেন। বিদেশিনী মীরা তদুপরি সঙ্গীবিহীন। বস্তুতপক্ষে জায়গাটা ধ্যানী যোগী সন্ন্যাসীদের পক্ষেই উপযুক্ত। মীরার মনের জোর অসামান্য, না হলে কিসের টানে পাগল হয়ে ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন। প্রায় সময় বাপুর সঙ্গে। অনেক সময় একাকিনী। সমাজসেবার তাগিদে।

মানুষের মন বিচিত্র খেয়ালে চলে। মনের গোপন গহ্বরে এক এক মানুষের এক এক রকম চিন্তা উঁকি ঝুঁকি মারে। মনে হয় তা তার জেনিটিক সূত্রে বা জন্মসূত্রে পাওয়া মানসিক

বিবর্তনের লক্ষণ। মীরার মধ্যে তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে গভীরভাবে। মামার বাড়ির প্রভাব, মার প্রভাব-শৈশবের মামার বাড়ির প্রাকৃতিক পরিবেশ মীরার মনের আনাচে কানাচে ঘোর পাক খাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। তাই ত মীরা এখনো প্রকৃতিপ্রেমে মাতোয়ারা।

লালাজি মীরার অনুরোধে তাঁর টি এস্টেটের সন্নিকটে ফাঁকা জায়গায় সুন্দর একটা কুটীর তৈরি করে দিলেন। লালাজির বাড়ি সেখান থেকে আধমাইল। পাশেই রয়েছে ক্ষুদ্র এক স্রোতস্বিনী। একদিকে হিমাচল প্রদেশের পাহাড়ের সৌন্দর্য অপরদিকে ছোট্ট স্রোতস্বিনী। কি অসাধারণ সুন্দর পরিবেশ।

লালজির তৈরি করা অপূর্ব কুটীর। মীরা যেন কুটীরে অধ্যয়নরতা সন্নাসিনী। বেদ, উপনিষদ, পুরান তাঁর সঙ্গী। ধ্যনস্থ হয়ে তিনি পড়াশুনায় আত্মমগ্না। বাইরের কোন চিন্তা তাঁর মনকে ক্ষণকালের জন্য হিল্লোলিত করতে পারে না। তিনি পড়াশুনার সময় কাউকেও তাঁর কুটিরে আসার সুযোগ দেন না। সকাল থেকে অবিরামগতিতে তিনি বারটা পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তারপর সামান্য দুপুরের খাওয়া সেরে ঘন্টাখানেক বিশ্রাম নেন। তারপর আবার তন্ময় হয়ে পড়াশুনায় ডুবে যান। বিকেল চারটায় লালাজি আসেন। ঘন্টাখানেক গল্পগুজব করেন। তারপর তিনি যান এদিক ওদিক ইতস্তত ভ্রমণে আধঘন্টার জন্য। ধূপধূনা দিয়ে সন্ন্যাসিনী মীরা ধ্যানস্ত হন। মনের দৃঢ়তা বাড়াবার এটাই ছিল তাঁর একমাত্র পথ। এরকম নিরিবিলি জীবন মীরার হৃদয়তন্ত্রীকে গভীরভাবে আলোড়িত করে তুলতে লাগল ক্রমশ। মীরা ভাবতে লাগলেন বাপুর নির্দেশ পেলে তিনি এখানেই তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাটিয়ে দেবেন।

কিন্তু তা যে হয় না। মীরা যখন গিয়েছিলেন তখন ছিল শীতের আমেজ। শীতটা কমে এলো। বসন্তের মিষ্টি পরিবেশও মীরার খুবভালো লাগল। ভয়লেশহীনা মীরা। হিমালয়ের বিচিত্র গিরীশৃঙ্গ তুষারশুভ্র দেহধারী বিশাল শৃঙ্গগুলিকে দেখে যে কোন মানুষের হৃদয়তন্ত্রী রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে। এসমস্ত দৃশ্য দেখতে দেখতে মীরার সময় কেটে যেতো। পড়াশোনা, ধ্যান আর প্রকৃতির লীলাখেলা-মীরার কাঁঙ্গরা জীবনের সঙ্গী।

তবে এখানকার বর্ষাটা ভয়ঙ্কর। লালাজি মীরাকে বললেন বর্ষাকালে মীরার পক্ষে এই কুটীরে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠবে। মীরা তা বুঝতে পারলেন। তাই মীরার মন আবার বাপুর কাছে ফিরে যাবার জন্য উতলা হয়ে উঠল। বাপুকে বিস্তারিত জানিয়ে মীরা চিঠি দিলেন। পৃথ্বি সিং-এর কথাও লিখলেন। মীরার সঙ্গীবিহীন জীবনের কথা তিনি সুললিত ভাষায় বাপুকে জানিয়ে দিলেন।

পৃথ্বিসিং মীরাকে গার্ল ফ্রেন্ড বা বান্ধবী হিসেবে না নিয়ে মীরাকে বিয়ে করলে মীরার জীবন অন্যধারায় প্রবাহিত হতো। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে মীরার সঙ্গে পৃথ্বি সিং-এর মনের আদান-প্রদান ঘটে। সেই বয়স থেকেই মীরা হয়ে যেতে পারতেন এক বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং অসাধারণ সুন্দর দেহধারী ও রূপবান ভারতীয়ের গৃহবধূ। ভগবানের অভিপ্রায় যে তা নয়। তাই বিশ্ববিধাতা পৃথ্বিসিংকে মীরার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। মীরা হয়ে গেলেন একাকিনী। মীরা হয়ত পৃথ্বি সিংকে লক্ষ্য করে কবিগুরুর কবিতাখানি আপনমনে পড়ে যাচ্ছেন -

"ভালবাসা তাও তুমি কেড়ে নেবে শেষে
কেন তবে নিয়ে এলে, একাকিনী ছেড়ে দিলে
বিশাল ভবের মাঝে বিবষণা বেশে।"

এর মধ্যে মীরা বাপুর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলেন। মীরাকে বাপু সেবাগ্রামে ফিরে যেতে লিখেছেন।

মীরা ফিরে এলেন সেবাগ্রামে। তখন ফেব্রুয়ারী মাস। প্রচণ্ড গরমে মীরার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। বাপু মীরার অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করতে পারছিলেন। সেবাগ্রামে এসে মীরা কথাবার্তা বলা একরকম বন্ধ করে দিলেন। সপ্তাহে দু দিন বাপুর কাছে যেতেন। তাঁর সঙ্গে ই মীরার কিছু কথাবার্তা হতো। অন্য কারও সঙ্গে বিনাপ্রয়োজনে একটি বাক্যও ব্যয় করতেন না। মীরা মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন।

বাপু মীরাকে চারওয়াড় নামক একটি জায়গায় গ্রীষ্মকালটা কাটাবার জন্য পরামর্শ দিলেন। আরব সাগরের তীরে অবস্থিত এই জায়গাটির আবহাওয়া অতীব মনোরম। জুনাগড় এস্টেটে অবস্থিত জায়গাটি। আম, জাম, কাঠাল, নারকেল, আনারস প্রভৃতি ফলের বাগান নিয়ে বিশাল জুনাগড় এস্টেট। মীরা বাপুর নির্দেশে চললেন চারয়াড়-এ।

মীরার জন্য বাগানের মাঝখানে একটা কুটির তৈরি করে দেওয়া হল। কুটিরটা মাটি দিয়ে তৈরি। মীরা সেখানে একাকিনী। কথাবার্তা বলার লোক বিশেষ নেই। তিনি অনেক সময় খুবই একাকীত্ব অনুভব করেন। সপ্তাহে দু'দিন স্নানের জন্য আরবসাগরে যান। এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। বাপুকে তিনি সব কিছু বিস্তারিত জানিয়ে চিঠি দেন। প্রকৃতি মানুষকে সৌন্দর্যের পুজারী করে তোলে। মানুষের মনে জাগায় শান্তির অভিপ্রায়। মীরার মন ভয়লেশহীন। নতুন কল্পনার রাজ্যে বিরাজমান। জাগতিক সুখ-দুঃখ যেন তাঁর মন থেকে অপসারিত। পৃথ্বীসিং এর সান্নিধ্য, তাঁর বন্ধুত্ব মীরাকে কিছুদিন আবিষ্ট করে রেখেছিল। এখন মীরা মুক্ত। সব বাধা-বন্ধনের এখন উর্দ্ধে। নানা চিন্তাতে সে এখন কাতর।

২২শে মে, ১৯৪১। জোরকদমে চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। লন্ডন হিটলারের বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত। সমগ্র বিশ্ব হিটলারের হুঙ্কারে থরহরি কম্পমান। মীরা বাপুর কাছ থেকে এক গূঢ় অর্থপূর্ণ চিঠি পেলেন। বাপু লিখেছেন, "An enquiry has come from London whether the report is true that you have severed all connection with me and are living away from me!!! How wish is father to thought!"

বাপু লিখেছেন লণ্ডন থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে মীরা কি বাপুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাপুর সান্নিধ্য থেকে অনেক দূরে গিয়ে একাকিনী জীবন যাপন করছেন। বাপুর এ চিঠির কোন উত্তর মীরা দেননি বা দেবার প্রয়োজনবোধ করেননি। হয়তো মীরার মনে খানিক ক্ষোভ, দুঃখ বা অভিমনের লেশ ছিল। যা মীরা প্রকাশ করতে নারাজ।

গান্ধীর নির্দেশ পেয়ে মীরা আবার ফিরে এলেন সেবাগ্রামে। তখন সেবাগ্রামেও শুরু হয়ে গেছে বর্ষা। সেবাগ্রামের প্রধান কুটির থেকে কিছুদূরে মীরার জন্য তৈরি করা হয়েছে একখানা কুটির। মীরা এখন থেকে সেই কুটিরেই থাকেন একাকিনী। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন। একাকিনী বসে বসে ঋকবেদ পড়েন। আর ঋকৃবেদের যে সমস্ত স্তোত্র তাঁর ভালো লাগে সেগুলোকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। সেই অনুবাদগুলো

বাপুর মন্তব্যের জন্য পাঠান। বাপু তার অনুবাদগুলিতে তাঁর মন্তব্য লিখে পাঠিয়ে দেন। মীরা সেগুলো যত্নসহকারে পড়েন এবং রেখে দেন যত্নকরে।

বর্ষারানীর দৌলতে নবরূপ ধারণ করেছে তাঁর কুটিরের পরিবেশ।

বর্ষার রাতে ব্যাঙ ডাকে। ব্যাঙ যেন তার ডাকের মধ্য দিয়ে সুর করে বর্ষারানীর বন্দনাগীতি গেয়ে চলেছে। সেই সুর মীরার কাছে নূতন। তাই মীরার মনেও লেগেছে নতুন সুরের দোলা। মীরা মদমত্ত হয়ে ব্যাঙের ডাকের সুরে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। গায়ে শাল মুড়ি দিয়ে নীরবে জানালা দিয়ে ঘন অন্ধকারে বিদ্যুতের ঝকমক আলোতে ব্যাঙের ডাক আর প্রকৃতির রূপকে নতুন করে আস্বাদন করে। এমন এক বর্ষাঘন রাতে মীরা কয়েকটি সোনা ব্যাঙ দেখে বিদ্যুতের ঝলকে। মীরা ব্যাঙগুলির দিকে তাকিয়ে থাকে বিহ্বল ও অপলক নয়নে। সোনা ব্যাঙগুলো তাঁর কুটিরের আশে পাশে ঘূরে বেড়াচ্ছে। আর আপন সুরে ডেকে যাচ্ছে। অন্ধকারে সোনা ব্যাঙের চোখদুটি যেন জ্বলজ্বল করছে। আর ঘন ঘন বিদ্যুতের আলোর ছটায় বেঙের সোনালি রঙ মীরার কাছে যেন মনে হচ্ছে সাপের মণি।

মীরা ভাবে তন্ময়। হয়ত ভাবছে। এ দৃশ্য যারা দেখেনি তাদের জন্ম বৃথা। মীরা যেন যোগিনী, বলা চলে ধ্যানমগ্না সন্ন্যাসিনী।

একদিন এক সোনা ব্যাঙ এসে হঠাৎ হাজির তাঁরই কুটিরে। মীরার মনে হল ব্যাঙটি এসেছে তাঁর কাছে আশ্রয়ের সন্ধানে। তাঁকে দেখে মীরা বিস্মিত। খুবই কাছ থেকে দেখা সোনা ব্যাঙের গায়ের রঙ যেন তাঁর মনে বিচিত্র এক অনুভূতির সৃষ্টি করল।

ব্যাঙটির দিকে মীরা তাকাল। তাঁকে দেখে ব্যাঙটি যেন তাঁকে বুঝিয়ে দিতে চাইল সে মীরার ঘরে আশ্রয়প্রার্থী। ব্যাঙটি মীরার ঘরের চৌকাঠ পার হল। মীরা তাঁকে তাড়ালেন না। বরং তার গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করতে লাগলেন নিবিষ্টমনে। মীরা দেখতে লাগলেন ব্যাঙটির জিভটি লক্‌লক্‌ করছে। আর ঘরের আনাচে কানাচে পোকা মাকড়গুলোকে একে একে জিভ দিয়ে টেনে নিচ্ছে. এবং ধীরে ধীরে তার উদরপূর্তি করছে।

মীরা বুঝতে পারলেন সোনা ব্যাঙটিকে ঘরে আশ্রয় দিলে তিনি পোকা মাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পাবেন। মশার উপদ্রবও কমবে তাঁর ঘরে। অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে তিনি ব্যাঙটিকে পোষার সিদ্ধান্ত নিলেন।

আকাশে মেঘ ডাকলে ব্যাঙটি অপরূপসুরে ডাকতে থাকে। মীরার গায়ে জাগে শিহরণ। বর্ষারানীর অপরূপ রূপের ছটায় মীরা আবিষ্ট হয়ে পড়েন। সোনা ব্যাঙটির উপর মীরার মায়া ক্রমে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে থাকে। ব্যাঙটি যেন তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু। বিভিন্ন মানুষের মনের সুপ্ত অনুভূতি ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুযায়ী। একই রক্তমাংসের কোন কোন মানুষের মন স্নেহ, দয়া, মায়া ও করুণার আধার রূপে প্রতিভাত হয় আবার কোন কোন মানুষের মন হিংসা, দ্বেষ, ও নিষ্ঠুরতার মূর্ত প্রতীকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সে মেতে উঠে খুনের নেশায়, পাশবিক অত্যাচারের নেশায়।

ভগবানের এই যে বিচিত্র সৃষ্টি রহস্য তার কারণ অনুধাবন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। সাধারণ মানুষ যুক্তি দিয়ে ভগবানের এই সৃষ্টি রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করতে পারে না বলেই সে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ভগবানের কাছেই করে কৃপা প্রার্থনা। ষোড়শ উপাচারে ভগবানকে পুজো দেয়। যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন্‌ তাঁরা এগুলোকে

কুসংস্কার বা মানব মনের বিকার বলে মনে করেন। সাধারণ মানুষকে বক্তৃতা বা তাঁদের বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে যুক্তি দিয়ে তাদের অন্ধকুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে অনুরোধ জানান। কিন্তু সাধারণ মানব মন কি তাঁদের এসব যুক্তি উপলব্ধি করতে পারে। তা যদি পারত তাহলে মন্দির-মসজিদ্-গীর্জা এনিয়ে মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, কাটাকাটি ও হানাহানির অবসান ঘটত। কার্লমার্কস তাঁর বাবাকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন স্বর্গের যত দেবদেবীর কথা মানুষ কল্পনা করে সকলকেই তিনি ঘৃণা করেন। তবে মার্কস ছিলেন মানব প্রেমিক। তাঁর তত্ত্ব নিস্পেষিত জনগণের মুক্তির সন্ধান দিয়েছে। সেই দিক থেকে চিন্তা করতে গেলে মার্কস ছিলেন সব চেয়ে বড় ঈশ্বরভক্ত। কেন না সব ধর্মের সার কথা হচ্ছে নিস্পেষিত, নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য কাজ করাই ভগবান লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।
কথাই বলে "ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
জীবেপ্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

এদিক থেকে চিন্তা করলে বলতে হয় মার্কস ছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভগবৎপ্রেমিক।

মীরাবেনও ভারতে এসেছেন জনগনের সেবার জন্য। তাই মীরার হৃদয় যে অপার দয়া, মায়া ও করুণ রসে সিক্ত হবে তাতে আশ্চর্য কি?

বাপু তাঁর সেবাগ্রামের আশ্রম থেকে নিয়মিত সান্ধ্যভ্রমণে বের হন। মীরার কুটিরে এসে কিছু সময় বিশ্রাম নেন। মীরা তাঁর পোষা ব্যাঙটিকে নিয়ে বাপুর দিকে তাকিয়ে থাকে। বাপুর বিস্ময়ের ঘোর কেটে যায়। বাপু যেন মনে মনে ভাবতে থাকেন মানুষ কুকুর, বেড়াল, গরু, ঘোড়া, হাতি এমনকি কেউ কেউ বাঘ বা সিংহ পোষেণ কিন্তু সোনা ব্যাঙ পোষা এই যেন এক বিচিত্র ব্যাপার। এটা যে তাঁর চিন্তার বাইরে। এই যেন এক বিরল দৃষ্টান্ত।

যাহোক-বাপু যখনই মীরার কুটিরে আসেন মীরা তখনই বাপুর কাছে ব্যাঙটি নিয়ে আসেন। তাকে নিয়ে আসেন বাপুর নির্দেশেই। কি অদ্ভুত এক পরিস্থিতি। এভাবেই মীরার দিন কাটতে থাকে আনন্দেই। মীরা রয়েছেন মৌনী অবস্থায়। কারুর সঙ্গে কোন কথাবার্তা নেই। কেবল বাপু এলে মিনিট কুড়ি দু'চারটা কথা বলেন। বাপু চলে গেলে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েন বেদ, উপনিষদ পাঠ নিয়ে। আর সময় সময় তাঁর ব্যাঙটিকে আদর করেন।

ব্যাঙটির ক্রমে বাচ্চা হলো। প্রথমে দু-তিনটা। তারপর ক্রমেই বেড়ে চলল বাচ্চার সংখ্যা। এভাবে প্রায় চল্লিশটি বাচ্চার জন্ম হল। মীরা বুঝতে পারলেন অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে ব্যাঙ পোষাটা ঠিক হয়নি। কিন্তু পোষা ব্যাঙটি করুণ চোখে যখন তাঁর দিকে তাকায় তখন তিনি মায়ার জালে জড়িয়ে পড়েন। তবে এতগুলো ব্যাঙকে এক সঙ্গে ঘরে রাখা অসহ্য হয়ে ওঠায় মীরা সেগুলিকে দূরে কোন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসার কথা চিন্তা করে রাখলেন। মীরা এবার যেন পাষাণ হৃদয় ধারণ করলেন। তাই তিনি ব্যাঙগুলি নিয়ে অনেক অনেক দূরে এক অজানা অচেনা জয়গায় বস্তা বন্দি করে রেখে এলেন। তাতে মীরার বুক ফেটে গেলেও মীরা এ ছাড়া অন্য কোন উপায় খুঁজে পেলেন না। বেঙের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা পেতেই হবে। নচেৎ তাঁর ঘরখানা ব্যাঙের আখড়ায় পরিণত হবে। ভাবলেন দূরে ব্যাঙগুলিকে রেখে এসে মীরা মুক্তি পেলেন।

ঘরে ফিরে এসে মীরা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ব্যাঙের উৎপাত থেকে পেলেন রেহাই। মীরা তাই ঘরে ধূপ ধুনা দিয়ে পূজো করতে বসেছেন। ধ্যানস্ত হয়ে কিছু সময়

কাটালেন। পুজো সেরে উঠে তিনি বেদ, উপনিষদ নিয়ে বসেছেন। জ্ঞান আহরন করতে। রাত তখন প্রায় বারটা।

হায় বিধাতা-মীরা বেন ব্যাঙ ডাকার শব্দশুনতে পাচ্ছিলেন। তাঁর পরিচিত ব্যাঙটি যেন মীরাকে মাতৃসম্বোধনে আহ্বান জানাতে জানাতে এগিয়ে আসছে। পেছন পেছন আসছে তার সন্তান সন্ততিরা। দেখতে দেখতে ব্যাঙগুলি তাঁর কুটিরের কাছে এসে উপস্থিত। মীরা ঘরের ভেতর থেকে সব উপলব্ধি করছিলেন। সহসা দরজা খুললেন না। মীরার প্রথম পোষা ব্যাঙটি যেন ঘরের দরজায় এসে করুণ সুরে মীরাকে দরজা খুলে দিতে অনুনয় বিনয় করছে। মীরা বেশিক্ষণ চুপচাপ থাকতে পারলেন না। অন্তরের গভীরটানে ধীরপদক্ষেপে দরজার দিকে এগোলেন দরজার খিলানটি আলগা করে দেখলেন। দেখলেন তার পোষা ব্যাঙটি নিষ্পলক নয়নে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। তার চোখে যেন বেদনার আর্ত জিজ্ঞাসা-কি অপরাধে তারা মীরা কর্তৃক বিতাড়িতা। তার পক্ষে মীরার অসুবিধের কথা বোঝা সম্ভব নয়। তাই তার অনুভূতি আর মীরার অনুভূতির মধ্যে তফাৎতো থাকবেই।

মীরা দরজা খুলে দিলেন। তাঁর পোষা ব্যাঙটি আগেঘরে ঢুকল তারপর অন্যান্য ব্যাঙগুলি একে একে চৌকাঠ পার হয়ে ঢুকল সবে। ঘরে ঢুকে তারা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মনে হতে লাগল মীরার বড় মেয়ে সন্তান সন্ততি নিয়ে কিছু সময় বাইরে কাটিয়ে মায়ের কাছেই প্রত্যাবর্তন করেছে।

মীরা এবার স্থির করলেন আরও দূরে নিয়ে গিয়ে এক স্রোতস্বিনীর জলে ফেলে দেবেন ব্যাঙগুলিকে বস্তাবন্দি করে। পরের দিন মীরা যখন ব্যাঙগুলিকে বস্তাবন্দি করছিলেন মীরার প্রথমে পোষা ব্যাঙটি মীরার মুখপানে ব্যাকুল হয়ে তাকাচ্ছিল। মীরার চোখে মায়ার রেখা। ব্যাঙটি যেন কাঁদছে। মীরা তবুও পাষাণীর মতন ব্যাঙগুলিকে বস্তাবন্দি করে নিয়ে চললেন। অনেক অনেক দূরে। ক্লান্ত শ্রান্ত মীরা। সঙ্গে বস্তাবন্দি চল্লিশটি ব্যাঙ। তাদের ডাকে মীরার অন্তরাত্মা যেন শুকিয়ে যাচ্ছিল। স্রোতস্বিনীর কাছে পৌছতে মীরার সময় লাগল প্রায় আধঘন্টা। কয়েকসেকেন্ড মাত্র স্রোতাস্বিনীর পারে দাঁড়ালেন মীরা। তারপর বস্তাবন্দি আবস্থায় চল্লিশটা ব্যাঙকে মীরা সলিল সমাধি দিলেন। আর আর্তকণ্ঠে তিনি ভগবানের কাছে তাদের সদ্‌গতি কামনা করলেন। তারপর রওনা দিলেন গৃহপানে।

মীরার দুঃখ, শোক, তাপ এক মুহূর্ত্তে যেন বিলীন হয়ে গেল। ভগবানের অসীম করুণাবলে মীরা নিজেকে সামলেয়ে নিলেন। মনে মনে ভাবলেন তার তো আর কোন উপায় ছিল না। এ কাজ করেছেন নিজের বাঁচার তাগিদে। তবে মীরা হয়ত বুঝতে পারেননি যে, ব্যাঙ সাঁতার কাটতে জানে। অতএর স্রোতস্বিনীর জলে ব্যাঙগুলি ভেসে গেলেও সেগুলো প্রাণে মরবে না। আগের বারের মত সাঁতার কেটে কুলে উঠে আবার মীরার গৃহাভিমুখে ধাবিত হবে।

মীরা বাড়িতে এসে তাঁর রাতের আহারটুকু তৈরি করলেন। রাত দশটায় আহারটুকু গ্রহণ করে বিছানায় গা এলিয়ে বিশ্রাম করছিলেন। সবে তখন রাত এগারোটা। এভাবে শুয়ে থেকে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লেন তাও তিনি বুঝতে পারেননি। রাত গভীর হলো। মীরা নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন। হঠাৎ অনেকগুলো ব্যাঙের বিকট ডাকে মীরার ঘুম গেল ভেঙ্গে।

মীরা ধড়ফড় করে বিছানা থেকে উঠে বসলেন। ঘরের আলো জ্বাললেন। মীরা দেখলেন ব্যাঙগুলি ক্রমাগত ডেকে চলেছে। মীরা এবার আর কোন চিন্তার সুযোগ পেলেন না। ঘরের দরজা খুলে দিলেন। মীরার প্রথম পোষা ব্যাঙটিকে অনুসরণ করে অন্য ব্যাঙগুলি একে একে তাঁর ঘরে ঢুকল। মীরা এবার অন্য কিছু চিন্তা করলেন না। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যতই কষ্ট হোক না কেন ব্যাঙগুলি তাঁর ঘরেই থাকবে। মীরা এখন জোর কদমে বেদ, উপনিষদ পাঠ করে চলেছেন। বেদমন্ত্রগুলির গূঢ় অর্থ অনুধাবন করতে না পারলেও সংস্কৃত শ্লোকগুলো তিনি কণ্ঠস্থ করে ফেলতে লাগলেন। শ্লোকগুলি তিনি একা বসে বসে আবৃত্তি করতেন। বেদমন্ত্রপাঠ তাঁকে প্রভূত আনন্দ দিত। তার থেকে তিনি পেতেন অনুপ্রেরণা আর শক্তি। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি। এযেন তাঁর দৈনিককার ইষ্টমন্ত্র জপ।

প্রায় বছর খানেক হয়ে গেল। মীরা মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। আশাদেবীর সঙ্গে মীরার মনের গভীর মিল। আশাদেবী মীরাকে মৌনব্রত ভাঙ্গার জন্য অনুরোধ জানালেন। মীরা প্রথমে অনীহা প্রকাশ করলেন। কিন্তু ক্রমেই মীরা যেন আশাদেবীর কথায় মৌনব্রত ভাঙ্গার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। একদিন আশাদেবী তাঁর পাশে বসে অনেক বোঝালেন। মীরা সব বুঝলেন। আর ক্ষোভে দুঃখে অঝোরে কাঁদলেন। আশা দেবী তাঁর মনোবেদনার কথা সম্যক উপলব্ধি করতে পারলেন। মীরা আশা দেবীর কথাতে সম্মত হয়ে মৌনব্রত পালন করা থেকে নিজেকে বিরত করলেন।

আশাদেবী এখন থেকে আর মীরাকে একাকিনী থাকতে দিতে নারাজ। তিনি মীরাকে তাঁর পুরনো কুটিরে ফিরে যেতে অনুরোধ জানালেন। তাঁর পুরনো কুটিরখানা ছিল বাপুর কুটিরের সন্নিকটে। কিন্তু মীরার অবর্তমানে সেই কুটিরটি আশ্রমের আপিস ঘরে পরিণত হয়েছে। ঘরটি জিনিসপত্রে ঠাসা। মীরার পক্ষে সেই ঘরের আর দখল পাওয়া সম্ভব নয়। আশাদেবী তাই মীরাকে সঙ্গে করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে চললেন। মীরাকে তাঁর বাড়িতে থাকতে অনুরোধ করলেন। মীরা সম্মতি দিলেন।

আশাদেবী ভালো সংস্কৃত জানতেন। সুতরাং বেদপাঠ করা তাঁর পক্ষে সুবিধেই হল। আশাদেবীর বাবা ছিলেন বিরাটমাপের সংস্কৃত পন্ডিত। আশাদেবীর কাছে মীরা বেদপাঠে অভ্যস্থ হয়ে উঠলেন।

ছাব্বিশ

যুদ্ধ চলেছে জোরকদমে এই যুদ্ধ ভারতে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। জাপান এর মধ্যে ব্রহ্মদেশ দখল করে নিয়েছে। এদিকে বার্লিন থেকে সুভাষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে বেতারের মাধ্যমে। ভারতবাসীকে সুভাষ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাবার জন্য অনুপ্রাণিত করতে লাগল। গান্ধীর এবং অন্যান্য নেতাদের উদ্দেশ্যে সুভাষ বার্লিন থেকে তার বেতার ভাষণ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সুভাষের ভাষণ গান্ধী নিবিষ্টমনে বেতার-এর মাধ্যমে শুনতে লাগলেন। সুভাষ যেন যাদুর স্পর্শ জাগাল গান্ধীর মনে। গান্ধী স্থির সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দেবার জন্য।

সুভাষ যখন দেশে ছিলেন তখন আরম্ভ হয়ে গেছে যুদ্ধ। ব্রিটিশ তখন বিব্রত। গান্ধীকে

সুভাষ তখন থেকে অনুরোধ করে যাচ্ছিলেন ইংরেজ সরকারের সেই দুঃসময়ে তাদের বিরুদ্ধে সুতীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে। "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের ডাক দিতে। সম্ভবত ১৯৪০ সাল। বাংলা কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে জলপাইগুড়িতে। সুভাষ সেই সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারেননি। কিন্তু সুভাষ সেই সম্মেলনে লিখিত আকারে পোষ্টার পাঠিয়েদিলেন। পোষ্টারগুলো বিলি করা হয়েছিল স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকাদের মাধ্যমে। এই জলপাইগুড়ি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন প্রবোধ চন্দ্র সিন্হা মহাশয়। একজন রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ার। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যলায়ের ছাত্র সিন্হাবাবু। বর্তমানে তিনি তিরানব্বই বছরের বৃদ্ধ।

সিনহাবাবু ছিলেন জলপাইগুড়ি অধিবেশনের একজন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক। তিনি সুভাষের প্রেরিত পোষ্টার জনগণের মধ্যে বিতরণের দায়িত্বে ছিলেন অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকের ন্যায় একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। সিন্হাবাবু সোদপুরের অধিবাসী। লেখকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় রয়েছে। লেখক সিনহাবাবুর সঙ্গে এ ব্যাপারে অনেকবার আলোচনা করেছেন। সিন্হাবাবু স্পষ্টতই লেখকের কাছে ব্যক্ত করেছেন যে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিতে কংগ্রেসকে ইংরেজের সঙ্কটকালে সুভাষ তার পোষ্টারে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি লিখিত আকারে একটি ভাষণ-ও পাঠিয়েছিলেন-যা সম্মেলনে পাঠ করা হয়েছিল এবং তাঁর এই ভাষণটিও উপস্থিত কংগ্রেস সদস্য ও সদস্যাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। কিন্তু সুভাষের কথায় গান্ধী সেই সময় কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। সুভাষকে সেই সময় অনেকেই বলেছিলেন যে সুভাষ নিজেই তো 'ভারতছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিতে পারেন-তাঁর দলের সদস্যদের দিয়ে তিনি ও এই আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন।

সুভাষ উত্তরে বলেছিলেন যে তিনি এই আন্দোলনের ডাক দিলে বিশ লাখ লোক হয়ত সাড়া দেবে কিন্তু গান্ধীর ডাকে সাড়া দেবে বিশ কোটি লোক। সিন্হাবাবুর সঙ্গে এখনও 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সম্পর্কে কথা উঠলে তিনি লেখককে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলতে থাকেন বেশ উত্তেজিত ভাবেই। এবং দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে থাকেন যে এই ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রবক্তা গান্ধী নন্ সুভাষচন্দ্র স্বয়ং। গান্ধী ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট সুভাষের অবর্তমানে এই আন্দোলনের ডাক দিয়ে ভারতের ব্রিটিশ শক্তিকে কাবু করে দিয়েছিলেন। সুভাষ বার্লিন থেকে এই আন্দোলনের সাফল্য কামনা করে ঘন ঘন বেতার ভাষণ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এখানেই রয়েছে সুভাষের কৃতিত্ব, সুভাষের শ্রেষ্ঠত্ব।

কংগ্রেস নেতারা তখন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বিব্রত। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে। নেতারা অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির নেতারা গান্ধীকে আবার কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিতে অনুরোধ করলেন। গান্ধী তাঁর সম্মতি জানালেন। হরিজন পত্রিকায় গান্ধী তাঁর মনোভাব জানিয়ে বক্তব্য রাখলেন। ভারতের জনগণ এবং কংগ্রেস নেতারা গান্ধীকেই আবার তাঁদের অবিসংবাদিত নেতার আসনে বসালেন ভারতের মুক্তি আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য। ইংলন্ড ভারতবাসীর ও কংগ্রেসের মনের অবস্থা অনুধাবন করতে লাগল। স্যার স্টাফোর্ডক্রিপসকে ভারতে পাঠালো ইংলন্ড। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে কথা বলার জন্য। ক্রীপস্ মিশন সফল হলো না।

মীরা তাঁর পনের মাসের মৌনব্রত ভঙ্গ করলেন। আবার ভারতের মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন গান্ধীর নির্দেশে বা অনুরোধে। গান্ধীর নির্দেশে তিনি চললেন উত্তর বম্বেতে। নাবাসারিতে। সেখানে গঠিত হয়েছে ভারতীয় মহিলাদের জন্য একটি 'Training Camp' এই ক্যাম্পের দায়িত্বে রয়েছেন 'কমলা দেবী' ও 'মৃদুলা সরাভাই'। মহিলাদের ট্রেনিং এর কাজ চলছিল জোর কদমে। এদের সঙ্গে এসে যোগদিলেন মীরা। মীরা মহিলাদের ঘোড়ায়চড়া, সাইকেল চালানো, ছুরি খেলা, লাঠি খেলা ইত্যাদি শিক্ষা দেবার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সঙ্গে রয়েছেন 'কমলাদেবী' ও 'মৃদুলা সরাভাই'।

জাপানী বোমা পড়তে লাগল ভারতে। ভারতকে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল। ভারতীয় সৈন্যদের উপর ব্রিটিশ সরকার পুরোপুরি বিশ্বাস রাখতে পারছিল না। তাই ভাড়াটে সৈন্যদের নিয়ে আসতে লাগল 'আফ্রিকা থেকে এবং অন্যান্য জায়গা থেকে। চট্টগ্রাম, কলকাতা প্রমুখ পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা গোরা এবং হাবসী সেনায় ভরে গেল।

বার্মাদেশেও সিঙ্গাপুরে জাপানী সৈন্যরা ব্রিটিশ সৈন্যদের পরাজিত করল। এ দুটি দেশ দখল করে নিল জাপান। ব্রিটিশ প্রাধানমন্ত্রীও তাঁর কেবিনেট সদস্যদের রাতের ঘুম গেল বন্ধ হয়ে।

গান্ধী হরিজন পত্রিকায় ব্রিটিশ বিরোধী প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। ভারতবাসী আবার স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হল। তাদের মনে সৃষ্টি হল এক বিপুল জাগরণ। গান্ধীর তল্পি বাহিকা এবং একান্ত অনুরক্তা ভারতমাতার সেবিকারূপে মীরা কাজ করে চললেন। মীরা এলাহাবাদে গিয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সদস্যাদের সঙ্গে মিলিত হতে চাইলেন। মীরা এলাহাবাদে গিয়ে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে জাতীয়স্তরে অসহযোগ আন্দোলন চালাবার ব্যাপারে আলোচনা করতে চান। গান্ধীর সম্মতি প্রয়োজন। গান্ধীর তাই সম্মতি চেয়ে মীরা চিঠি দিলে। গান্ধী উত্তরে জানালেন, "If you feel like that come at once".

বাপু মীরাকে আরও লিখলেন, "আমি তোমার চিঠি পেয়েছি। আমি তোমাকে সেবাগ্রামে আসতে অনুরোধ করছি। এখানে এসে বর্তমান পরিস্থিতিতে কি করা উচিত তা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। তুমি যে কাজ গ্রহণ করেছ তা সুন্দরভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে তোমার অসুবিধে হবে না। আমি তোমাকে একখানা তারবার্তা পাঠিয়েছি। জানি না তা তোমার হাতে গিয়ে পৌঁচেছে কি না? এখন সব কিছুই যেন অনিশ্চিতের পানে ধেয়ে চলেছে। আমি খুবই চিন্তিত।

মীরা গান্ধীর চিঠি পেয়ে বম্বে থেকে সেবাগ্রামের উদ্দ্যেশ্যে রওনা দিলেন।

মীরা সেবাগ্রামে পৌছে দেখলেন যে বাপু ভীষণভাবে চিন্তা ক্লিষ্ট। তাঁর চোখে মুখে জ্বলছে দুশ্চিন্তার আগুন। মীরাকে দেখে বাপু সস্নেহে বসতে বললেন। মীরার হাতে তিনি দুখানা আলাদা আলাদা চিঠি দিলেন। চিঠি দুটি লিখেছেন গান্ধীজি নিজেই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য-সদস্যাদের জন্য। গান্ধী চিঠিতে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। মীরাকে বাপু চিঠি দুটি পড়তে বললেন। মীরা দেখলেন চিঠিতে বাপু 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেবার জন্য প্রস্তুতি নিতে কংগ্রেস কর্মীদের আহ্বান জানাতে চাইছেন।

চিঠি দুটি জওহরলাল ও আজাদের কাছে লেখা, এরা দুজনই এলাহাবাদে ভীষণভাবে ব্যস্ত। মীরা বাপুর চিঠি দুটি নিয়ে ছুটলেন এলাহাবাদে।

এলাহাবাদে রওনা দেবার আগে মীরা বাপুর সঙ্গে একঘন্টা ধরে আলোচনা করলেন। বাপু মীরাকে সব কিছু সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন, মীরা সবকিছু বুঝলেন এবং দৃঢ়ভাবে বাপুকে বললেন যে তিনি সমস্ত বিষয়টা জওহরলাল ও মৌলানাকে বুঝিয়ে বলবেন। পরদিনই মীরা রওনা দিলেন এলাহাবাদের উদ্দেশ্যে। যথাসময়ে পৌঁছলেন এলাহাবাদে গিয়ে। তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ডোবার অপেক্ষায়। তখন সন্ধ্যা, প্ল্যাটফরমে লোক জনের ভিড়। মীরা কাউকে চিনতে পারছিলেন না। তবু পরিচিত লোকের সন্ধানে তাঁর চোখদুটি উৎসুক হয়ে উঠল। হঠাৎ এক অতিপরিচিত লোকের কণ্ঠস্বর তিনি শুনতে পেলেন, কাছে গিয়ে দেখেন জওহরলাল স্টেশনে এসেছেন একজন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যকে রিসিভ্ করতে। কিন্তু সেই সদস্যটি তখনো এসে পৌঁছাননি।

জওহর মীরাকে দেখে খানিকটা বিস্মিত। বিস্ময়ের ঘোর কাটলো কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। জওহর মীরাকে তাঁর এলাহাবাদে আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মীরা ধীরে ধীরে বাপুর নির্দেশানুযায়ী সব কিছু খুলে বললেন। জওহরের হাতে গান্ধীর চিঠিখানা দিলেন মীরা।

জওহরের চোখে মুখে চিন্তার ছাপ। ওয়ার্কিং কমিটির অনেক সদস্য-সদস্যা তখনো এসে পৌঁছাননি। জওহর মীরাকে দুঃখ করে বললেন দায়িত্বশীল ভারতীয়রা সময়ের দাম দিতে সচেষ্ট নন। জওহর মীরাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন।

জওহর ও মীরা গাড়ি করে চলেলেন আনন্দভবনের পথধরে। গাড়িতে মীরার সঙ্গে বিশেষ কোন কথা হলো না জওহরের। যথাসময়ে গাড়ি আনন্দভবনে গিয়ে পৌঁছালো। জওহর আনন্দভবনে গিয়ে খামখানা খুললেন। চিঠিখানা নিবিষ্টমনে পড়লেন। মীরাকে বললেন মৌলনার চিঠি খানাও তাঁর হাতে দিতে হবে। জওহর মীরাকে মৌলনার চিঠিখানা তাঁকে দিতে বললেন। মীরা চিঠিখানা জওহরের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন।

মীরা জওহরকে বললেন বাপু তাঁকে বলে দিয়েছেন মীরা যেন আজাদকে বাপুর মনোভাবটি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলেন। তখন রাত প্রায় বারটা। জওহর মীরাকে বললেন কাল সকালে কথা হবে এখন যেন তিনি ঘুমোতে যান। সমস্ত ঘরে লোক। একমাত্র মৃদুলার ঘরে একখানা খাট খালি পড়ে আছে। জওহর মীরাকে সেই খাটে শোবার জন্য বলে দিলেন। জওহর তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

পরদিন সকাল। মীরা জওহরের সঙ্গে দেখা করলেন। জওহর তাঁকে আজাদের কাছে নিয়ে গেলেন। আজাদ তখন চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন। সরোজিনী নাইডু, অরুণা আসফ আলি ও তখন সেখানে উপস্থিত। জওহর মীরাকে বললেন মীরা যেন বাপুর বক্তব্যটুকু আজাদকে পরিষ্কার করে বলে দেন। পরদিন আরম্ভ হবে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং। আজাদ বাপুর চিঠিখানা পড়ে শোনালেন কিছু সদস্যের কাছে। মীরার কাছে যা শুনেছেন সবই তাদের কাছে তুলে ধরলেন আজাদ। আনন্দ ভবনের সংলগ্ন স্বরাজ ভবন (পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর অরিজিনাল বাড়ি) এ বাড়িখানা মতিলাল জাতীয় উদ্দেশ্যে দান করেছেন।

সেখানে রয়েছেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, কৃপালিনী প্রমুখ। মীরা যে

বাপুব চিঠি এনে আজাদকে দিয়েছেন তাও এঁবা জানতেন না। আজাদেব মুখে বাপুব চিঠিব কথা শুনে তাই তাঁবা কিছুটা বিস্মিত।

পবদিন সকালে আনন্দভবনেব দ্বিতলেব এক বিশাল ঘবে বসেছে কংগ্রেস ওযার্কিং কমিটিব মিটিং। সেখানে উপস্থিত কংগ্রেসেব তাবড তাবড নেতা। উপস্থিত সদস্য-সদস্যাদেব কাছে আজাদ বাপুব প্রস্তাব পড়ে শোনালেন। মীবাব কাছে আজাদ যা শুনেছেন তাও তিনি সদস্য সদস্যাদেব খুলে বললেন।

বাপু উপস্থিত নেই মিটিং এ। তাব উপস্থিতিব বিশাল দাম। বাপু স্বযং মিটিং-এ উপস্থিত না থাকায অনেক সদস্যই বাপুব প্রস্তাব ঠিক মত মেনে নিতে পাবছিলেন না। বাপুব মুখেই তাঁবা তাঁব প্রস্তাব সম্পর্কে শুনতে চান। প্রস্তাবেব ব্যাখ্যা চান।

আজাদেব ভাষণ সমাপ্ত। ওযার্কিং কমিটিব সদস্য-সদস্যাবা দ্বিধাবিভক্ত। বাপুব প্রস্তাবকে অনেকেই অযৌক্তিক বলে মনে কবলেন। সদস্য সদস্যাবা মীবাকেই বাপুব মনোভাব ব্যাখ্যা কবতে বলেন। দেখা গেল কংগ্রেসেব অনেক তাবড তাবড নেতা গান্ধীব প্রস্তাবকে স্বাগত জানাতে পাবলেন না। ওযার্কিং কমিটিব প্রথম সভায গান্ধীব প্রস্তাবেব উপব সিদ্ধান্ত নেওযা সম্ভব হল না।

বিকেলে আবাব সভা বসল। এ সভাতেও প্রায একই অবস্থা। সর্বসম্মত ভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেওযা অসম্ভব। বাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ কযেকজন গান্ধী অনুগামী গান্ধীব প্রস্তাব মেনে নিতে সম্মত হলেও বিবোধীপক্ষ এই প্রস্তাবকে গ্রহণ যোগ্য মনে কবল না। বাজেন্দ্র প্রসাদ বিবোধীপক্ষেব সঙ্গে একটা আপোষবফায আসতে উদ্যোগী হলেন।

পবেব দিন ওযার্কিং কমিটিব আবাব সভা বসল। এই সভায প্রস্তাবটি কিছুটা অদল-বদল কবে গ্রহণ কবাব সিদ্ধান্ত গহীত হল। তা অল ইন্ডযা কংগ্রেস কমিটিতে পাঠানো হলো। শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি পাশ হলো। তবে গান্ধীব প্রস্তাবকে কিছু কিছু সদস্য কটাক্ষ কবতে পিছপা হলেন না। সদস্য সদস্যাদেব মধ্যে ছিল বিবাট উত্তেজনা। তবে এই উত্তেজনা প্রকাশ্য সংঘাতে পবিণত হযনি। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ কবা প্রযোজন যে, ১৯৪২ সালেব প্রথম থেকেই গান্ধী ভাবতবর্ষেব স্বাধীনতাব ব্যাপাবে ব্রিটিশ সবকাবেব বিরুদ্ধে আপসবিবোধী সংগ্রামে লিপ্ত হবাব ইচ্ছে প্রকাশ কবেন। ক্রিপস প্রস্তাব আলোচনাব সময তাঁব এই মনোভাব সকলেই লক্ষ্য কবেছে।

এটা সর্বজনবিদিত যে, সেই সময কংগ্রেসেব বেশ কিছু নেতা বিশেষত জওহবলাল ও মৌলনা আজাদ যুদ্ধে ব্রিটিশেব সঙ্গে সহযোগিতাব জন্য ব্যস্ত হযে পড়েন। গান্ধীব চাপে এলাহাবাদে কংগ্রেস ওযার্কিং কমিটিব মিটিং এ নেহরুব ব্রিটিশকে যুদ্ধে "শর্তহীন সহযোগিতাব নীতি" পবিত্যক্ত হয।

মৌলনা আজাদ তাঁব বইতে মন্তব্য কবেছেন, "যুদ্ধেব শুরুতে যুদ্ধ সম্পর্কে গান্ধীজিব যে নীতি ও ধাবণা ছিল তাব থেকে তিনি অনেক দূবে চলে এসেছেন। গান্ধীজি এ ব্যাপাবে দৃঢ় নিশ্চিত ছিলেন যে যদি জাপানীবা ভাবতে প্রবেশ কবে সেটা তারা কববে ভাবতবাসীর শত্রু হিসেবে নয, ইংবেজেব শত্রু হিসেবে।"

এ সময়ে নেহরুব এবং আজাদেব সঙ্গে গান্ধীজির মতবিরোধ চরমে পৌঁছে. গান্ধী আজাদকে স্পষ্টত জানিযে দেন যে, কংগ্রেস সদস্যরা যদি চান আসন্ন আন্দোলন তাঁর

নেতৃত্বেই চলবে তাহলে, "আজাদকে আবশ্যই কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে এবং আজাদ ও নেহরুকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ থেকেও সরে যেতে হবে।"

অবস্থা সঙ্কটজনক দেখে সর্দার প্যাটেল মধ্যস্থতার জন্য এগিয়ে আসেন। তাঁরই মধ্যস্থতায় সঙ্কটের অবসান ঘটে। ১৪ ই জুলাই পর্যন্ত আলোচনা চলে। ঐদিনই অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি জাতীয় দাবি সম্বলিত গান্ধীর প্রস্তাবটি কিছু অদলবদল করে গ্রহণ করে।

আজাদ তাঁর বইতে আরও মন্তব্য করেছেন যে, গান্ধীজির ধারণা জন্মেছিল যে, মিত্রপক্ষ যুদ্ধে পরাজিত হবে। দ্বিতীয়ত সুভাষচন্দ্রের ভারত থেকে অন্তর্ধান, অক্ষশক্তির সাহায্যলাভ, জার্মানি থেকে তাঁর ঘন ঘন বেতার ভাষণ গান্ধীজীর মনে দারুণভাবে রেখাপাত করেছিল। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর আগের মনোভাব বিদূরিত হলো। তৃতীয়ত তিনি ধারণাই করতে পারেননি যে আন্দোলন শুরু হতে না হতেই সরকার তা দমন করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে। বরঞ্চ তিনি আশা করেছিলেন যে আন্দোলন আরম্ভ হবার পর আন্দোলনকে ধীরে সুস্থে তিনি তাঁর অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত করতে পারবেন। "টোটেনহ্যামও গান্ধীজীর আচরণের পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একই ধরনের কথা বলেছেন।"

তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো মন্তব্য করেছেন যে গান্ধী যে "ভয়ঙ্কর ভাষা" এসময় ইংরেজদেবে বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতেন সেগুলি অনেকটাই "Safety valve" ছাড়া আর কিছু নয়। কেন না কথা অনুযায়ী তিনি কাজ করতেপারতেন না। তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে ফারাক থাকত অনেক।

গান্ধীজীর সচিব পিয়ারিলালের বক্তব্য অনুযায়ী "ভারত ছাড়ো" এই শব্দটি নাকি গান্ধীজীর নিজের উদ্ভাবিত নয়। আগস্ট আন্দোলন শুরু হবার অব্যবহিত আগে জনৈক মার্কিণ সাংবাদিকের সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাৎকারের সময় সেই সাংবাদিক এ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। পরে এ শব্দটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

গান্ধীজী নিজে যে শব্দটি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন সেইটি নাকি ছিল "বিধিবদ্ধ পদ্ধতিতে ব্রিটিশ প্রত্যাহার" (Orderly British Withdrawal) তবে আমি যতদূর জানি "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের কথা যাঁর মুখ দিয়ে প্রথম উচ্চারিত হয় তিনি আর কেউ নন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসু। এব্যাপারে আগেই উল্লেখিত হয়েছে। যাই হোক ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত নিয়ে তার পরের দিনই মীরা, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শঙ্কর রাও ছুটলেন সেবাগ্রামে গান্ধীসকাশে। তাঁরা ওয়ার্ধা হয়ে সেবাগ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাপুকে সব কিছু বিস্তারিত বললেন। ওয়ার্কিং কমিটির গৃহীত সিদ্ধান্তের একটি কপি বাপুকে দিলেন।

বাপু সমস্ত জিনিসটা মনোযোগসহকারে শুনলেন। আর ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তটা নিবিষ্ট মনে পড়লেন। বাপু মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন। তবে প্রকাশ্যে তিনি কোন মন্তব্য করলেন না।

এই সিদ্ধান্ত বাপুকে স্বাধীনভাবে অনেককিছু করার ক্ষমতা দিল। তাই বাপু বললেন তাঁর প্রস্তাব কিছুটা অদল বদল করে ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত হয়েছে ঠিক তবে এ সিদ্ধান্ত

তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে। বাপু ইংরেজদের বিরুদ্ধে "ভারত-ছাড়ো" আন্দোলনের ডাক দিতে চলেছেন। তবে তার জন্য উপযুক্ত সময় দরকার। দরকার অনেক পরিকল্পনা।

সাতাশ

গান্ধী রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং শঙ্কর রাও কে তাঁদের নিজ নিজ প্রদেশে চলে যাবার নির্দেশ দিলেন। তাঁদের গান্ধী বলে দিলেন যে তাঁরা যেন নিজ নিজ প্রদেশে "ভারত-ছাড়ো" আন্দোলনের জন্য ক্ষেত্র তৈরি করার কাজে লেগে পড়েন। আর মীরার সামনে রাখলেন তিনটি প্রস্তাব। এর মধ্যে যে কোন একটি মীরা বেছে নিতে পারেন - প্রথম প্রস্তাব হল মীরা মাদ্রাজে গিয়ে রাজাগোপাল আচারির সঙ্গে দেখা করবেন। গান্ধীর সিদ্ধান্তের কথা তাঁকে জানাবেন। সেই সময় রাজাগোপাল আচারি কংগ্রেসের কিছু কিছু সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারছিলেন না। এবং তাঁকে বুঝাবেন কি কি পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধী এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দ্বিতীয় প্রস্তাব হল মীরা ইচ্ছে করলে দিল্লী গিয়ে ভাইসরয়-এর সঙ্গে দেখা করতে পারেন। এবং "ভারত-ছাড়ো" আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধী এবং কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের কথা পরিজ্ঞাত করতে পারেন। তৃতীয় প্রস্তাব হল মীরা ইচ্ছে করলে উড়িষ্যা যেতে পারেন। সেইখানে উড়িষ্যার প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতা হরেকৃষ্ণ মহাতব-এর সঙ্গে দেখা করে উড়িষ্যাতে অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য কাজ আরম্ভ করে দিতে পারেন।

মীরা নিবিষ্টমনে গান্ধীর কথা শুনলেন। শেষ পর্যন্ত উড়িষ্যা যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। মহাতব মূলত পাঞ্জাবের লোক। মহাতবের কাছে খবর পৌঁছে গেল যে মীরা যাচ্ছেন উড়িষ্যায়। মহাতব স্টেশনে মীরার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যথাসময়ে মীরা গিয়ে উপস্থিত হলেন। কটক স্টেশনে মীরাকে রিসিভ করলেন মহাতব। মীরাকে নিয়ে গিয়ে তিনি উঠলেন কংগ্রেস আপিসে। সেখানে বসে মীরার সঙ্গে মহাতবের বিস্তারিত আলোচনা হল। মীরা "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন আরম্ভ করার ব্যাপারে গান্ধীর মনোভাব ব্যক্ত করলেন মহাতবের কাছে।

একমুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করা মীরার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মহাতবের সঙ্গে বসে তিনি তাঁর একটি ভ্রমণ সূচী তৈরি করলেন। মহাতব এই ভ্রমণসূচী গ্রহণযোগ্য বলে মনে করলেন। উড়িষ্যার সমুদ্রের তীরভূমি দিয়ে মীরা গ্রামের পর গ্রাম পরিভ্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন উড়িষ্যা সরকার বেশ খানিকটা উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে। গ্রামে গ্রামে পুলিশ পাঠিয়ে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মত ক্ষমতা তাদের সেই মুহূর্ত্তে ছিল না। তাই মীরা বিনা বাধায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটতে লাগলেন। সঙ্গে হরেকৃষ্ণ মহাতব ও উড়িষ্যার অন্যান্য কংগ্রেস সদস্যরা। গ্রামে যাবার রাস্তা নেই ধানক্ষেতে আল-এর উপর দিয়ে তাদের যেতে হচ্ছে। তাতে মীরারকোন ভ্রূক্ষেপ নেই। মীরার জন্য ছোট একটি পনির (ঘোড়া) ব্যবস্থা করা হলো। মীরা তার পিঠে চড়ে গ্রামের পর গ্রাম ভ্রমণ করলেন।

ছোট ছোট সভা সমিতি করে গান্ধীর ও ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত-এর কথা জানালেন দেশের স্বার্থে গান্ধীর ডাকে "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের সামিল হতে তাদের অনুরোধ

করলেন। এদিকে মাদ্রাজ সরকার শহর থেকে লোক সরিয়ে নিতে আদেশ জারি করে দিয়েছেন। চারিদিকে একটা যুদ্ধংদেহী ভাব। ইংরেজরা ভীত।

মীরা বলেছেন উড়িষ্যার শহরের অবস্থা আরও সঙ্কটজনক। শহরগুলি যেন জনশূন্য। ভীতি বিহ্বল লোকজন যেন শহর ছেড়ে পালাচ্ছে। মীরা ও মহাতব উড়িষ্যার গ্রামের পর গ্রাম পরিভ্রমণ করেছেন। গ্রামের লোকের মনোভাব পরিজ্ঞাত হয়েছেন। তাদের গান্ধীর নেতৃত্বে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ব্যাপারে বুঝিয়েছেন। উড়িষ্যার গ্রামবাসীদের মনে তাই জেগে উঠেছে এক ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব।

তখন উড়িষ্যার রাজধানী ছিল কটক। যেখান থেকে সরকার উড়িষ্যার শাসন চালান। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে এই রকম একটা পরিস্থিতিতে জনগণের উপর ইংরেজদের অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করার ফলে লোকেরা খাদ্য শস্য কিনতে পারছে না। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া যেন উড়িষ্যায় জনগণকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। টাকা থাকলেও লোক খাদ্যশস্য কিনতে পারছে না।

সরকারের উপর উড়িষ্যার জনগণ তিক্তবিরক্ত। লোকের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে লাগল। সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের মনোভাব দেখে মীরা ও মহাতব খুশি।

উড়িষ্যা সরকার স্বেচ্ছাসেবক সংস্থাগুলিকেও কাজ করতে দিতে অনীহা প্রকাশ করতে লাগল। সব দিকেই তাদের ভয়। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে জাপান ভারতের মাটিতে অবতরণ করলে ইংরেজ সরকারকে পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করতে হবে। পুড়িয়ে দিতে হবে কাগজপত্র। ফাইলপত্র। পুড়িয়ে দিতে হবে ধান ও অন্যান্য খাদ্য শস্য। উড়িয়ে দিতে হবে ব্রীজ ইত্যাদি। যাতে জাপানীরা ভারতে এসে কোন সুবিধে করতে না পারে।

এরকম একটা পরিস্থিতিতে মীরা উড়িষ্যার chief secretaryর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। তখন উড়িষ্যার Chief Secretary ছিলেন Mr. Wood. অনেক সাধ্যসাধনার পর মীরার সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হলেন। দেখা করার তারিখ স্থির হলো ২৫শে মে ১৯৪২ Mr. Mansfield নামক সরকারের আর একজন সদস্যও উক্তদিনে উপস্থিত থাকবেন বলে স্থির হলো।

মীরা ২৫ শে মে যথারীতি তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। মীরা বললেন যে চিফ সেক্রেটারী নিশ্চয় হরিজন পত্রিকায় গান্ধীর লেখা পড়েছেন। গান্ধী স্পষ্টতই বলেছেন ইংরেজ ও ভারতীয়দের স্বার্থে কোন সংঘাতে না গিয়ে তারা ভারত ছেড়ে চলে যান। চিফ্ সেক্রেটারী মীরার বক্তব্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন মন্তব্য করলেন না।

মীরা বলে চললেন। তিনি বললেন আজ হোক বা দু' দিন পরেই হোক ব্রিটিশকে তল্পিতল্পা নিয়ে ভারত থেকে চলে যেতে হবে। সুতরাং সেই সময় ভারতবর্ষ শাসনের ব্যাপারে একটা গোলযোগ সৃষ্টি হবে। জাপানীরা ব্রিটিশের চলে যাবার পর সেই শূন্য স্থান পূরণ করার জন্য চেষ্টা করবে। যেটা হবে ইংরেজ এবং ভারতবাসী উভয়ের পক্ষে মারাত্মক। অতএব যত শীঘ্র সম্ভব ইংরেজ যেন ভারতীয় নেতাদের হাতে ভারতের শাসন ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে চলে যান।

মীরার সঙ্গে চিফ্ সেক্রেটারী-র প্রায় একঘন্টা আলোচনা হলো অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে। মীরা তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। মীরা সেদিনই বাপুকে

সব কিছু বিস্তারিত জানিয়ে চিঠি দিলেন। মীরা চিঠিতে তাঁর উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ-ও দিলেন। সেই সময় ভারতের সকল প্রদেশের অধিবাসীর মনে একটা ভীতি উঁকিঝুঁকি মারছিল সেটা হচ্ছে জাপান হয়ত অচিরেই ভারত দখল করে নেবে। কেননা সিঙ্গাপুর-বার্মাদেশ তখন জাপানের করতলগত। মীরা তাই বাপুর কাছে এও জানতে চাইলেন জাপান উড়িষ্যার সমুদ্রউপকুলভাগ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করলে তিনি কোন পথ অবলম্বন করবেন।

বাপু মীরার চিঠির উত্তর দিলেন অতিসত্বর। বাপু তাতে লিখলেন, "মীরা আমি তোমার সুন্দর ও উদ্দীপনাময় চিঠিখানি পেয়েছি। চিফ সেক্রেটারীর সঙ্গে কথাবার্তার যে বর্ণনা তুমি দিয়েছ তা অতীব চমৎকার। তোমার উত্তরগুলো ছিল সঠিক, প্রাসঙ্গিক এবং সাহসী। এ ব্যাপারে আমার কিছু বলা বা মন্তব্য করা সাজে না। আমার একমাত্র বলার আছে যে "তুমি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছ কাজ কর্ম নিয়ে সেইভাবেই এগিয়ে চল। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে তুমি সঠিক সময়ে সঠিক পথেই এগিয়ে যাচ্ছ। অতএব তোমার কাজকর্মের ব্যাপারে আপাতত আমার বলার কিছুই নেই। তোমার সব কাজই ভাল এবং যথাযথ পথে চলছে।

তারপর জাপানের ব্যাপারে বাপু মীরাকে লিখলেন, "........ মীরা, মনে রেখো জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে সব সময় অসহযোগিতা করে যেতে হবে। তারা যদি এসে পড়ে তাদের কোন সাহায্য করা চলবে না। আমাদের কেউ যেন তাদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে না যায়। যদি আমাদের লোকেরা জাপানী সৈন্যদের সম্মুখীন হতে ভয় পায়, তাহলে তাদের অস্ত্রধারী হয়ে সৈনিকের বেশে জাপানী সৈন্যদের মোকবিলা করতে হবে। যদি তারা জাপানী সৈন্যদের এ ভাবে মোকবিলা করতে সাহস না পায় এবং জাপানী সৈন্যরা ভারতে যে অংশ দখল করবে সেখান থেকে তাদের বিতাড়িত করতে অক্ষম হয় তাহলে তারা যেন পরবর্তী নির্দেশ অনুযায়ী চলার বা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবার জন্য তৈরি থাকে। একটা জিনিস তাদের মনে রাখতে হবে তারা যেন স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে জাপানী সৈন্যদের কাছে আত্মসম্পর্ণ না করে। তা যদি করে সেটা হবে ভীরুতার কাজ। তাদের বুঝাবে তারা যেন উপলব্ধি করে ইংরেজ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে জাপানের শাসনকর্তৃত্বে আবার পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া আত্মহত্যার সমান। তাই জাপানী সৈন্যদের প্রতিপদক্ষেপে প্রতিহত করা হবে তাদের প্রথম এবং শেষ কাজ। ব্রিটিশ মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করে এদেশে জাপানী মুদ্রার প্রচলন হোক এটা স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর অভিপ্রেত হওয়া উচিত নয়।"

মীরা বাপুর কাছে যা যা জানতে চেয়েছিলেন সব কিছুর উত্তর তিনি পেয়ে গেলেন। জাপানীরা এদেশে পদার্পণ করলে তাদের কিভাবে ট্রিট করতে হবে তাও বাপুর চিঠিতে সুন্দরভাবে উল্লেখিত রয়েছে। মীরা লিখেছেন যে একটা জিনিস খুবই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে উড়িষ্যাবাসী জাপানী বোমার আতঙ্কে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

আঠাশ

কটকের অনতিদূরে চারওয়াড় নামক একটি গ্রাম ছিল। যুদ্ধের সময় সেখানে তৈরি হচ্ছিল এক বিশাল বিমান ক্ষেত্র। এই বিমানক্ষেত্র তৈরির ব্যাপারে কাজের জন্য ভারতের

বিভিন্ন জেল থেকে আসামীদের নিয়ে আসা হল শ্রমিকের কাজে তারা নিযুক্ত ছিল সেখানে। এদের মধ্যে অনেকেই ছিল খুনী। আসামী..

গ্রামবাসীদের সঙ্গে এ সমস্ত শ্রমিক অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করত। গ্রামবাসীরা তাই ভয়ে ভয়ে থাকত। বিমানক্ষেত্র তৈরির কাজ চলছিল জোর গতিতে। কিন্তু খুনী আসামী শ্রমিকরা এক এক সময় খুনের নেশায় মেতে উঠত। তারা নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার চালাবার কথা স্থির করে রেখেছিল। মনস্তত্ত্ববিদরা জানে খুনী আসামীরা সুস্থ জীবন যাপন করতে গেলেও অনেক সময় খুনের নেশায় তারা মেতে উঠে। এটা যে তাদের নেশায় পরিণত হয়ে যায় ক্রমশ খুন করতে করতে। এটা যেন মদের বা ড্রাগের নেশার চেয়েও ভয়ঙ্কর। এই নেশা তারা চেষ্টা করেও অনেকসময় ছাড়তে পারে না। মীরা ও হরেকৃষ্ণ মহাতব গ্রামবাসীদের জন্য চিন্তিত। তাঁরা গ্রামবাসীদের ব্যাপারে আলোচনার জন্য গেলেন কালেক্টর সাহেবের কাছে। তাঁরা কালেক্টরের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যস্ত। এমন সময় হঠাৎ খবর এলো চারওয়ার গ্রামে আগুন লাগানো হয়েছে। আগুন লাগিয়েছে বিমান ক্ষেত্রে কর্মরত খুনী শ্রমিকরা। গ্রামবাসীরা ভয়ে আতঙ্কে ইতস্তত ছুটাছুটি করছে। তারমধ্যে শ্রমিকরা তাদের বাড়িঘর লুটপাট করতে আরম্ভ করেছে।

কালেক্টর এ সংবাদ পেয়ে নিজেই ছুটে চললেন চারওয়ার গ্রামে। তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। আর শ্রমিকরা বাড়িঘর থেকে যে যা পাচ্ছে তাই নিয়ে পালাচ্ছে। গ্রামবাসীরা প্রাণেরভয়ে ঘর ছাড়তে বাধ্য হল। কালেক্টরের আশ্বাস বাণীও তাদের স্বস্তি দিতে পারল না।

মীরা গ্রামবাসীদের দুঃখে ব্যাথিত। স্থির করলেন মহাতবকে নিয়ে তিনি চারওয়ার গ্রামে ক্যাম্প করে থাকবেন। এতে গ্রামের লোকের মনোবল বৃদ্ধি পাবে। গ্রামবাসীদের প্রকৃত ক্ষতির হিসেবও তারা সংগ্রহ করতে পারবেন। গ্রামবাসীদের প্রত্যেকের সঙ্গে মীরা ও মহাতব দেখা করলেন। তাদের কালেক্টর সাহেবের কাছে সাহায্যের জন্য দরখাস্ত পেশ করতে বললেন। মীরার কথামত তারা সাহায্যের জন্য সরকারের কাছে দরখাস্ত পাঠাল।

গ্রামখানি ধ্বংসস্তূপে পরিণত। বাড়িঘর ভস্মীভূত। হরিজনদের ক্ষতির পরিমানটা ছিল অধিক। গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িই ক্ষতিগ্রস্ত। আগুন তখনো জ্বলছে। তুষের আগুনের মতন ধোঁয়া বের হচ্ছে। আর মাঠের ঘাস ও পুড়ে ছাই। একটি কালো পুরুষ ছাগল ধ্বংস স্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। আর ম্যাম্যা করে ডাকছে। মীরা বুঝতে পারলেন ছাগলটিকে কেউ পুষেছে। ছাগলটি এদিক ওদিক হতাশ নয়নে তাকাচ্ছিল। সে হয়ত ভাবছে তার পক্ষে বাঁচা অসম্ভব। খাওয়ার ত জুটবে না। অনাহারেই তাকে ভবলীলা সাঙ্গ করতে হবে।

মীরার মনে হলো ছাগলের চোখে জল। মীরা ছাগলের মাথায় হাত রাখলেন। ছাগলটির চোখ থেকে ঝরে পড়ল এক ফোঁটা জল। মীরা ভাবে তন্ময়। মানুষের মতন ছাগল কিংবা অন্য পশুপাখিরও একটা নিজস্ব সত্তা বিরাজমান। এই দু'জীবের মধ্যে রয়েছে চেতনা। মানুষের ন্যায় পশু-পাখিরও দুঃখ, শোক, বেদনাবোধ রয়েছে। তবে মানুষ তার বাক্‌শক্তি দিয়ে তার এ সমস্ত অনুভূতিকে প্রকাশ করে পশুপাখির পক্ষে তা সম্ভব নয়।

মীরা চারওয়ার গ্রামের একটা প্রথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর ক্যাম্প করলেন। তিনি সেখান

থেকেই গ্রামবাসীদের সাহায্য করতে লাগলেন। স্কুলবাড়িটিকে লেলিহান আগুনের শিখা পুড়িয়ে ফেলতে প্যারেনি।

মীরা এরপর গেলেন বিমানক্ষেত্রে। সেখানে কর্তব্যরত এক আইরিশ অফিসারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। তখন বিভিন্ন শহরে গ্রামে জাপানী বোমা পড়ছে। মীরা গ্রামবাসীদের জন্য কিছু পরিখা খুঁড়ে দিতে সরকার বাহাদুরের প্রতিনিধিকে অনুরোধ করলেন। বোমা পড়লে যাতে গ্রামবাসীদের পরিখায় আশ্রয় নিয়ে বোমার আঘাত থেকে বাঁচতে পারে। মীরাও মহাতবের চেষ্টাতে গ্রামবাসীরা প্রাণে বাঁচল। তাদের পুড়ে যাওয়া ঘরবাড়ি আবার নতুন করে তৈরি করে দিল সরকার। তাদের জন্য বাড়ির কাছাকাছি স্থানে পরিখা খনন করেও দেওয়া হল।

জুলাই মাস। বর্ষা নামল। বর্ষায় জাপানীদের পক্ষে ভারতের দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। জুলাই-এর মাঝামাঝি। ওয়ার্ধাতে শুরু হতে চলেছে কংগ্রেসের অধিবেশন। মীরাও মহাতব স্থির করলেন তাঁরা সেবাগ্রামে যাবেন-গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করবেন।

সেবাগ্রামে তখন জড়ো হয়েছে কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা। গান্ধী তাদের সঙ্গে নানার ব্যাপারে আলোচনা করে চলেছেন। তিনি ব্যস্ত। বলা চলে ভয়ানকভাবেই ব্যস্ত। গান্ধী তখন সুস্থ। মানসিক শক্তি যেন তাঁর দ্বিগুণ হয়ে গেছে। গান্ধী, এখন কংগ্রেসের একজন জাঁদরেল নেতার ভূমিকায়। গান্ধী সকলকে স্পষ্টই বলে দিলেন ব্রিটিশ যদি ভারতকে পূর্ণ স্বরাজ দিতে রাজি না হয় তাহলে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে সকলকেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

গান্ধীর কথা সকলেই শুনলেন। অনেকেই চিন্তিত। কি ঘটতে চলেছে তারা তা চিন্তা করে রেখেছে। তাই তারা খানিকটা থমকে গেছেন। সাতই এবং আটই আগস্ট ওয়ার্ধাতে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি-র মিটিং বসবে। চারদিকে সাজ সাজ রব। মীরা স্থির করলেন তিনি আবার উড়িষ্যা যাবেন। সেখানকার লোককে গান্ধীর সিদ্ধান্তের কথা বোঝাবেন। তাদের নিয়ে আন্দোলনের রাস্তা তৈরি করবেন। গান্ধী কিন্তু তাঁকে উড়িষ্যা যেতে বারণ করলেন। তিনি তাঁকে তাঁর বার্তা নিয়ে ভাইসরয় এর সঙ্গে দেখা করার জন্য দিল্লী যেতে বললেন। মীরা গান্ধীর নির্দেশ মেনে নিলেন। তখন ভারতের ভাইসরয় ছিলেন লর্ড লিনলিথগো। তখন জুলাই-এর মাঝামাঝি সময়।

মীরা দিল্লী চললেন। উঠলেন বিড়লা হাউসে। গান্ধী ভাইসরয়-এর জন্য একটা নোট তৈরি করেছিলেন। তিনি সেটা মীরাকে দিলেন। মীরা বিস্তারিত জানিয়ে ভাইসরয়-এর সঙ্গে সাক্ষাত করার আকাঙ্খা পরিজ্ঞাত করে একটা নোট পাঠালেন। পরদিনই ভাইসরয়-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ লিইট ওয়েট মীরাকে জানালেন যে ভাইসরয় মীরার সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত এবং সেই সিদ্ধান্তের বিষয়বস্তু গান্ধী যখন বিভিন্ন সংবাদ পত্রে জানিয়েছেন তখন গান্ধীর প্রতিনিধি হিসেবে ভাইসরয় মীরার সঙ্গে দেখা করতে অপারগ। বিশেষত গান্ধী যখন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ্য বিদ্রোহের ডাক দিতে চলেছেন। তাই মহামান্য ভাইসরয় মহোদয়ের ইচ্ছে মীরা যেন ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ লিইট ওয়েট এর সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলেন।

ভাইসরয়-এর বক্তব্য মীরা তখনকার মত মেনে নিতে বাধ্য হলেন। মীরা বিকেল তিনটায় মিঃ লিইট ওয়েট এর সঙ্গে দেখা করলেন। গান্ধীর নির্দেশমত বিস্তারিত আলোচনা করলেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। তারপর বাপুর কাছে সম্পূর্ণ একটা রিপোর্ট পাঠালেন। মীরা বাপুকে লিখলেন যে তিনি প্রথমেই মিঃ লিইট ওয়েট কে বুঝাতে চাইলেন যে গান্ধীজি অতীব চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদী লোক। তিনি ইচ্ছে করলে গান্ধীজিকে অতীব সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে পারেন তাদের কাজে। গান্ধীজির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে মাননীয় ব্রিটিশ সরকার বর্তমানে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারেন। যদি ইংরেজ রাজের সৎইচ্ছে থাকে।

মীরা লিইট ওয়েট কে তখন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখালেন কেন ভারতবাসী আজ ব্রিটিশবিরোধী চরম আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন। মীরা এটাও তাঁকে বুঝালেন যে ভারতের সাধারণ জনগণ যথেষ্ট সহনশীল, তাদের সঙ্গে মীরা একজন খাঁটি ইংরেজ রমনী হিসেবে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশছেন ব্রিটিশরাজ দয়াপরবশ হয়ে তাদের মনের কথা বুঝতে চেষ্টা করলে এবং স্বাধীনতা দানে স্বীকৃত হলে উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে সমস্ত সংঘাতের অবসান ঘটবে।

আর সরকারবাহাদুর যে ভাবে ভারতবাসীর সঙ্গে ব্যবহার করে চলেছেন তা যদি চলতে থাকে তাহলে জাপানী সৈন্য উড়িষ্যার উপকুল ভাগ দিয়ে ভারতের মাটিতে পা দিলে উড়িষ্যার কৃষক সম্প্রদায় জাপানীদের সাদরে গলায় মালা দিয়ে তাদের বরণ করবে। তাতে ইংরেজ সরকারকে গভীর বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। মীরা প্রশ্নের সুরে লিইট ওয়েট কে জিজ্ঞেস করলেন যে ভাইসরয়ের কাউন্সিলের নাইটস এবং ব্যারনদের এরপর কি কিছু করার থাকবে? মীরা নিজেই বলে গেলেন যে তাদের কিছুই করার থাকবে না।

মীরা দৃঢ় কণ্ঠে জানালেন যে ভারতের জনগণ এবং তাদের নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ব্যাপারে সরকারের তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত জানতে চান। মীরা লিইট ওয়েট-কে আরও জানালেন যে জাপানের হাত থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হল ইংরেজ কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে আশু সিদ্ধান্ত নেওয়া। লিইট ওয়েট কে মীরা দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারেন একমাত্র গান্ধীজি স্বয়ং। এবং তিনিই তাঁকে সঠিক পথের সন্ধান দেবেন।

মীরা বললেন যে তিনি লিইট ওয়েট এর প্রচুর সময় নষ্ট করেছেন-তবে পরিশেষে মীরা তাঁকে বললেন ইংরেজ সরকার ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত না নিলে গান্ধীজি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে চরম আন্দোলনে নামবেন এবং "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের ডাক দেবেন।

মীরা বলে চললেন ইংরজে সরকারের কোন শক্তি তাঁকে প্রতিহত করতে পারবে না। যতই গান্ধীজির উপর তারা বল প্রয়োগ করবে ততই তাঁর শক্তি বেড়ে যাবে। কোন কিছুতেই তারা গান্ধীজিকে চুপ করাতে পারবে না। তবে গান্ধীজিকে প্রতিহত করার দু'টি উপায়ের কথা মীরা বললেন-প্রথমটি হচ্ছে ভারতকে স্বাধীনতা দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া তা যদি তারা না করতে চান তাহলে গান্ধীজিকে গুলি করে মারতে হবে। এ দু'টি পথ ভিন্ন অন্য কোন

পথে গান্ধীজিকে প্রতিহত করা যাবে না। তবে গান্ধীজির মৃত্যু ঘটলে ভারতে যে গণজাগরণ ঘটবে সে জাগরণ বন্ধ করার সাধ্য ভারতসরকারের নেই। গণজাগরণের আগুনে ভারতসরকার জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। তাই বর্তমান ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোকে ভারতবর্ষ শাসনের ব্যাপারে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে এর আগে কোন ভাইসরয়কে এ রকম সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়নি।

মীরার কথা শুনে লিইট ওয়েট বেশ খানিকটা গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করতে পারলেন। মীরা বিদায় নেবার পূর্বে লিইট ওয়েট কে জিজ্ঞেস করলেন যে কমাণ্ডার ইলন চার্জ, জেনারেল ওয়েভেল ও ভারতের বর্তমানের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিকে কি এড়িয়ে যেতে চান। লিইট ওয়েট জানালেন যে জেনারেল ওয়েভেল বর্তমানে দিল্লী নেই। তবে মীরা ইচ্ছে করলে ডেপুটি কম্যান্ডার ইন চিফ জেনারেল হার্টলির সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

মীরা জেনারেল হার্টলির সঙ্গে দেখা করলেন। মীরাকে অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে হার্টলি গ্রহণ করলেন। চায়ের টেবিলে জেনারেল হার্টলি তাঁর স্ত্রী এবং মীরা। বহুক্ষণ গম্ভীরপরিবেশে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হলো। মীরা সুনিপুণভাবে গান্ধীজি তথা ভারতবাসীর অন্তরের কথা হার্টলিকে জানালেন। হার্টলি মীরার প্রতিটি কথার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন। মীরাকে বললেন যে হার্টলি জেনারেল মোলেসওয়ার্থ-এর সঙ্গে আলোচনা করবেন। এবং মীরাকে অনুরোধ করলেন জেনারেল মোলেসওয়ার্থকে যেন বিড়লা হাউসে চায়ের আসরে তিনি আমন্ত্রণ জানান।

মীরা বিড়লা হাউসে বেশ কিছুদিন কাটাবেন স্থির করলেন। এর মধ্যে মীরা জেনারেল হার্টলির একখানা চিঠি পেলেন তাতে হার্টলি লিখেছেন জেনারেল মোলেসওয়ার্থ ২৯ শে মীরার সঙ্গে বিড়লা হাউসে চায়ের আসরে কথাবার্তা বলবেন। মোলেসওয়ার্থ নির্দ্দিষ্টদিনে মীরার সঙ্গে দেখা করলেন। চায়ের টেবিলে দু'জনের মধ্যে কয়েকঘন্টা আলোচনা হল। মীরার মনে এ ধারণা জন্মাল যে ভারতের ইংরেজ সামরিক বাহিনীর সর্বোচ্চ কর্মকর্তার সঙ্গে ভারতীয় জনগণের প্রতিভূ হিসেবে তিনি কথাবার্তা বলে সমস্যা সমাধানের একটা উপায় বের করতে পারবেন।

উনত্রিশ

এরপর মীরা ছুটলেন বম্বে গান্ধীর নির্দেশে। অলইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মিটিং এ তাঁকে উপস্থিত থাকতে হবে। তিনি প্রথমে গেলেন বম্বের বিড়লা হাউসে সেখানে রয়েছেন বাপু। বাপুর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হলো। মীরা মহাদেবের সঙ্গেও কথা বললেন।

মহাদেব মীরাকে বললেন বাপু কংগ্রেস সদস্য ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের জন্য তাঁর নির্দেশ সম্বলিত একটা ড্রাফট্ তৈরি করেছেন। এই ড্রাফট কংগ্রেস কমিটির মিটিং-এ পেশ করা

হবে। সরকারের সঙ্গে বাপু অবশ্য সরসরি কথাবার্তাও বলবেন। তাদের মনোভাব আরও পরিষ্কারভাবে জানতে চান বাপু। সরকার বাহাদুর যদি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে একটা সমঝোতা করে নেন তাহলে ত কোন কথা নেই আর যদি তা না করে তাহলে বাপু তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী "ভারত ছাড়ো" আন্দোলন আরম্ভ করবেন। তবে এই আন্দোলনের পদ্ধতি হবে অহিংসা, অসহযোগ ও আইন অমান্য।

তিনি প্রথমে হরতালের ডাক দেবেন। অ্যাসম্বলি ও পৌরসভায় যে সমস্ত কংগ্রেস সদস্য ও সদস্যা কাজ করছে তাদের কাজে ইস্তফা দিতে বলবেন। সরকারকে কর দেওয়া বন্ধ করতে হবে। আইন ভঙ্গ করে গ্রামে গ্রামে লবণ তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে যুদ্ধোপকরণ তৈবি হচ্ছে সেগুলিকে যতদিন প্রয়োজন ততদিন চালিয়ে যেতে দিতে হবে।

গান্ধীর মতামত সম্বলিত ড্রাফট দেওয়া হল ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এ আলোচনার জন্য। সভাস্থলের বাইরে লোকের ভিড় যেন উপচে পড়ছে। তিলধারনের জায়গা নেই। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গান্ধীজি ও অন্যান্য নেতাদের যথাস্থানে পৌছে দিল। উপস্থিত সকলেই উত্তেজনায় টান টান। সকলের মুখেই এককথা চরম সিদ্ধান্ত তারা জানতে চায়। তারা আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করতে নারাজ। প্রথম দিনের মিটিং আলাপ আলোচনার মধ্যে কেটে গেল।

দ্বিতীয়দিন অর্থাৎ ৮ই আগস্ট, ১৯৪২ মিটিং চলল রাত এক টা পর্যন্ত। বাইরে অপেক্ষারত জনতা উত্তেজনায় টান টান। অল্পসংখ্যক কমিউনিস্ট ছাড়া সবাই বিপুল সংখ্যাধিক্যে ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। প্রস্তাব গ্রহণের অব্যবহিত পরেই গান্ধীজি এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে চলে বক্তার বক্তৃতা। তিনি বললেন, "এখন থেকে আপনারা নিজেদের একজন স্বাধীন নারী বা পুরুষ বলে জানবেন এবং একজন স্বাধীন মানুষের মতই আচরণ করবেন। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার চেয়ে কম কিছু নিয়ে আমি সন্তুষ্ট হব না।... আমরা করব অথবা মরব। আমরা হয় ভারতকে স্বাধীন করব নতুবা সেই চেষ্টায় মৃত্যু বরণ করব।" তবে তিনি নির্দেশ দিলেন আন্দোলন হবে অহিংস। আন্দোলন যাতে হিংস্ররূপ ধারণ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

এমন সময় টেলিফোন বাজল। মহাদেব ছুটল টেলিফোন ধরতে টেলিফোন করেছেন গান্ধীর জনৈক পাঞ্জাবী বন্ধু। জানতে চেয়েছেন বাপু কি কারাগারে। তিনি খবর পেয়েছেন বাপু কারারুদ্ধ হতে চলেছেন। বাপুকে মহাদেব কথাটা জানালেন। বাপু বললেন না না সেটা হতে পারে না। বাপু সেই রাতটা আরামে ঘুমোলেন।

মীরা চলে গেলেন কোনার এক ঘরে তাঁর দেহ ক্লান্ত, বলা চলে খুবই ক্লান্ত। মীরা অঘোরে ঘুমচ্ছেন। কখন যে সকাল হয়েছে তা মীরা জানেন না। ঘন্টা তিনেক ঘুমোলেন তিনি। হঠাৎ এক অচেনা কণ্ঠের চিৎকার শুনে মীরা স্তব্ধ। মীরাকে চিৎকার করে কে যেন বলে গেল। "Good news for you. You are arrested along with Bapu and Mahadev, and you are got to be ready within twenty minites."

মীরা তাড়াহুড়ো করে শয্যা ত্যাগ করলেন। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলেন। চললেন বাপুর কাছে। বাপুর প্রার্থনা সভা তখন সমাপ্ত প্রায়। মহাদেব বাপুর পাশে দাঁড়িয়ে। চারিদিক পুলিশে

পুলিশে পূর্ণ। পুলিশ অফিসার মীরাকে দেখলেন। তাঁর হাতে ᵃ st warrant খানা ধরিয়ে দিলেন। এর পর গান্ধীজিকে এবং মহাদেবকে ধরিয়ে দিলেন ᵃস্ট ওয়ারেন্ট।

গান্ধী, মহাদেব এবং মীরা ধীরে ধীরে পুলিশ ভ্যানের দিকে .গালেন, তাঁরা তিনজনই পুলিশ ভ্যানে উঠলেন। তখন রাত শেষ হয়নি। ভ্যানের দরজা গে বন্ধ হয়ে। গাড়ি ছুটলো। এগোতে লাগল ভিক্টোরিয়া টার্মিন্যাসের দিকে। তখন দেখা গেল ঊষার আলো। জায়গাটা ছিল ভয়ঙ্কর নির্জন। গাড়ির পেছনে বসেছিল দু'জন পুলিশ অফিসার।

গাড়ি এলো পুনা স্টেশনে। কয়েকজন পুলিশ অফিসার আর স্টেশনের কিছু কুলি ব্যতিরেকে রাস্তায় সাধারণ লোকজনের চিহ্নমাত্র নেই। হায়ত কেউ বুঝতে পারেনি বা খবর পায়নি এরকম নিশুতি রাতে গান্ধীজি এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতাকে এরেস্ট করে জেলে নিয়ে যাবে।

পুনা স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল একখানা ট্রেন। মীরা, গান্ধী ও মহাদেব এই তিনজনকে একটি ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে উঠতে নির্দেশ দিল পুলিশ অফিসার। ধীরে ধীরে পেছনে এসে পৌঁছাল আরও বহু পুলিশ ভ্যান। প্রতিটিতে রয়েছে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। জওহর, বল্লভভাই, আজাদ ও আরও অনেকে। এভাবে সব জনপ্রিয় কংগ্রেস নেতাকে রাতারাতি গ্রেপ্তার করা হলো।

জনসাধারণকে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার মত প্রথম সারির প্রায় কোন নেতাই বাইরে রইলেন না। ব্রিটিশ সরকার যেন ভয়ে সন্ত্রস্ত। সরকার কংগ্রেস নেতাদের বন্দি করে গান্ধীর ডাকা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের গতিকে স্তব্ধ করে দেবে।

গান্ধীজি সরকারের এ সমস্ত কার্যকলাপ জেনে চিন্তিত। তিনি নীরবে সব কিছু পর্যালোচনা করছেন। অসাধারণ তাঁর সহনশীলতা। গান্ধীজির এবার দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে ব্রিটিশ শক্তির হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার জন্য সমগ্রজাতি মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হবে।

মীরা ট্রেনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। লক্ষ্য করছেন সব কিছু। এর মধ্যে যে সমস্ত কংগ্রেস নেতাকে নিয়ে আসা হয়েছে তাঁদের সঙ্গে মীরা কথা বললেন। তাঁদের মনোভাব খনিকটা বুঝতে পারলেন। তিনি বুঝতে পারলেন প্রায় প্রত্যেক কংগ্রেস নেতার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন 'করেঙ্গি অথবা মরেঙ্গি'। এভাবে আরম্ভ করতে হবে। নচেৎ ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়বে না। এবং এটাই প্রকৃষ্ট সময়। এই কথাই সুভাষচন্দ্র বার বার কংগ্রেস নেতাদের বুঝাতে চেয়েছিলেন ভারতে তিনি যখন ছিলেন তখন। বিদেশে চলে যাবার পর আজ গান্ধীসহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা সুভাষচন্দ্রের কথার গুরুত্ব অনুভব করতে পারছে।

মীরা তাঁর রেলের কামরার সামনে একজন পুলিশ অফিসারকে দেখতে পেলেন। তাকে তিনি স্পষ্ট জিজ্ঞেস করলেন গ্রেপ্তার করে সব কংগ্রেস নেতা সহ তাঁকে কোথায় পাঠানো হচ্ছে।

পুলিশ অফিসারটি ছিল সি. আই. ডি ডিপার্টমেন্টে কর্মরত। মীরার কথার কোন সোজাসুজি উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না তিনি। তবে একটা কথা বললেন তাকে কোথায় পাঠানো হবে সেই লিস্ট তৈরি। কিছু সময় পরে মীরা এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

এর মধ্যে জওহরলাল, বল্লভভাই, আজাদ এসে বাপুর সঙ্গে দেখা করলেন। কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে পরবর্তী কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করলেন। ট্রেনের প্রতি বগি তখন বন্দি ভর্তি। একটি বগিও খালি নেই। সকলেই চিন্তামগ্ন। এদিকে কংগ্রেস নেতাদের বন্দি করার আগে নেতাদের সব টেলিফোন লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। যাতে কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীবৃন্দ নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের কোন সুযোগ না পায়।

নেতাদের নিয়ে ভর্তি রেলগাড়ি ছাড়ল যথাসময়ে। এসে উপস্থিত হল কল্যান স্টেশনে। সেইখানে তাঁদের জন্য প্রাতরাশের ব্যবস্থা ছিল। বেশ ভালো ব্যবস্থা। সুখাদ্য। ভিটামিন যুক্ত। কিন্তু বাপুর জন্য আলাদা কোন খাবারের ব্যবস্থা হয়নি। তাই মীরা ছুটলেন অফিসারের কাছে। বাপু বলেদিলেন মীরা যেন সকলের জন্য যে খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে সেখান থেকে কিছু খাবার তাঁর জন্য নিয়ে যান। মীরা শেষ পর্যন্ত তাই করলেন। সকলেই প্রাতঃরাশ খেয়ে তৃপ্ত। তবে তাঁদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই সম্পর্কে কেউ কিন্তু জানতে পারছেন না।

তাঁরা সকলেই একটা জিনিস অনুমান করে রেখেছেন যে গাড়ি যখন পুনা লাইন ধরে যাচ্ছে তাহলে তাঁদের যারবেদা জেলে নিয়ে যাওয়া হবে। এমন সময় দেখা গেল একজন দায়িত্ব শীল সি. আই. ডি. অফিসারকে। তাঁর হাতে রয়েছে বন্দিদের কাকে কোথায় পাঠাবে তার লিস্ট। সেই তালিকায় দেখা গেল বাপুর সঙ্গে থাকছেন মীরা, মহাদেব আর সরোজিনী নাইডু। বাপুর খাওয়া-দাওয়া, দেখাশোনা-এককথায় বলা চলে পরিচর্যার দায়িত্বে থাকবেন মীরা।

তারপর সি. আই. ডি. অফিসারটি বন্দিদের তালিকা হাতে অন্য কম্পার্টমেন্টে গেলেন। সেখানকার তালিকা দেখে কাকে কোথায় পাঠাবেন সব স্থির করে ফেললেন। রেলগাড়ি পুনা স্টেশনের আগে এসে একটা ছোট স্টেশনে দাঁড়ালো। সেখানে বম্বের অধিবাসি কংগ্রেস নেতাদের নামতে বলা হল। তাঁরা পুলিশ অফিসারের নির্দেশমত সকলেই নামলেন। তাঁদের পুলিশ ভ্যানে তোলা হল। তবে তাঁদের নিয়ে পুলিশ ভ্যান কোথায় যাচ্ছে সেই ব্যাপারে কোন কিছু জানা গেল না।

মীরা, গান্ধী, সরোজিনী ও মহাদেবকে অন্য একটি ভ্যানে তোলা হল। ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য কংগ্রেস সদস্যদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে সেই সম্বন্ধে কিছুই জানা গেল না। গান্ধীজিদের প্রিজন ভ্যান চলতে আরম্ভ করল। গান্ধী, মীরা, নাইডু-অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের জন্য চিন্তিত। হঠাৎ দেখা গেল তাঁদের ভ্যানের সামনে দিয়ে চলেছে আর একটা প্রিজন ভ্যান। সেখানে রয়েছে কৃপালিনীজি সহ অন্য কয়েকজন কংগ্রেস নেতা। কৃপালিনীজি হাত নেড়ে তাঁদের গমন বার্তা জানালেন। মীরা তা লক্ষ্য করলেন। মীরাও হাত নেড়ে তাঁকে জবাব দিলেন। তারপর মীরা গান্ধী-এঁদের ভ্যানের গতিপথ বাঁক নিল যারবেদা জেলের দিকে। আর কৃপালিনীজিদের ভ্যান যে কোন দিকে ছুটে চলল তা ঠিক বুঝা গেল না।

মীরা উৎসুক কোথায় তাঁদের নিয়ে যাচ্ছে তা জানার জন্য। বাপু স্থির। চুপচাপ বসে আসেন। মনে হচ্ছে মৌনব্রত গ্রহণ করেছেন। মীরা লক্ষ্য করলেন তাঁদের ভ্যান যারবেদা জেল অতিক্রম করে সম্মুখ পানে এগিয়ে যাচ্ছে। কিছুদুর গিয়ে ভ্যানের গতি স্তব্ধ হলো।

মীরা সবই নিবিষ্টমনে অবলোকন করছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মীরার উৎকণ্ঠার অবসান ঘটল। তিনি আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর শরীরের প্রতিটি লোমকূপ যেন খাড়া হয়ে গেল। এক অনাবিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেন তাঁর চোখদু'টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মীরা দেখলেন এক অপূর্ব রাজপ্রাসাদের সামনে তাঁদের ভ্যানটি দাঁড়াল।

বিশাল এলাকায় অবস্থিত প্রাসাদটি। অসাধারণ তার প্রাকৃতিক পরিবেশ। সবুজের সমারোহ প্রাসাদটিকে যেন অনিন্দসুন্দর করে তুলেছে। মীরা মহাদেবের কাছে প্রাসাদটির নাম জানতে চাইলেন। মহাদেব বললেন এটা 'আগাখাঁ'র পুনা প্রাসাদ। এখন ব্রিটিশ সরকার এটাকে প্রথমসারির রাজনীতিবিদদের জেলখানা হিসেবে ব্যবহার করছেন।

আগা খাঁ ছিলেন একজন বিশাল বিত্তসম্মন্ন পারস্যবাসী। তাঁর আসল নাম হাসান আলি শাহ। আগা খাঁ তাঁর পাওয়া উপাধি। উপাধিটি পারস্যরাজের দেওয়া। এই উপাধিটি বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। হাসান আলির জন্ম ১৮০০ সালে। তিনি ছিলেন পারস্যরাজের জামাতা। এবং হজরত মহম্মদের জামাতা আলির বংশে তাঁর জন্ম। মুশ্লিমদের ইসমাইলাইট সম্প্রদায়ের প্রধান তিনি। তিনি পারস্যের একটি প্রদেশের গভর্ন জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে রাজরোষে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হন। চলে আসেন ভারতে। ব্রিটিশ সরকারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বম্বেতে স্থায়ী আস্তানা স্থাপন করেন। ইংরেজের একান্ত অনুগত বন্ধুরূপে পরিচিতি লাভ করেন ভারতবাসীর কাছে। অ্যাংলো শিখ এবং অ্যাংলো আফগান যুদ্ধের সময় তিনি ও তাঁর অনুগত ইসমাইলাইট সম্প্রদায় ইংরেজদের প্রভূত সাহায্য করে। আফগানিস্থান ও সিন্ধুপ্রদেশে ইংরেজ আধিপত্য স্থাপনের জন্য তিনি বিশেষভাবে সহায়তা করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ছিলেন ইংরেজদের অকৃত্রিম সুহৃদ। সিন্ধুপ্রদেশ, আফগানিস্তান, আরব, মধ্য এশিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি দেশেও তিনি ইস্‌মাইলাইট বা ইস্‌মাইলিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তার প্রয়ান ঘটে।

প্রথম আগা খাঁর পৌত্র (আগা খাঁ তৃতীয় ১৮৭৭-১৯৫৭) ভারতের মুশ্লিম লীগের সভাপতি ছিলেন। ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইন প্রণয়নে এবং বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি ছিলেন ইংরেজ সরকারের অন্যতম সমর্থক। (১৯৩০—১৯৩১) ইংলন্ডে রাউন্ড টেবেল কনফারেন্সে তিনি ছিলেন ব্রিটিশের প্রতিনিধি। ১৯৩২ সালে তিনি বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সভার সদস্য ছিলেন। ইংরেজদের হাত থেকে মুশ্লিমদের বিশেষ সুযোগ সুবিধে আদায়ে তার এক বিশাল ভূমিকা ছিল।

পুনার এই আগা খাঁর প্রাসাদটি এখন গান্ধীজির জেলখানা। এখানকার জেল সুপার একজন পার্শি। নাম মিঃ কাটেলী। মীরা তাঁর সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করলেন। সুপার গান্ধী, মীরা, নাইডু ও মহাদেবকে সমস্ত কথা বললেন। তাঁদের কোথায় রাখা হবে তাও দেখাতে নিয়ে গেলেন। নিচের বিশাল টানা বারান্দা যুক্ত অনেকগুলো ঘর। সুপারের পরামর্শমত প্রত্যেকে কামরা বেছে নিলেন। মীরা বাপুর খাবারের ব্যাপারে চিন্তিত। ছাগলের দুধ-কোথায় পাওয়া যাবে সেই চিন্তায় মীরা দুশ্চিন্তা গ্রস্ত। বাপুর ছাগলের দুধের কোন ব্যবস্থা সেখানে আছে কিনা সেটা সুপারকে মীরা জিজ্ঞেস করলেন। সুপার মীরাকে স্পষ্টতই জানিয়ে দিলেন সেই ব্যবস্থা অনেক আগেই করে রাখা হয়েছে।

ধীরে ধীরে তাঁরা সকলেই আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দি জীবন যাপনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিলেন। মীরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন। তিনি দেখলেন প্রাসাদের অভ্যন্তরে বিশাল বাগানের গাছগুলি প্রকৃতির অকৃপণদানে অপরূপ সব ফুলে ফলে ভরে গেছে। সঙ্গে পাখির কাকলি আর অদূরে দেখা যাচ্ছে সবুজ পাহাড়ের সারি। মনমাতানো দৃশ্যে মীরার হৃদয় মন আবিষ্ট। কিছুক্ষণ তিনি প্রাণমন দিয়ে এই অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করলেন।

তবে বেশিক্ষণ এই অনুভূতি তাঁর হৃদয়মনকে আবিষ্ট রাখতে পারল না। সুপার তাঁদের স্পষ্টত জানিয়ে দিলেন যে সরকারের নির্দেশে বন্দিজীবনে তাঁদের কোন সংবাদপত্র পড়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। বাইরের কারুর সঙ্গে চিঠিপত্র আদান প্রদান করতে তাঁরা পারবেন না। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন তাঁদের যাপন করতে হবে। কেবলমাত্র সরকারিসূত্রে কিছু কিছু খবর তাঁরা পাবেন। এর বেশি কিছু তাঁরা পাবেন না। এদিকে বাপু, মীরা এঁরা অনুমান করছে বম্বে সহ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় চলছে নেতাহীন বিপ্লব। আর ইংরেজরা চালাচ্ছে সাধারণ মানুষের উপর অসহনীয় অত্যাচার।

সাধারণ মানুষকে নেতৃবৃন্দ কোন নির্দেশ দেবার সুযোগ পাননি। নির্দেশের অভাবে তাঁরা দিশাহারা। কি করবেন কোন পথে আন্দোলন চালাবেন তাও স্থির করতে পারছে না।

বাপু সহ মীরাদের নিয়ে আসার তিনদিন পরের ঘটনা। মীরা তাঁর ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছেন। হাঠাৎ তিনি কয়েকজনের পায়ের শব্দে বিচলিত হয়ে উঠলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলেন কস্তুরাবা ও সুশীলাকে নিয়ে এক পুলিশ অফিসার ও জেল সুপার এসে হাজির। মীরা উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটাচ্ছিলেন এতক্ষণ। কস্তুরাবা'র জন্যও তাঁর চিন্তার অন্ত নেই। কস্তুরাবা-কে দেখে মীরা আনন্দে কেঁদে ফেললেন. পরে অবশ্য তিনি নিজেকে কোনরকমে সামলে নিলেন। মীরা কস্তুরাবা ও সুশীলাকে নিয়ে বাপু সকাশে গেলেন। কস্তুরাবা ও সুশীলা বললেন বাইরের অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক।' সাধারণ লোক ইংরেজদের সীমাহীন অত্যাচারে জর্জরিত। সভাসমিতি সব বন্ধ। বম্বেতে বিপ্লবীদের এক সভায় পৌরোহিত্য করার কথা ছিল তাঁর। সুশীলাকে নিয়ে তিনি সেই সভাস্থলে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি ও সুশীলা গ্রেপ্তার হলেন। প্রথমে বুঝতে পারেননি বন্দি করে তাঁকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ক্রমেই তিনি বুঝতে পারলেন বাপুর সঙ্গে একই জেলে তাঁকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ।

কস্তুরাবা বলে চললেন সমস্ত ভারতে বিপ্লব কি গতিতে চলছে সেই ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত নন। তবে ভারতের আকাশবাতাস যে বিপ্লবের লেলিহান বহ্নিশিখায় বিদারিত তা তিনি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন। হাজার হাজার বিপ্লবী ইংরেজ পুলিশের বেয়নেটের খোঁচায়ও গুলির আঘাতে যে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে কিংবা পঙ্গু হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে সেই ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। নেতৃত্বহীন এই বিপ্লবী আন্দোলনে জনগণ দিশাহারা।

কথা শুনে বাপুর চোখ বেদনায় ছলছল করতে লাগল। সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি সেদিনই ভাইসরয়-কে চিঠি দেবেন। মহাদেবকে কাছে ডাকলেন। তাঁকে বাপু ড্রাফট তৈরি করতে বললেন। বাপুর নির্দেশমত মহাদেব কালি কলম নিয়ে বসলেন। বাপু বলে যেতে লাগলেন।

মহাদেব বাপুর প্রতিটি কথা সুন্দরভাবে লিখে যেতে লাগলেন।

বাপু ভাইসরয়কে জানিয়ে দিলেন ভারতসরকার আন্দোলন দমনে যে পথ বেছে নিয়েছেন তা অতীব নৃশংস। সরকার আন্দোলন দমনে যে ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং নিচ্ছেন সেই সম্পর্কে ভাইসরয় সাফাই গাইতে পারেন তবে এ ব্যবস্থাকে যুক্তিযুক্ত মনে করা যায় না। কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি ভারতসরকারের বর্তমান আন্দোলন দমনে এই নীতিজ্ঞানহীন ব্যবস্থাকে সমর্থন জানাতে পারেন না। কংগ্রেস ভারত সরকারের কাছে ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে যে প্রস্তাব দিয়েছে তা অতীব যুক্তিযুক্ত ও বিধিসম্মত। কংগ্রেসের এ প্রস্তাবে কিছু ভুল ত্রুটি থাকলেও সেগুলোকে সংশোধন করা হয়েছে। বাপুর অনুরোধ ভাইসরয় যেন কংগ্রেসের পাঠানো প্রস্তাবটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার বিবেচনা করেন। সরকার বাহাদুরের যদি এ ব্যাপারে কোন কিছু বলার থাকে তাহলে বাপুর সঙ্গে আলোচনার জন্য ভাইসরয় যেন ব্যবস্থা করেন। বাপু ভাইসরয়কে জানালেন যে ইংরেজের সঙ্গে পুনরায় অকৃত্রিম বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে তিনি সম্মত।

বাপু এর মধ্যে ঠিক করে রেখেছেন ভাইসরয় তাঁর চিঠির উত্তর না দিলে বা তাঁর কথা অনুযায়ী ভাইসরয় যদি তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসতে অনীহা প্রকাশ করেন তাহলে তিনি আমরণ অনশন আরম্ভ করবেন। বাপুর চিঠিখানা জেল সুপার মিঃ কাটেলির হাতে দিলেন। এবং বলে দিলেন চিঠিখানা যেন অবিলম্বে ভাইসরয়-এর কাছে পৌঁছে যায়। বাপু ভাইসরয়-এর চিঠির উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছেন।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মীরা মহাদেবের ঘরে ঢুকলেন। হাতের কাছে পেয়ে গেলেন একখানা বই। বইখানার উপর মীরা চোখ বুলাচ্ছিলেন। মহাদেব মীরাকে বললেন যে তিনি খুবই উৎকণ্ঠার মধ্যে আছেন। কেননা ভাইসরয় যদি বাপুর চিঠির উত্তরে সম্মতিসূচক কিছু না বলেন তাহলে বাপু আমরণ অনশন শুরু করবেন। বাপুকে কেউ তখন নিবৃত্ত করতে পারবেননা। মহাদেব তাই খুবই চিন্তিত। এই চিন্তা মহাদেবের শরীরে ও মনে কঠোর আঘাত হানছে। মহাদেব মীরাকে আরও বললেন এই চিন্তা হয়ত তাঁকে গুরুতর অসুস্থ করে তুলবে। মীরা জানেন বাপু এবার অনশন শুরু করলে তাঁকে বাঁচনো যাবে না। মহাদেবও সেই ভয়ে ভীত। মহাদেব বাপুকে এতই ভালবাসেন যে মহাদেব চান বাপুর ভয়ঙ্কর কিছু হয়ে যাবার আগে তিনি যেন পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে পারেন। মীরা মহাদেবের এরকম মানসিক অবস্থা এবং বাপুর প্রতি তাঁর আসক্তির কথা ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পারছেন। তাই এরকম এক সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে কি যে ঘটতে যাচ্ছে তা ভেবে মীরা ও অন্যান্যরা গভীরভাবে চিন্তামগ্ন।

নানান দুশ্চিন্তার মধ্যে মীরা সেই রাতটা কোনক্রমে কাটালেন। পরদিন সকালে তিনি বাপুর ঘরে যাবার জন্য. বারান্দা দিয়ে হাঁটা আরম্ভ করলেন। বাপুর ঘরে যাবার আগেই মহাদেবের ঘর। মহাদেব তখন ঘরে দাঁড়ি কাটছিলেন। মীরাকে দেখে মহাদেব ডাকলেন। মহাদবের চোখে মুখে তখন ক্লান্তির ছাপ। মীরা মহাদেবকে দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠলেন। কিছুই বললেন না। মহাদেব মীরার কাছে একটা নখকাটার যন্ত্রচাইলেন। মীরা আবার তাঁর ঘরে ফিরে গেলেন। যন্ত্রটা নিয়ে এসে মহাদেবকে দিলেন। মহাদেব সবে নেইলকাটার দিয়ে একখানা নখ কেটেছেন সেই মুহূর্তে কস্তুরাবা এবং সুশীলা দেখলেন Inspector General

of Prisons আসছেন বাপুর সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে জেল সুপার Mr. Kateley. সরোজিনী দেবীর সঙ্গে প্রথমে কিছু কথা বলার জন্য তাঁরা তাঁর ঘরে ঢুকলেন।

মীরাকে সুশীলা ডেকে বাপুকে খবরটা দিতে বললেন। মীরা বাপুর ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। তবে মীরা মহাদেবকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন বাপুর সঙ্গে Inspector General কথা বলার সময় উপস্থিত থাকেন।

মীরা মাত্র দু'তিন হাত অগ্রসর হয়েছেন এমন সময় কস্তুরাবা চিৎকার করে উঠলেন। মহাদেবের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। মীরা প্রথমে ভাবলেন মহাদেবকে আগন্তুকদের সম্পর্কে কিছু বলার জন্য ডাকছেন। মীরার ভুল ভাঙ্গল যখন কস্তুরাবা আবার অস্থির কণ্ঠে মহাদেবকে ডাকলেন। সেই ডাক শুনে মীরা ফিরে এলেন মহাদেবের ঘরে। মহাদেব তখন জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেছেন। কস্তুরাবা ও সুশীলা তাঁর চোখে মুখে জলের ছিটে দিতে লাগলেন। বাপু তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। মহাদেবের দু'গালে আস্তে আস্তে কয়েকটা চড় মারলেন। কিন্তু বৃথা এ প্রচেষ্টা। ততক্ষণে জেল সুপার ও Inspector General মহাদেবের ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। বাপু মহাদেবের মাথাখানা নিজের কোলের উপর রাখলেন। ডাক্তার ডাকা হল। সবই বৃথা মহাদেবের নিষ্প্রাণ দেহখানি পড়ে রইল এই ধরাতলে। তাঁর আত্মা মিলিয়ে গেল পঞ্চভূতে। দেহখানি পড়ে রইল অবশ্য খানিক সময়ের জন্য।

সকলের চোখে জল। বাপু স্তব্ধ। একটি কথাও তাঁর মুখ থেকে বের হল না। ফ্যাল ফ্যাল করে মহাদেবের নিষ্প্রাণ দেহখানির দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষনিকের জন্য। কস্তুরাবা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। বললেন, বাপু তাঁর দক্ষিণহস্ত এবং বামহস্ত একই সঙ্গে হারালেন। বিধাতার কি ইচ্ছে তা সাধারণ মানুষের চিন্তার অতীত।

Inspector General এবং জেল সুপার পুরোহিত নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিলেন। মহাদেবের নিষ্প্রাণ দেহখানি স্নানাগারে নিয়ে যাওয়া হল। হিন্দুরীতি অনুযায়ী দেহটাকে জলদিয়ে ভালকরে স্নান করানো হল। পুরোহিত এলেন। নিয়ে আসা হল মৃতদেহ বহন করার জন্য খাটিয়া। জেল কর্তৃপক্ষ ফুল ও ফুলের মালার ব্যবস্থা করলেন। তবে তাঁকে কোথায় পোড়ানো হবে সেই জায়গাটা স্থির করতে বেশ কিছু সময় লেগে গেল। মহাদেব ছিলেন গান্ধীর সন্তানতুল্য। মহাদেবের মুখাগ্নিও করবেন বাপু। তবে পোড়াবার জায়গা স্থির হল প্রাসাদ চত্বরের ঘেরা জায়গার একটুখানি বাইরে। সেদিকটা নদী ও পাহাড় পরিবেষ্টিত। সেখানে কোন জনবসতি নেই। কেন না জেল সুপার ও ইনস্পেক্টর জেনারেল ভাইসরয়-এর নির্দেশ ছাড়া গান্ধীকে এক পা ও প্রাসাদের বাইরে যেতে দিতে পারেন না।

মীরা, বাপু ও কস্তুরাবা-মহাদেবের দেহে মালা দিলেন। দিলেন পুষ্পস্তবক। বাপু মাথার কাছে বসে অনবরত গীতা পাঠ করে যাচ্ছিলেন। পুরোহিত যথারীতি হিন্দুরীতি অনুযায়ী মৃতদেহ দাহ করার আগে মন্ত্রউচ্চারণ করলেন। খাটিয়ায় রাখা ছিল মহাদেবের মরদেহ। সফেদ চাদরে ঢাকা নিষ্প্রাণ দেহ। মুখখানা দেখলে মনে হচ্ছে চির শান্তিতে নিদ্রামগ্ন। শ্রান্ত ক্লান্ত জীবনের অন্তিম পরিণতিতে তিনি সুখনিদ্রায় আচ্ছন্ন।

খাটিয়ায় মহাদেবের দেহখানি তোলা হল। বাপু খাটিয়াতে নিজের কাঁধ লাগালেন। বয়ে নিয়ে গেলেন মৃতদেহ যথাস্থানে। সেখানে চিতা সাজানো ছিল। খাটিয়া থেকে মৃতদেহ নিচে রাখা হল। ধীরে ধীরে চিতায় স্থাপন করা হল। বৈদিকমন্ত্র উচ্চারিত হল। দেহের উপর

কাঠের পর কাঠ স্তরে স্তরে সাজানো হলো। ঘি ছড়িয়ে দেওয়া হল কাঠের উপর। বাপু মুখাগ্নি করার জন্য তৈরি। বাপু দু'একটা মন্ত্রউচ্চারণ করলেন আপনমনে। তারপর পাটকাটিতে আগুন ধরিয়ে নিলেন। মুখাগ্নি করলেন। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল মহাদেবের চিতা। দেহ ভষ্মীভূত হতে বেশ কিছু সময় লাগল। বাপু ও অন্যান্যরা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সঙ্গে জেল সুপার। পুলিশ অফিসার।

সরকারবাহাদুরের প্রতিনিধি - ভাইসরয় বুঝতে পারলেন মহাদেবের একজন সুযোগ্য উত্তরাধিকারী বাপুর সাহায্যের জন্য প্রয়োজন। তাই অনেক চিন্তা ভাবনা করে সরকার পিয়ারীলালকে পাঠালেন বাপুকে জেলে সঙ্গ দেবার জন্য। পিয়ারীলাল মহাদেবের স্থলাভিষিক্ত হলেন।

ত্রিশ

বাইরে থেকে বাপুকে দেখে মনে হতো হয়ত তিনি মহাদেবের মৃত্যুশোক কিছুটা সামলে নিয়েছেন কিন্তু বাহ্যিক চালচলন দেখে বাপুর অন্তরের কথা বোঝা দুঃসাধ্য। মহাদেবের জন্য বাপু নিয়মিত শোকপ্রকাশ করেন। তার আত্মার সদ্‌গতির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। রোজই ফুলের মালা নিয়ে যান তার সমাধিতে দেবার জন্য। ঘুম থেকে খুবই ভোরে ওঠে গান্ধীজি এ কাজটা আগেই সেরে নেন.

মহাদেবের চিতাব উপর একটা প্রস্তরফলক স্থাপন করা হল। মীরা ফলকের উপরে একটা ওঁ এঁকে দিলেন, গান্ধীর নির্দেশে ফলকেরনিচে দেওয়া হল ক্রশ চিহ্ন। আর ফলকের চারদিকে দেওয়া হল মুশ্লিমদের চাঁদ চিহ্ন। মীরা এ সমস্ত কাজ নিজের হাতেই সমাধা করলেন। বাপু মহাদেবকে আত্মত্যাগের চরম নিদর্শন জিশুর সমগোত্রীয় বলে মনে করেন। এভাবে কিছুদিন কেটে গেল। কিন্তু বাপু চিন্তিত। তিনি বাইরের কোন খবর পাচ্ছেন না। আগা খাঁ প্রাসাদের বাইরে কি যে চরম অত্যাচার চলছে ভারতীয়দের উপর তা ভেবে বাপু অস্থির। অবশ্য তাঁর করার কিছুই নেই। এভাবেই গান্ধীর জীবন কাটছিল জেলে আগা খাঁ প্রসাদে। সরকার নানান চিন্তাভাবনা করে বাপুকে তাঁর পছন্দমত দৈনিক খবরের কাগজ পড়ার সুযোগ দিল। জেল সুপার বাপুর কাছ থেকে তাঁর পছন্দের কাগজের একটা তালিকা চাইলেন। যথারীতি বাপুর সেই তালিকা তাদের হাতে দিলেন। সেই অনুযায়ী কিছু খবরের কাগজ এলো গান্ধীজির হাতে। এতদিন পর বাইরের জগতের একটা চিত্র তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। গান্ধীজি কাগজের উপর চোখ রেখে ভাবে তন্ময় হয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন সমস্ত দেশ জুড়ে আরম্ভ হয়েছে আন্দোলন। সভাসমিতির মাধ্যমে বিপ্লবীরা সিদ্ধান্ত নিয়ে এক একদিন এক এক জায়গায় আইন অমান্য আন্দোলন করে যাচ্ছে। সঙ্গে চলছে সরকারি পুলিশের অতি তীব্র অত্যাচার। আইন অমান্যকারিদের উপর চলছে পুলিশের লাঠি চার্জ। তাদের সভাসমিতিতে ফাটছে টিয়ার গ্যাস। লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে প্রাণভয়ে এদিক ওদিক ছুটছে। ক্ষেত্রবিশেষে গুলিতে প্রাণ হারাচ্ছে অনেকেই। আর দলে দলে বন্দি হচ্ছে।

প্রায় সব জায়গায় আন্দোলন ছিল অহিংস। কিন্তু কোন কোন জায়গায় সরকারি পুলিশের অত্যাচারে আন্দোলন নিষ্ঠুর আকার ধারণ করছিল। আন্দোলনকারিরা পুলিশ ফাঁড়ি

আক্রমণ করল। টেলিগ্রাফ, টেলিফোনের লাইন কেটে দিতে লাগল। রেল লাইন তুলে দিতে লাগল। আর সরকারি পুলিশের বেয়নেটের খোঁচায় বা গুলিতে অনেকের ঘটল অকাল প্রয়ান।

গান্ধীজি এ সমস্ত খবরে বিচলিত হলেও কিছু বিরূপ মন্তব্য করলেন না। আন্দোলনকারীরা যে হিংসার আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে একথা তিনি ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারলেন।

এভাবে চোদ্দদিন কেটে গেল। ভাইসরয়ের কাছে গান্ধীজি যে চিঠি দিয়েছিলেন এতদিন পর তার উত্তর এলো। ভাইসরয়ের চিঠিপড়ে গান্ধী বিস্মিত। এর মধ্যে ভাইরয়ের বিন্দুমাত্র মনের পরিবর্তন হয়নি। সরকার যে এত অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে নিরীহ সত্যাগ্রহীদের উপর সেই সম্পর্কে ভাইসরয়ের চিঠিতে কোন কথাই উল্লেখিত নেই। বাপু তাই বিস্মিত।

ভাইসবয় গান্ধীকে স্পষ্টতই লিখে জানিয়েছেন যে সরকার তাদের নীতির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করতে নারাজ। গান্ধী ভেতরে ভেতরে তীব্র ক্ষোভে জ্বলতে লাগলেন। অহিংস আন্দোলনের পূজারী গান্ধীজির মনেও এ ধারণা হতে লাগল যে সরকার যে ভাবে সত্যাগ্রহীদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে তার ফলে তারা আরও হিংস্র হয়ে উঠতে পারত।

সত্যাগ্রহীদের উপর ইংরেজদের অত্যাচারের খবর গান্ধীজি কাগজে পড়ে তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে লিখতে গিয়ে মীরা বেন তাঁর 'স্পিরিটস পিলিগ্রিমিজ" গ্রন্থে লিখেছেন, "We watched Bapu as he read through the newspapers, wondering what his reactions might be. He remained calm and a little grim. when he finally spoke it was to say that the wonder was there had not been more violence, seeing the way the Government had acted".

সরোজিনী নাইডুর শরীর যেন ক্রোধে কাঁপছে। তাঁর প্রতিটি লোমকূপ খাড়া হয়ে যাচ্ছে। নৃশংস ইংরেজ অত্যাচারের কাহিনী যেন তাঁর হৃদয় মনকে কঠিন সহিংস সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রলুব্ধ করছে। তিনি ইংরেজদের উপর প্রতিশোধ নিতে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করার জন্য আগ্রহী। শুধু সময় ও সুযোগের অপেক্ষায়।.

লর্ডকৃষ্ণের জন্মদিন। সরোজিনীদেবী মীরাকে বললেন এই শুভাদিনটিকে তাঁরা জেলের মধ্যেই পালন করবেন। ভারতের সর্বত্রই এমনকি ভারতের বাইরে কিছু কিছু জায়গায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন পালন করা হয় সাড়ম্বরে। তিনি বলে চললেন কারাগারেই শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই কারাগারেই তাঁরা তাঁর জন্মদিন পালন করবেন।

মীরার কাছেই ছিল শ্রীকৃষ্ণের একটি মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি দেখতে ভারি সুন্দর। এটা হাতির দাঁতের। জনৈক বন্ধু বা বান্ধবী তাঁকে মূর্ত্তিটি উপহারস্বরূপ দিয়েছিলেন। তিনি সেটা সযত্নে তাঁর কাছে রেখেদিয়েছেন। এখন সেটা তাঁর কাজে লাগল। তিনি মূর্ত্তিটি তাঁর টেবিলের উপর রাখলেন। নিচে পেতে দিলেন অপূর্ব সুন্দর সফেদ একখানা চাদর। তখন আঁগা খাঁ প্রাসাদের বাগানে ডালিয়া ফুলের অপরূপ সমারোহ।

বিচিত্র রঙের ডালিয়াফুল মানুষের চোখে তাক লাগিয়ে দেয়। মীরা অনেক ডালিয়া ফুল তুলে আনলেন। তার অনেকগুলি কৃষ্ণের মূর্ত্তির চারপাশে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখলেন। ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। মনে হচ্ছিল মূর্ত্তিটির মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। কৃষ্ণ স্বয়ং যেন মীরাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করছেন। মীরা বিগলিত, মীরা মুগ্ধ। তাঁর চোখদিয়ে দু' ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁর চোখের জল মুছে দিলেন। তিনি

কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। তাঁর পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেন স্তব্ধ। এক অসাধারণ প্রাণচাঞ্চল্য তাঁর মধ্যে সকলেই অবলোকন করলেন। এর মধ্যে যে কস্তুরাবা তাঁর ঘরে ঢুকেছে সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর সম্বিত ফিরে এলো। তিনি দেখলেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কস্তুরাবা। তিনি করজোড়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানাচ্ছেন। এর মধ্যে বাপু স্বয়ং বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তিনি যাবেন প্রাতঃভ্রমণে। মীরার ঘরের দিকে উঁকি মারলেন। মীরা তখনো ভাবে তন্ময়। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা।

মীরার ঘরে পা রেখেই তিনি বিস্মিত। কৃষ্ণের মূর্ত্তিটির দিকে ব্যাকুল নয়নে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখদুটি যেন বেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়েছিল। কৃষ্ণের মূর্ত্তিটির উপর থেকে তাঁর চোখ সরছিল না। তিনিও খনিকের জন্য ভাবে তন্ময় হয়ে গেলেন।

কস্তুরাবা রোজ আসেন মীরার ঘরে। কৃষ্ণের মূর্ত্তিটির পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর মনের কথা বলেন। মূর্ত্তির পায়ে প্রণাম জানান। মূর্ত্তিটির মধ্যে তিনি সাক্ষাত নারায়ণকে দর্শন করেন।

এর পর ২রা অক্টোবর বাপুর জন্মদিনটি যথা নিয়মে এসে হাজির হল। এই দিনটি পালিত হল সাড়ম্বরে। বাপুর কপালে চন্দন পরালেন মীরা। বাপু চিন্তামগ্ন। বাপু যেন অজানা কোন ভয়ে শঙ্কিত। মীরা বাপুর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বাপুর বেদনাক্লিষ্ট মনে প্রফুল্লতা আনবার জন্য দু' একবার তাঁর সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলেন। বাপুর সঙ্গে আসন্ন দীপাবলি উৎসব নিয়েও তিনি কথা বার্তা বললেন। বাপুর সঙ্গে পরামর্শ করে জেল সুপার Mr. Katley-র সঙ্গে কথা বললেন। দীপাবলি উৎসবে আগা খাঁ প্রাসাদটিকে আলো দিয়ে সাজাতে চান তিনি। জেল সুপার মীরার কথা অনুধাবন করলেন। তিনি মীরাকে জানিয়ে দিলেন দীপাবলি উৎসবে মীরার ইচ্ছেমতো তাঁদের ঘরের বারান্দা ও জানালাগুলোকে আলোক মালায় সজ্জিত করতে পারেন। উৎসবের দিন মীরা তাঁর মনের মতন করে মাটির প্রদীপ জ্বালালেন। প্রদীপগুলি দেওয়া হল তাঁদের বারান্দায় ও জানালায়।

আলোর ছটায় ঘরগুলিকে অপূর্ব লাগছিল। বারান্দায় দেওয়া হল মোমবাতি। সৌন্দর্য প্রিয়া মীরার মধ্যে রয়েছে ঘরসাজানোর ক্ষমতা। সেই ক্ষমতা ঈশ্বর প্রদত্ত। অতিশৈশব থেকেই তিনি সৌন্দর্য পিয়াসী।

দীপাবলির রাতে সরোজিনী দেবী নিজের হাতে রান্না করলেন। নিজের হাতেই সকলকে পরিবেশন করলেন খাবার। লেখিকা সরোজিনী, সমাজ সেবী সরোজিনী হয়ে গেলেন রাঁধুনী। দীপাবলির রাতে তিনি সকলকে রান্না করে খাওয়ালেন। মনে পেলেন অপরিসীম তৃপ্তি। তিনি তখন ৬৫ বছরের বৃদ্ধা। সুশীলা, পিয়ারীলাল ও মীরাকে তিনি তাঁর কন্যারূপেই গ্রহণ করলেন। মাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা সরোজিনীর কাজের মধ্যে প্রতিফলিত।

পুরনো বছর প্রায় শেষের দিকে। নতুন বছরের শুভসূচনার অপেক্ষায় তিনি। কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই। ভাইসরয় বাপুর কোন কথার গুরুত্ব দিতে নারাজ। বাপু মীরাকে কাছে ডাকলেন। তাঁকে তিনি তাঁর মনের কথা বলে দিলেন। ধ্যানমগ্ন বাপুর উপর যেন অদৃশ্য কোন অলৌকিক শক্তি তখন ভর করছে। মীরাকে বললেন তিনদিন তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করবেন। অন্তরের সুপ্ত অনুভূতি তাঁকে ভাইসরয়কে শেষ বারের মতন

তাঁর মনের কথা জানিয়ে চিঠি দিতে উদ্বুদ্ধ করছে। সেই চিঠির কোন সন্তোষজনক উত্তর না পেলে তিনি একুশদিন অনশন করবেন এটা স্থির নিশ্চিত।

বাপু যথারীতি তিনদিন মৌনব্রত অবলম্বন করলেন। তারপর বসলেন চিঠি লিখতে ভাইসরয়কে। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেন, "I must not allow the old year to expire without disburdening myself of what is rankling in my mind."

বাপু ভাইসরয়-কে জানালেন যে তিনি তাঁকে তাঁর বন্ধু হিসেবে মনে করেন। তাঁদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে তিনি সদা সর্বদা প্রস্তুত। তবে সেটা হবে সুচিন্তিত ও যুক্তিনির্ভর। বাপু এও জানিয়ে দিলেন তাঁর এ চিঠির কোন সদুত্তর না পেলে তিনি একুশদিন অনশন সত্যাগ্রহ আরম্ভ করতে বাধ্য হবেন। অনশন হচ্ছে তাঁর শেষ অস্ত্র। যখন ব্রিটিশ শক্তি তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দিতে নারাজ তখন তার পক্ষে শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করা ছাড়া ত অন্য কোন উপায় নেই। ৯ই আগস্ট 'ভারতছাড়ো' আন্দোলনের যে প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করেছে তার এতটুকু অদল বদল হবে না। ব্রিটিশশক্তি শান্তিপূর্ণ উপায়ে এর মিমাংসা করতে চাইলে বাপু আবার আলোচনার টেবিলে বসতে পারেন।

ভাইসরয় বাপুর চিঠির উত্তর দিলেন। কিন্তু বাপুর সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে কোন অভিমত প্রকাশ করলেন না। বাপুকে সেই চিঠিতে অনুরোধ জানানো হল বাপু যেন ৯ই আগস্টের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহার করেন। বাপু এই চিঠির উত্তরে জানিয়ে দিলেন তিনি কিছুতেই তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থেকে সরে আসবেন না। তবে বাপু জানিয়ে দিলেন যে এটা হবে তাঁর আত্মশুদ্ধির জন্য অনশন। তাঁর অনশনের দিন স্থির হলো ৯ ই ফেব্রুয়ারি।

বাপুর শরীর ভালো নয়। তবুও তিনি অনশন আরম্ভ করলেন। মীরা আছেন তাঁর পাশে। তাঁর পরিচর্যা মীরাকে করতে হচ্ছে। অনশনের দু'দিন অতিক্রান্ত হল। শরীর তাঁর ভীষণভাবে ভেঙ্গে পড়ল। সরকার ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে এগোতে লাগলেন। ডঃ গিল্ডার ছিলেন বম্বের কংগ্রেস সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রী। তিনি তখন যেয়ারবেদা জেলের সরকারি ডাক্তার হিসেবে কর্মরত। তিনি একজন বড় 'হার্ট স্পেশালিস্ট'। বাপুকে এর আগে বিভিন্ন সময়ে তিনি চিকিৎসা করেছেন। ডঃ গিল্ডারকে আগাখাঁ প্রাসাদে বদলির আদেশ দিল সরকার। তাঁর উপর বাপুর চিকিৎসার ভার। বাপুর শরীর ক্রমাগত খারাপের দিকে যেতে লাগল। সরকার ধরে নিয়েছিল এ যাত্রায় তাঁর বাঁচার আশা নেই।

ভাইসরয়-এর সঙ্গে বাপুর শারীরিক ব্যাপারে অনেক কথাবার্তা হলো। মীরা ভাইসরয়কে সব জানিয়ে চিঠি দিলেন। বাপুর চিকিৎসার জন্য ডঃ দিনশা মেহতা নিয়মিত আগাখাঁ প্রাসাদে আসতে লাগলেন। মেহতা একজন Nature Cure Specialist তাঁর উপর বাপুর গভীর আস্থা ছিল। অনশনের সময় বাপুকে তিনিই এর আগে অনেকবার দেখা শোনা করেছেন।

বাপুর এবারের শারীরিক অবস্থা অনুধাবন করে সরকার তাঁর সঙ্গে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে দেখা করতে দিতে আপত্তি করল না। বাপুর সঙ্কটময় সময়ে ছুটে গেলেন প্রখ্যাত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। পুনাতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হল। সেখান থেকে তিনি প্রতিদিনই

বাপুকে দেখতে যেতেন। বাপু ডঃ রায়কে দেখে অতীব সন্তুষ্ট। এভাবেই বাপুর এবারের অনশনের দিন অতিক্রান্ত হচ্ছিল।

এর মধ্যে বাপুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন রাজা গোপাল আচারি। মূলত রাজনৈতিক বিষয়ে কিছু আলাপ আলোচনার জন্য তাঁর বাপুর কাছে আগমন। বাপু রাজাজীর মতামতকে খুবই গুরুত্ব দিতেন রাজনৈতিক ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে।

বাপু বলতেন রাজাজী হচ্ছেন তাঁর একজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও সৎ উপদেষ্টা। মীরা তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন যে "Bapu had so deep a regard for Rajajis Knowledge and insight that he had, for years, loved to call him, "The Keeper of my conscience". রাজাজীর সঙ্গে বাপুর জিন্নার সাম্প্রদায়িক মানসিকতা নিয়ে আলোচনা হলো। তখন জিন্নার মাথায় ঘুরছে দেশ ভাগের পরিকল্পনা। বাপু তাই গভীরভাবে চিন্তিত। জিন্নাকে শত বুঝিয়েও তিনি স্বমতে আনতে পারছেন না। বাপু তাই বিধ্বস্ত ও রণক্লান্ত সৈনিকের মত রাজাজীর কাছে পরামর্শ চাইলেন - কি উপায়ে জিন্নার মানসিক পরিবর্তন ঘটানো যায়?

জিন্নার প্রতি বাপুর এই দুর্বলতাকে কোন সময় সহ্য করতে পারেননি মৌলনা আজাদ। আজাদ বাপুর সম্পর্কে এ জন্য বিরূপ মন্তব্য করতে পিছপা হননি।

বাপুর এরকম এক সঙ্কটজনক অবস্থায় মীরা আক্রান্ত হয়ে পড়লেন ম্যালেরিয়া রোগে। তাঁর রোগও যেন গুরুতর আকার ধারণ করল। ডঃ বিধান রায় মীরার চিকিৎসার ভার নিলেন। কুইনাই ইনজেকশান দেবার প্রয়োজন হলো। মীরা ইন্‌জেকশন নিতে নারাজ। ডঃ রায় তাঁকে অনেক বুঝালেন। মীরা শেষ পর্যন্ত ডাঃ রায়-এর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। ইনজেকশন নেবার পর মীরা সুস্থ হয়ে উঠলেন। আবার বাপুর সেবার কাজে লেগে পড়লেন।

মীরার লেখা থেকে জানা যায় যে সরকার স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে বাপুর এ যাত্রায় অন্তিম প্রয়ান ঘটবে দিল্লীর নির্দেশে বাপুকে পোড়াবার জন্য চন্দন কাঠ, নতুন কাপড় চোপড় ও মৃতদেহ সৎকারের জন্য অন্যান্য আনুসঙ্গিক সবকিছুর ব্যবস্থা করে রাখা হল। জেলা প্রশাসনকে সতর্ক করে দেওয়া হল। বাপুর মৃত্যু হলে এবং তারজন্য দেশে যে আলোড়ন সৃষ্টি হবে তা যেন কঠোর হাতে দমন করা হয়।

কিন্তু বাপু এ যাত্রায় রক্ষা পেলেন। মীরা ১৮ ঘন্টা বাপুর কাছে থাকতেন। মীরা বলেছেন এই একুশদিন উপোসের সময় কিছুটা ফলের রস জলের সঙ্গে গ্রহণ করতেন। নির্জলা উপোস তিনি এবার করেননি। তাই কোনরকম প্রাণে বেঁচে গেলেন। দেশবাসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ইংলণ্ড বেঁচে গেল এক লজ্জাজনক পরিস্থিতির হাত থেকে। আর ভগবানের আমোঘ বিধান ভারতবাসীকে এক রক্তাক্ত আন্দোলনের হাত থেকে নিশ্চিত ভাবে রক্ষা করল।

অনশন ভঙ্গ করলেন বাপু। বাপুর কাছে দলে দলে ভক্তরা আসার জন্য উদ্‌গ্রীব। সরকার বাপুর সঙ্গে বাইরের কাউকেও দেখা করতে দিল না। কেবলমাত্র মীরা, দেবদাস আর বাপুর ভাইপো কানু গান্ধী বাপুর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেল। আর ডঃ গিল্ডারকে সরকারি নির্দেশে বাপুর কাছে থাকতে হলো।

একত্রিশ

বাপুর একুশদিনের অনশন ইংরেজ সরকারের হৃদয়ের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হল না। তারা তাদের নীতিতেই চলতে লাগল। তবে ভারতবাসীর হৃদয়ে বাপুর এই অনশন বিরাট এক প্রভাব বিস্তার করল। ভারতের জনগণের মন ক্রোধের আগুনে ফুঁসতে লাগল। ভারতবর্ষ যেন এক উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরির উপর দন্ডায়মান। যে কোন সময় ঘটতে পারে বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের ধূম্রজাল ও লাভার স্রোতে অচিরেই যে ব্রিটিশ রাজত্বকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে সাগরের জলে ফেলে দেবে—তা বুঝতে ইংরেজদের বেশি সময় লাগল না।

অনশনে বাপুর শরীর কাহিল হয়ে গেল। শারীরিক দিক থেকে বাপু এতই দুর্বল হয়ে পড়লেন যে তাঁর সঙ্গে বাইরের লোকের দেখাসাক্ষাত করাও কিছুদিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল। এতে বাপুর শরীর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলো। বাপু শরীরে কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করলেন। বাপু একটু সুস্থ হয়ে উঠলেন কিন্তু দেখা দিল আর এক বিপদ।

সরোজিনী নাইডু আক্রান্ত হলেন ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া রোগে। জেলে রেখে সরকার নাইডুর চিকিৎসা করাতে ইতস্তত করতে লাগল। সিদ্ধান্ত নিল নাইডুকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। নাইডুর আত্মীয় স্বজনকে খবর দেওয়া হল। তাঁরা যথাসময়ে এলেন। নাইডু বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেলেন। তবে তাঁর আত্মীয় স্বজনরা তাঁকে কিছুদিন হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করালেন। একটু সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁকে বাড়ি নিয়ে গেলেন।

এদিকে মীরা সরোজিনী অভাবে খুবই কাহিল হয়ে পড়লেন। হয়ে গেলেন মনমরা। কিন্তু কিছু ত করার নেই। মহাদেব চলে গেলেন অমৃত লোকে। সরোজিনী অসুস্থতার জন্য বন্দিদশা থেকে মুক্ত। এখন বাপু, কস্তুরাবা আর মীরা এই তিন জনই একমাত্র জেলবন্দি।

কস্তুরাবার শরীরটাও যেন আর চলে না। শারীরিক অসুস্থতা তাঁর মানসিক অসুস্থতার কারণ হয়ে উঠেছে। মীরা চিন্তাক্লিষ্ট। বাপু চুপচাপ। সব কিছু বুঝছেন কিন্তু নীরব। এরকম এক বিষাদময় পরিস্থিতিতে মীরা মিঃ ক্যাটলির সঙ্গে কথা বললেন। দুজনের মধ্যে কিঞ্চিৎ আলোচনা হল। সুশীলা সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ ক্যাটলি কস্তুরাবা, মীরা, বাপু এবং সুশীলার মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। তাঁদের মানসিক অবসাদ কিছুটা প্রশমিত করার কথা চিন্তা করলেন। তিনি বাপুকে বললেন জেলের মধ্যে ব্যাডমিন্টন খেলার ব্যবস্থা করে দিতে তিনি আগ্রহী। সঙ্গে কেরাম খেলার ব্যবস্থাও থাকবে। বাপু রাজনীতিবিদ কিন্তু খেলা ধূলা যে মানুষের মনকে সুস্থ করতে পারে সেই জ্ঞান তাঁর আছে। তিনি বন্দিখানায় ব্যাডমিন্টন ও কেরাম খেলার ব্যবস্থা করে দিতে বলে দিলেন।

মীরা, সুশীলা ও কস্তুরাবা কেরাম খেলার জন্য আগ্রহী। কিন্তু কস্তুরাবা খেলতে জানেন না। মীরা একজন ভালো খেলোয়াড়। হাত ভালো। কস্তুরাবাকে ঘন্টাখানেক তালিম দিলেন তিনি। কস্তুরাবা কিছুটা ধাতস্থ হলেন। মীরা, সুশীলা, বাপু সব যে যাঁর ঘরে চলে গেলেন। কেরাম-খেলা যেন তাঁর মন প্রাণকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ফলে কেরাম খেলা আত্মস্থ করতে তাঁর বেশি সময় লাগল না।

কেরাম খেলার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলার তালিম ও নিতে লাগলেন কস্তুরাবা। বাপু ছিলেন দু'টো খেলাতেই পারঙ্গম। তবে তাঁর স্ত্রী কোনটাতেই ওস্তাদ নন। ব্যাডমিন্টন

খেলা মীরার হাত ধরেই কস্তুরবা শিখলেন। দুটো খেলাতেই কস্তুরবা এখন অনেক ধাতস্থ। এভাবেই তাঁদের দিনটা কেটে যাচ্ছিল বন্দিদশায় আগা খাঁ প্রাসাদে।

কস্তুরবা সব সময় মনকে সতেজ রাখার চেষ্টা করতেন। শত চেষ্টা করেও তিনি শরীরকে সুস্থ রাখতে পারলেন না। মৃত্যুদূত যেন স্বর্গ থেকে তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। জন্ম, মৃত্যু-বিয়ে নিয়তি নির্ধারিত। কার কোথায় বা কার সঙ্গে বিয়ে হবে সেটা যেমন কেউ আগে থেকে কল্পনা করতে পারে না, মানুষের জন্ম ও মৃত্যু কখন, কোথায় কিভাবে হবে তাও মানুষ আগে থেকে বুঝতে পারে না।

কস্তুরবার শরীর ক্রমাগত খারাপের দিকে যেতে লাগল। দেখে মনে হতে লাগল তাঁর শেষ বিদায়ের দিন আগতপ্রায়। সর্দি-কাশি শ্বাসকষ্ট সবই তাঁর নিত্যসঙ্গী। সব সময় বুক তাঁর ধড়ফড় করতে থাকে। তাঁর শারীরিক শক্তি ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। এরকম এক পরিস্থিতিতে তিনি কয়েকজন ডাক্তারের নাম সরকার বাহাদুরকে জানালেন। এবং অনুরোধ করলেন এসমস্ত ডাক্তারদের দিয়ে যেন তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

সরকার তাঁর কথাতে এতটুকু বিচলিত হয়নি। এবং তাঁর কথামত সত্বর কোন ডাক্তারকে চিকিৎসার জন্য পাঠাবার ব্যবস্থাও করেনি। চিকিৎসার অভাবে কস্তুরবার শরীরের অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করল। মৃত্যু যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। সরকার বুঝতে পারল কস্তুরবার চিকিৎসার প্রয়োজন। কালবিলম্ব না করে প্রথমে কস্তুরবার পছন্দের নেচার কিওর হাসপাতালের ডাক্তার ডাঃ দিনেশ মেহেতা কে পাঠালেন। ততদিনে তাঁর শরীরের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেছে। মেহেতা এসেও কিছু করতে পারলেন না। বাপুর ইচ্ছে অনুযায়ী একজন কবিরাজকে পাঠাল। এবারও সেই একই পদ্ধতি অবলম্বন করল সরকার। কবিরাজ পাঠাতেও দেরি করল। হয়ত তাদের ইচ্ছে ছিল - চিকিৎসার অভাবে কস্তুরবা যেন তাড়াতাড়ি পরপারে চলে যান। বাপুর ভাইঝি মানু গান্ধী এলেন কস্তুরবার পরিচর্যার জন্য। এলেন প্রভাবতী বেনও।

কস্তুরবার তখন শেষ অবস্থা। তাঁর সন্তান ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনরা তাঁকে দেখতে এলেন - সরকারের অনুমতি নিয়ে। ২২ শে তাঁর শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হল। নিঃশ্বাস ঘন ঘন ওঠা নামা করছে। বাপু বুঝতে পারলেন তাঁর সহধর্মিনী প্রিয়তমা কস্তুরবার পরপারের ডাক এসে গেছে। বাপু তাঁর পাশে বসলেন মাথাখানা তুলে তাঁর কোলে স্থাপন করলেন। অতীব স্নিগ্ধ কণ্ঠে দু' একবার নাম ধরে ডাকলেন। কিন্তু উত্তর মিলল না। বিস্ফারিত নয়নে বাপুর মুখপানে চেয়ে রইলেন কস্তুরবা বিধাতার আমোঘ নির্দেশে তিনি চলেছেন স্বর্গধামে। বিপুলা এ বিশ্বের রূপ-রস-গন্ধ আহরণ করেছেন এতদিন। ভারতমাতাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার প্রেরণায় গান্ধীর সঙ্গে ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। গান্ধীর সঙ্গে করলেন কারাবরণ। এই বন্দিশালায় অর্থাৎ আগাখাঁ প্রাসাদে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে চলেছেন পরপারে। স্বামীকে ফেলে রেখে। তাঁর মুখাবয়ব দেখে মনে হচ্ছিল ভারতের মাটি, ভারতের বন-উপবন এবং ধনী-নির্ধন আবাল-বৃদ্ধ ভারতবাসীকে ফেলে পরপারে যেতে যেন তাঁর মন চাইছিল না। তাঁর চক্ষুদ্বয় জলে ভেসে যাচ্ছে। শরীরের কষ্ট এবং মানসিক কষ্ট এক হয়ে তিনি যেন অশ্রুসাগরে ভেসে যেতে লাগলেন।

চোখের পাতা পড়ছেনা। হঠাৎ দু' একবার জোরে জোরে শ্বাস নিলেন। হিক্কা উঠল।

দু' তিনবার। বাপু গুণ গুণ স্বরে গীতার শ্লোক বলে যাচ্ছিলেন চোখের পাতা স্থির। শ্বাসপ্রশ্বাসের নালী যেন কারও নির্দেশে বন্ধ হয়ে গেল। মাথাখানা বাপুর কোলের মধ্যেই একপাশে ঢলে পড়ল। পার্থিব সুখ-দুঃখ সহসা মিলিয়ে গেল। অজানা-অচেনা দেশের সন্ধানে যেন তাঁর অবিনশ্বর আত্মা ছুটে বেরিয়ে গেল। পড়ে রইল তাঁর নিষ্প্রাণ দেহখানি।

বাপুর চোখ ছল ছল করছিল। মীরা চুপচাপ যেন পাথরমূর্ত্তি। এক অকৃত্রিম সুহৃদ যেন তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন অভিমান করে। বাপু কোল থেকে কস্তুরা মাথাখানি ধীরে ধীরে সরিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। আত্মীয় স্বজনরা দেহখানি নিয়ে স্নানের ঘরে। ভালো করে দেহখানি জল দিয়ে ধোয়া হল। এলেন ইন্সপেক্টর জেনারেল। বাপু তাঁর কাছে বললেন কস্তুরাবার নশ্বর দেহখানি যেন তাঁর আত্মীয়স্বজনের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। বাপুর অনুরোধ রক্ষিত হল না। ইন্সপেক্টর জেনারেল স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন তা সম্ভব নয়।

স্থির হল তার দেহখানি আগাখাঁ প্রসাদের ঘেরা জায়গায় বাইরে যেখানে মহাদেবের দেহ দাহ করা হয়েছিল সেখানেই দাহ করা হবে। মহাদেবের চিতার পাশেই তার চিতা সাজানো হলো। বাগান থেকে ফুল তোলা হল প্রচুর। মালা গাঁথা হলো। ফুলের স্তবক তৈরি করা হলো। বাপু আপন মনে গীতা পাঠ করে যাচ্ছিলেন। তিনি গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন। তাঁর মন যেন সুদূর অতীতের দিকে ছুটে চলেছে। বিদঘুটে সব ভাবনা যেন তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে অচল করে দিচ্ছে। শ্মশান বৈরাগ্য তাঁর দেহ মনের কোষগুলিকে যেন সংকুচিত করে দিতে লাগল। তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মতন যেন বলে চললেন, "এখানে আসিলে সকল জিনিসের সমাধি হয় ভালমন্দ সৎ অসৎ সব এই পথ দিয়ে সংসার ত্যাগ করে। যে চলিয়া যায় তাহার সুখ, যে পড়িয়া থাকে তাহার দুঃখ। সংসার সুখেরও বটে দুঃখেরও বটে এখানে যে আগুন জ্বলে তা চির জন্মে নিভে না।" কস্তুরার মৃত্যুঘটল বেশ রাতে। তাই সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহ সৎকার করা সম্ভব হল না। রাতে দেহখানি জল দিয়ে পরিস্কার করা হল। বিছানায় ফুল, ফুলের মালা দিয়ে দেহখানি ঢেকে দেওয়া হল। সারারাত মৃতদেহখানি ঘরের মধ্যে পড়ে থাকল। বামধুন সংগীত চলল। বাপুর গীতা পাঠ চলল অনেকক্ষণ। শান্ত ক্লান্ত বাপু। তাঁর বিশ্রাম দরকার। তাই মীরা তাঁকে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে খানিক বিশ্রামের জন্য ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

রাত গড়িয়ে সকাল হলো। আত্মীয় স্বজনরা বাগান থেকে আরও অনেক ফুল তুলে আনল। মালা গাথা হলো। পুষ্প স্তবক তৈরি করল। বা-র দেহখানি ফুলের মধ্যে ডুবে গেল। খাটিয়া আনা হলো। চন্দন দিয়ে বা'র মুখখানি সাজিয়ে দেওয়া হল। দেখে মনে হচ্ছিল তিনি অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন। মুখের কোন বিকৃতি নাই, নেই কোন কষ্টের ছাপ। সৌম্য, শান্ত মুখাবয়ব দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক দেবীপ্রতিমা কঠোর জীবন সংগ্রামের পর শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন। কোনদিন তাঁর যে সেইঘুম ভাঙ্গার নয়।

মরদেহখানি ধীরে ধীরে যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া হল। সাজানো হল চিতা। চন্দন কাঠ, ঘৃত ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থ সামগ্রী আনা হল। আগুন দেওয়া হল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। অগ্নির লেলিহান দহন ক্রিয়া চলল। দেহখানিকে ছাই করে ফেলতে বেশি

সময় নিল না। বাপু স্থির দৃষ্টিতে সমস্ত ঘটনার বোবা সাক্ষী হয়ে রইলেন।

কস্তুরাবার দেহ পঞ্চভূতে মিলে গেল। দেখা গেল তাঁর বালা জোড়া যথাস্থানে পড়ে আছে। জমাদার এলো। ছাই-এর স্তূপের মধ্যে দেখা গেল তাঁর বালা জোড়া। আগুন বালা জোড়ার এতটুকু বিকৃতি ঘটাতে পারেনি। জমাদার চিৎকার করে বলে উঠলেন। তিনি নির্ঘাত সোজা স্বর্গে গেছেন নচেৎ বালা জোড়া এরকম অবিকৃত অবস্থায় পড়ে থাকতো না। পাপপূণ্য স্বর্গ-নরক আছে কি নেই তা জানা নেই। মানুষের বিশ্বাস এই যা।

চার্বাক দর্শন আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন। চার্বাক ছিলেন বৃহস্পতির শিষ্য অসাধারণ পণ্ডিত। পতঞ্জলির পাণ্ডিত্যের কথাও অবিস্মরনীয়। আবার গ্রীক্ দার্শনিক সক্রেটিশ ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী। ঈশ্বর-গুরু আত্মা ইত্যাদিতে তিনি ছিলেন ঘোর অবিশ্বাসী। আমাদের ভাষায় তিনি ছিলেন ঘোর নাস্তিক। তবে অসাধারণ যুক্তিবাদী। অসামান্য জ্ঞানী।

আবার শ্রীকৃষ্ণের গীতার যুক্তিও স্মরনীয়। গীতা পরিষ্কার আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হতে উপদেশ দিয়েছেন। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। আত্মা অবিনশ্বর, বিশ্বব্রহ্মান্ড ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। মহাত্মা গান্ধীর ঈশ্বর তাঁকে কর্মের প্রেরণা জুগিয়েছে। কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে তিনি ঈশ্বরের চিন্তায় তন্ময় হয়ে থাকতেন। তারপর অন্তরের নির্দেশে তিনি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

বত্রিশ

মীরা বলেছেন আগা খাঁ প্রসাদের এক ঘেঁয়ে জীবন যাত্রা বা বন্দি জীবন বাপুর ত বটে তাঁদের সকলের কাছেই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল তাই বাপু চাইছিল এত বিশাল প্রাসাদের বন্দিজীবন যাপন না করে অন্যকোন একটা ছোট জায়গায় থাকতে। তিনি তা জেল কর্তৃপক্ষকে জানালেন। বাপুর মন যখন এরকম একটা চিন্তায় আচ্ছন্ন ঠিক সেই সময় সরকার বাপুকে মুক্তি দেবার জন্য একটা চিন্তা ভাবনা করে রাখলেন। এর মধ্যে বাপু হঠাৎ ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হলেন। শরীর তাঁর দুর্বল। কুইনাইনে তাঁর জ্বর সেরে গেল কিন্তু শারীরিক দুর্বলতা যেন দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। বাপুর দুর্বলতা এত অধিক মাত্রায় প্রকটিত হচ্ছিল যে বাপু সময় সময় অজ্ঞান হয়ে যেতে লাগলেন। সকলেই তাই খুবই চিন্তিত। বাপুর যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে সারা ভারত জুড়ে আগুন জ্বলবে এ কথা সরকার বাহাদুরের বুঝতে অসুবিধে হল না।

আগা খাঁ প্রাসাদে সরকারের নির্দেশে ডঃ দীনশ মেহতাকে আসতে হলো। বাপুর নিয়মিত চেক আপ দরকার ছিল। ডঃ মেহতা আসাতে বাপুর মনও খানিকটা সুস্থির হয়ে উঠল। মীরাও যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

একদিন মীরা ঘরে বসে উপনিষদের দু'চারটা পাতা উলটাচ্ছিলেন। আর আনমনে কি যেন ভাবছিলেন। জানালা দিয়ে বাইরের উম্মুক্ত প্রান্তরের দিকে এক এক বার তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন পরখ করার চেষ্টা করছিলেন। প্রকৃতির সন্তান মীরা। তাই ভাবলেশ বিজড়িত অন্তরে তিনি প্রকৃতির সুধাপানে যেন ব্যস্ত। হঠাৎ একজন বিশিষ্ট লোকের বুটের আওয়াজ মীরার প্রকৃতি প্রেমে আবিষ্ট মনের উপর প্রভাব ফেলল। ভদ্রলোকের বুটের শব্দ-

মীরাকে জানালা থেকে তাঁর চোখ ফেরাতে বাধ্য করল। মীরা দরজার দিকে একটুখানি এগোলেন। দেখলেন স্বয়ং ইনস্পেক্টর জেনারেল এসে হাজির। মীরাকে তিনি বাপুর শারীরিক সুস্থতা অসুস্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন।

মীরাকে নিয়ে বাপুর ঘরে গেলেন। বাপুর সমনে মীরাকে প্রশ্ন করলেন বাপুর কি গাড়িতে করে একশ মাইল পর্যন্ত চলার শারীরিক ক্ষমতা আছে? বাপু কথাটি শুনে মৃদু হাসলেন। বললেন তাঁর শারীরিক ক্ষমতা না থাকুক মানসিক ক্ষমতা পুরোমোত্রায় আছে। মীরা এবং বাপু উভয়েই বুঝতে পারলেন সরকার বাহাদুর বাপু ও তাঁর বন্দি-সাঙ্গপাঙ্গকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাবেন শ্রীঘ্রই।

ইনস্পেক্টর জেনারেল বাপুরও তাঁর অন্যান্য সঙ্গীসাথীদের (যাঁরা বাপুর সঙ্গে আছেন) মুক্তি দেবেন এরকম একটা ইঙ্গিত দিলেন। তিনি চলে যাবার পর মীরা বাপুর সঙ্গে আলোচনা করে সব গোছগাছ করে নেবার জন্য প্রস্তুত হতে উদগ্রীব। বাপুর সঙ্গে কথা বলে মীরা নিজের ঘরে এলেন। বিছানায় শুয়ে শূন্যে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। তখন বাপু তাঁকে ডাকলেন। মীরা বাপুর ঘরে। গীতার একাদশ অধ্যায় পড়তে বললেন বাপু। মীরা সুন্দর সংস্কৃত শিখে গেছেন।

মীরা সুললিত কণ্ঠে বাপুকে গীতার একাদশ অধ্যায় পড়ে শুনাতে লাগলেন। চেয়ারে বসেই মীরা পড়ছিলেন। ধ্যানমগ্না মীরা তখন। বাপু তাঁকে গীতা সম্পর্কে বেশকিছু প্রশংসাবাক্য শুনালেন। গীতার গূঢ় অর্থ কি তাও বুঝিয়ে দিলেন। ৫ই তারিখ। তখন সবে সন্ধ্যা। হঠাৎ ইনস্পেক্টর জেনারেলের আগমন। বাপুব ঘরেই তিনি সোজা চলে এলেন। মীরা তন্ময় হয়ে গীতা পাঠে রতা। তাঁর অন্যদিকে তাকাবার ফুসরৎ নেই। ইনস্পেক্টর জেনারেল স্বয়ং এসে হাজির। তিনি বাপুকে বললেন সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনিও আগাখাঁ প্রসাদে বন্দি সঙ্গী সাথীরা মুক্ত। বাপু বিস্ময়ে হতবাক। বাপু বলেই ফেললেন যে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না যে সরকার তাঁকে এত সহজে মুক্তি দিয়ে দেবেন।

বাপু তাই কৌতুকের স্বরে ইন্স্পেক্টর জেনারেলকে জিজ্ঞেসকরলেন তিনি বাপুর সঙ্গে ঠাট্টা করছেন না ত। ইনস্পেক্টর জেনারেল দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলেন এ ব্যাপারে সরকার বাহাদুরের নির্দিষ্ট নির্দেশ আছে। এতএব এর মধ্যে ঠাট্টার কিছু থাকতে পারে না। মীরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার জন্য ব্যস্ত। বাপু ও অন্যান্যদের পাহারা দেবার জন্য যে সমস্ত সিকুরিটি অফিসার ছিল তাদের তুলে নেওয়া হল। মীরা, গান্ধী, ও অন্যান্যরা যথারীতি তৈরি। পরদিন প্রত্যূষে ঘুমথেকে উঠে মীরা বাপুর সঙ্গে কস্তুরাবার সমাধিতে গেলেন। রোজদিনের মতন সেদিনও বাপু পত্নীর সমাধিতে মালা দিলেন। সেখানে বসে কিছুক্ষণ গীতা পাঠ করলেন।

এদিকে বাপুকে সকাল ৮ টার মধ্যে জেল ছাড়ার নির্দেশ নিয়ে কর্তব্যরত অফিসার অপেক্ষারত। যে মুহূর্তে বাপু কস্তুরাবার সমাধি থেকে এসে তাঁর ঘরে ঢুকলেন ঠিক সেই মুহূর্তেই আদেশখানা বাপুর হাতে তুলে দিলেন। বাপু বুঝতে পারলেন আগা খাঁ প্রাসাদে আর এক মুহূর্তও থাকা সম্ভব নয়। সকলকে সঙ্গে নিয়ে বাপু প্রথমে গেলেন জুহু'তে। তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে। সেখানে তিনি দু'চারদিন থাকবেন।

বাপু গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন। কংগ্রেসী নেতারা তখন জেলে। কিছু ছাত্রকে ছেড়ে দেওয়া

হয়েছে জেল থেকে। কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় লোকেরা এবং সাধারণ মানুষজন বাপু সন্দর্শনে আসতে লাগলেন। তাদের সঙ্গে বাপু দেখা করছেন। তবে সময় দিচ্ছেন না বেশি। এক একজনের ভাগে হয়ত মিনিট খানিক সময় পড়ছে। বাপু এতে দুর্বল হয়ে পড়ছেন।

বাপুর সঙ্গে যাতে লোকজন বেশি কথাবলতে না পারে সেজন্য সজাগ দৃষ্টি ছিল মীরার। এর মধ্যে সরোজিনী দেবীও এসে উপস্থিত। তাঁর শরীরও খারাপ। তবুও বাপুর জন্য তিনি যেন নিজের জীবন দানেও প্রস্তুত। তিনি প্রচণ্ড আলাপী। জমিয়ে গল্প করতে এবং লোকের মনের গভীরে নাড়া দিতে তাঁর কথাগুলির ভূমিকা অপরিসীম। প্রচণ্ড আমুদে সরোজিনী, দ্বিতীয়ত তাঁর কথায় রয়েছে মারপ্যাঁচ।

বাপু কিন্তু জুহুতে এসে দেখতে পেলেন দেশ দুর্ভিক্ষের কবলে, নতুন অর্ডিন্যান্স রুল জারি হয়েছে, চলছে প্রভূত অত্যাচার, সংবাদপত্র রেডিও প্রভৃতির নিরপেক্ষ প্রচারের স্বাধীনতা খর্ব। হাজার হাজার কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সদস্য/সদস্যা কারাগারে। নরমপন্থীরা সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে অচল অবস্থার অবসান ঘটাতে চান। সব চেষ্টাই বৃথা। সকলেই সকলের কথায় অটল থাকতে বদ্ধপরিকর। তাই সুরাহার পথ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

তখন সব কংগ্রেস সদস্যই বাপুর দিকে তাকিয়ে। বাপুকে কংগ্রেসের হাল ধরার জন্য অনুরোধ করছেন তাঁরা। বাপু ভাইসরয়কে বিস্তারিত জানিয়ে চিঠি দিলেন। তিনি ভাইসরয়ের কাছে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিব সদস্যদের সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুমতি চাইলেন। তিনি ভাইসরয়কে জানালেন সাধারণ লোকের দুরবস্থা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু ব্যবস্থা নিতে চান তিনি। তাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটা সাধারণ সভা ডাকতে তিনি অগ্রহী। ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্য তখনও জেলে। ভাইসরয় ওয়াভেল প্রচণ্ড গান্ধীবিদ্বেষী। তিনি গান্ধীর চিঠির কোন উত্তর দিলেন না।

বাপু ক্ষুব্ধ। ভেতরে ভেতরে সরকার বিরোধী আন্দোলনের জন্য তিনি তৈরি হচ্ছেন। সরকারের অত্যাচারে জনগণ অতিষ্ঠ, বাপুর পেছনে তাই ভারতবাসী এককাট্টা। বাপুর শুধু আহ্বানের অপেক্ষায় তারা।

জুহুতে বাপু কাটালেন মাসেক কাল। তারপর বাপুকে পাঁচগনী নামক একটি পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাসে নিয়ে যাবার দিন স্থির হল। এটি পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় একটি স্বাস্থ্যনিবাস।

বত্রিশ

দেশের এরকম একটা সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্যেও মীরা গ্রামীণ উন্নতি বিধানে সচেষ্ট। তিনি নতুন কিছু পরিকল্পনা হাতে নিতে চান। আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দি অবস্থায় থাকাকালীন তিনি এ সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকরি করার জন্য একটা সুন্দর ছক করে রেখেছেন। তিনি উত্তর ভারতে হিমালয়ের সন্নিকটে একটি বিরাট শস্য খামার ও পশুপালন কেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মীরা বাপুকে তাঁর পরিকল্পনার কথা খুলে বললেন। বাপু কিছু সময় নিলেন তাঁর মত

প্রকাশের জন্য। বাপু মত দিলেন। তবে মীরাকে বলে দিলেন এত বড় পরিকল্পনা কার্যকরি করার জন্য তিনি যেন একটা 'ট্রাস্টি বোর্ড' গঠন করেন। মীরা এতে সম্মতি দিতে পারলেন না। মীরা এতদিন ভারতের জনগণের সঙ্গে মিশে তাদের চরিত্র সম্বন্ধে সচেতন। মীরা সবরমতি আশ্রমের আশ্রমবাসীদের মানসিকতা দারুণভাবে উপলব্ধি করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে ভারতীয়দের সঙ্গে মিশেছেন এবং বুঝেছেন ট্রাস্টীবোর্ড গঠন করে কাজ করতে গেলে তাঁর আসল কাজ সিদ্ধ হবে না। উপরন্তু তিনি কতকগুলি অদূরদর্শী লোকের খপ্পরে পড়বেন।

মীরা বাপুকে সব কিছু বুঝিয়ে বললেন। বাপু মীরার কথা অনুধাবন করলেন। তাই মীরাকে তিনি তাঁর ইচ্ছেমত পরিকল্পনাটি কার্যকরী করার অনুমতি দিলেন। মীরা আনন্দিত।

মীরার ইচ্ছে কৃষি এবং পশুপালন নিয়ে বিরাট কর্মজজ্ঞ আরম্ভ করবেন। জমি পাওয়া গেল। রুরকি এবং হরিদ্বার যাবার পথে পড়ে এই জমি। বলা যায় হিমালয়ের পাদদেশেই বিশাল পতিত জমি রয়েছে। পাশে রয়েছে একটি গ্রাম। সেই গ্রামের লোক সংখ্যা খুব বেশি নয়। হিন্দু মুশ্লিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকের বসতি সেই গ্রামে। সেই গ্রামে রয়েছে দু'শটি তাঁতির বাড়ি।

মীরা জানতেন বাপুর মূল চিন্তা খাদির প্রসার ও প্রচার। তাই মীরা এই তাঁতিদের দিয়ে খাদি বস্ত্র তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন প্রথমে। মীরা দশ একর জমি নিয়ে কাজ শুরু করলেন। জায়গাটা ঘিরে দেওয়া হল। তাঁতিদের নিয়ে খাদির কাজ শুরু করলেন।

স্থানীয় লোকদের দিয়ে মাটির বাড়ি তৈরি করা হল। শক্তমাটির বাড়ি তৈরি করল স্থানীয় হরিজনরা। ছিমছাম বাড়িঘর। এরমধ্যে বাপুর নির্দেশে দু'জন লোক এসে মীরার সঙ্গে যোগ দিলেন। একজনের নাম ধর্মপাল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত চতুর। গ্রমের উন্নতি কল্পে বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণে তিনি সিদ্ধহস্ত। আর একজন বৈদ্য। অভিজ্ঞ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক।

মীরা তাঁদের থাকার জন্য দু'টি কুটির তৈরি করালেন। মাটি দিয়েই তৈরি। তৈরি হলো গোয়ালঘর। কয়েকটি গাভী যোগাড় হলো। গরু ও গাভীতে মিলে ৬/৭ টি হবে। তার মধ্যে একটা গাভী ছিল মেজাজী, মীরা তার নাম দিয়েছিলেন যমুনা। ভয়ঙ্কর মেজাজী গাভীটি। তার সিংদু'টি ছিল প্রচণ্ড ধারালো। সামনে কাউকেও দেখতে পেলে গুঁতোতে একটুও সময় নেয় না। সকলেই তাকে ভয় পায়।

দুধ দোহন করা কষ্টসাধ্য। মীরা ছাড়া কাউকেও পছন্দ করে না। গাভীটি মীরারই বশংবদ। এতদিন গাভিটির দুধ দোহন করার জন্য গ্রাম থেকে দু'জন অভিজ্ঞ গোয়ালাকে নিয়ে আসা হতো। এখন মীরা একাই তাকে সামলাতে পারে।

জানুয়ারি মাস এসে গেল। শীতের মাঝামাঝি সময়। অসম্ভব শীত। চারদিকে বরফ আর বরফ। তার উপর বৃষ্টি। মীরাদের ছোট কুটির। হাড়কাঁপানো শীত। সকলেই শীতে কাঁপছে। কয়েকদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে রাস্তা-ঘাট-মাঠ কর্দমাক্ত। গ্রামবাসীরা বলতে লাগলো তারা এরকম বৃষ্টি তাদের জীবনে দেখেনি।

ধীরে ধীরে বৃষ্টির বেগ এলো কমে। আকাশ থেকে ঘন মেঘের আবরণখানি সরে গেল। রোদের রেখা দেখা গেল। মানুষের মনে আনন্দের বান ডাকলো। অদূরে হিমালয়

শৃঙ্গে সূর্যের আলোর রশ্মি প্রতিভাত হলো। সূর্যস্নাত হিমালয়ের বরফে ঢাকা চূড়া অপরূপ সুষমায় বিরাজ করতে লাগল। মীরা সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রাণভরে উপভোগ করতে লাগলেন। স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবের আবাসভূমি হিমালয় যেন মীরাকে আহ্বান করতে লাগল। মীরা তন্দ্রাচ্ছন্ন। আবিষ্টমনে কি যেন বলে চললেন।

এখন সূর্যের সুন্দর কিরণ। শীতের মাত্রাটা কিছুটা কম। আশ্রম গড়ার কাজ চলতে লাগল পুরোদমে। আরও কয়েকটি গোয়াল ঘর তৈরি হল এর মধ্যে। তৈরি হল ভাঁড়ার ঘর। মীরার কুটিরের পাশে আরও কয়েকটি কুটির তৈরি হল। দু'টি কুটির মজদুরের জন্য। আর একটি বাপুর জন্য। মীরা জানেন বাপু সুযোগ পেলেই আশ্রমে আসবেন।

মীরা বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যস্ত। চারদিকে ছুটাছুটি করছেন। এমন সময়-হঠাৎ এক দুঃখজনক খবর এসে মীরাকে কঠোর আঘাত করল। মীরা সংবাদপত্র মারফৎ জানতে পারলেন তাঁর উপাস্য দেবতা সদৃশ বিদগ্ধ জন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ও মানবপ্রেমিক রম্যাঁ রল্যাঁ ইহলোকে নেই। রল্যাঁর মৃত্যু সংবাদে মীরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। কাউকেও কিছু না বলে নিজের কুটিরে গিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। তাঁর চোখদু'টি ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল। গন্ডদেশ থেকে আবিরল ধারায় অশ্রুগড়িয়ে পড়তে লাগল। তাঁকে সান্ত্বনা দেবার মতন তখন সেখানে কেউ উপস্থিত ছিলেন না। তিনি কোন ক্রমে নিজেকে সামলিয়ে নিলেন, মানুষ মরণশীল। তবুও প্রিয়জনের বিয়োগব্যথা সে সহ্য করতে পারে না। সময় মানুষকে ধীরে ধীরে সুস্থির করে তোলে। আপন জনের বিয়োগব্যথা সময়ের স্রোতে মিলিয়ে যায়। মানুষের হৃদয় নতুন ভাবনা চিন্তায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। যিনি চলে গেলেন-তিনি সুখি.

সুখ-দুঃখ ভরা এ ভূমণ্ডলে মানুষের জন্ম-মৃত্যুর লীলা খেলা আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। এই চলার বিরাম নেই। আপনগতিতেই ছুটে চলেছে। তাই সেক্সপীয়ার পৃথিবীকে তুলনা করেছেন রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে। মানুষ আসে এ রঙ্গমঞ্চে কিছুদিন অভিনয় করার জন্য। এক একজন অভিনেতা তার অভিনয়ের পরিসমাপ্তির পর চলে যায় অজানা অচেনা দেশে। রক্ত মাংসের মানুষের সেখানে প্রবেশের কোন অধিকার থাকে না। মীরা মন আস্তে আস্তে সুস্থির হয়ে উঠল।

মীরা আস্তে আস্তে আশ্রমের কাজে মনোনিবেশ করলেন। বাপুকে চিঠি দিলেন। আশ্রমের কি নাম দেবেন তা জানতে চাইলেন। মীরা জানালেন যে তিনি আশ্রমের নাম দিতে চান "কিষাণ-আশ্রম"। ২৭ শে জানুয়ারি ১৯৪৪ বাপু মীরার চিঠির উত্তর দিলেন। বাপু জানালেন যে তিনি আশ্রমের নাম "মজদুর আশ্রম" দেবার পক্ষপতি। মীরা বাপুর দেওয়া নামটি পছন্দ করলেন না। বাপুকে ফেরত ডাকে তা জানিয়ে দিলেন মীরা। বাপুর মীরার মানসিকতা উপলব্ধি করে আশ্রমের নামটি "কিষাণ আশ্রম" রাখতে সম্মত হলেন।

শীত অতিক্রান্ত। বসন্ত এসে গেছে। মীরা চিন্তিত। বাপুর আশ্রমে আসার সুযোগ হলো না। বাপু ব্যস্ত। ভীষণভাবেই ব্যস্ত। ভারত ছাড়ো আন্দোলন স্তিমিত প্রায়। ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন গান্ধীজির মনে। তিনি একাই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। সঙ্গীসাথীরা তখনো জেলে। তাই কাকে নিয়ে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আলোচনা করবেন। তিনিও খানিকটা নিস্তেজ। যেন মৃতপ্রায় সৈনিক। তবুও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রদূত তিনিই। তিনি ত একদম চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না।

এখানে ভারতছাড়ো আন্দোলন সম্পর্কে বাপুর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কিছু কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কংগ্রেস রিপোর্ট-এ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধীজির মনোভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, গান্ধীজি গভীর চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতকে যদি অংশ নিতে হয় বা বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করতে হয় তবে ব্রিটিশ সরকারের সর্বাগ্রে ভারত ছাড়া প্রয়োজন"।

কেন না প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকার ভারতবাসীকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যুদ্ধশেষে ইংরেজ সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেনি। এতদ্‌ভিন্ন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জাপানের ক্রমাগত জয়, ভারতবাসীর উপর ইংরেজ সরকারের নিষ্ঠুর উৎপীড়ন, ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে ব্রিটেনের ব্যবহারে মার্কিণযুক্তরাষ্ট্র ও চীন প্রজাতন্ত্রের অসন্তোষ - প্রভৃতি গান্ধীজির মনোরাজ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এই কথা সত্যি যে ১৯৪২ সালে গান্ধীজি ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরোধী ছিলেন। তবে আগস্ট আন্দোলনের শেষে ১৯৪৪ সালে শেষে তিনি সরকারের সঙ্গে আপস মীমাংসার কথা বলেন তখনই তিনি যুদ্ধে সহযোগিতার প্রস্তাব দেন।

যাই হোক-মুক্তি লাভ করে গান্ধীজি দু'টি প্রচেষ্টা খুব দ্রুত গতিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি মুস্লিম লীগের সঙ্গে পাকিস্তান দাবি নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন। দ্বিতীয়ত তিনি সরকারের সঙ্গে আপস আলোচনা চালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন।

গান্ধীর বুঝতে অসুবিধে হল না যে জিন্নার পাকিস্তান দাবী না মানলে দেশে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হবে। তবে গান্ধী যে ভারত ভাগের ঘোর বিরোধী। এ দেশটাকে যে ভাগ করে শাসন করা ব্রিটিশের লক্ষ্য। তা গান্ধী ভালভাবেই জানতেন। এর মধ্যে রয়েছে আবার অনগ্রসর সম্প্রদায়, তাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থার কথা স্বীকৃত হয়েছে 'ম্যাকডোনাল্ডের' সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা চুক্তিতে। তদুপরি রয়েছে রাজন্যদের রাজ্য। সব নিয়ে গান্ধীর চিন্তা। মনোবল থাকলেকি হবে, কিভাবে এ সমস্ত জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব তা ভাবতে ভাবতে গান্ধী ক্লান্ত।

গান্ধীর জিন্নার সঙ্গে বেশি মাখামাখি বা দেশভাগ নিয়ে কথাবার্তা ভারতের হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়কে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। মৌলানা আজাদ দ্বিধাহীন চিত্তে বলেছেন যে, জিন্নার সঙ্গে গান্ধীর এই আলোচনা ছিল বিরাট এক রাজনীতিক ভুল। তাঁর মতে গান্ধীজি জিন্নার রাজনীতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পেরে জিন্নাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেন। জিন্না বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। তারপর থেকেই তাঁর রাজনীতিক গুরুত্ব ক্রমশ কমতে থাকে। গান্ধীজি তাঁকে অধিক গুরুত্ব দেন। ফলে মুস্লিম সম্প্রদায়ের উঁচুশ্রেণীর এক বিপুল অংশ জিন্নার উপর তাদের রাজনীতির ভবিষ্যৎ আশা ভরসা নির্ভরশীল বলে মনে করতে থাকে। আজাদ মনে করেন গান্ধীজির হঠাৎ জিন্না-প্রীতির জন্য ভারতবাসীকে বিরাট মূল্য দিতে হয়েছে। ১৯৪৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত গান্ধী জিন্নাকে স্বমতে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু জিন্না দেশ ভাগের সিদ্ধান্তে অর্থাৎ পাকিস্তানের দাবিতে অটল থাকেন। গান্ধীর সঙ্গে তাঁর আলোচনা ভেঙ্গে যায়।

জিন্না স্পষ্টভাষায় সরকারকে জানিয়ে দিলেন যে ভারতে হিন্দু ও মুস্লিম দু'টি আলাদা জাতি। মুস্লিমরা নিজেদের ভারতীয় বলে মনে করে না। ভারতীয় এ কথাটা হিন্দু ও মুস্লিম

উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যবলে জিন্না মনে করেন না। ব্রিটিশ সরকার জিন্নাকে দাবার ঘুঁটির মতন ব্যবহার করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের কাজে সাফল্যও অর্জন করে।

গান্ধীজি আবার সরকারকে বললেন যে যুদ্ধের পর ভারতকে স্বাধীনতা দেবার স্বীকৃতি দিলে ভারত ইংলণ্ডকে যুদ্ধে সহযোগিতা করতে অনিচ্ছুক হবে না। ব্রিটিশরা এই ব্যাপারে পূর্বের ন্যায় তাঁর কথার কোন গুরুত্ব দিল না।

আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে ক্রিপস প্রস্তাব গান্ধীজি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর থেকেই গান্ধীজি ভারতের স্বাধীনতার জন্য ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেবার কথা চিন্তা করেন।

এখানে ক্রিপস প্রস্তাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু' চারটা কথা উল্লেখিত হল। ১৯৪১ সালের জুন মাসে জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করল, ডিসেম্বরে জাপান আক্রমণ করল পার্লহারবার। সমগ্র বিশ্ব উঠল কেঁপে। যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র বিশ্বে। জার্মানি পোলাণ্ড, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে ও ফ্রান্স দখল করে নিল। জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাদের আধিপত্য বিস্তার করল। এশিয়ার রণাঙ্গনে জাপান দুর্দান্ত ভাবে এগিয়ে চলল। ১৯৪২ এর মার্চে পতন ঘটল বার্মার। জাপান ব্রিটেনের হাত থেকে বার্মা ছিনিয়ে নিল।

ব্রিটিশসরকার বিপর্যস্ত। ভারতের পুরোপুরি সক্রিয় সহযোগিতার যে একান্ত প্রয়োজন তা তারা অনুভব করল। বিশিষ্ট আইনজীবী যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠালো ব্রিটিশ সরকার। ক্রিপস সমাজবাদী। ভারতবিশেষজ্ঞ। ভারতবাসীর আশা আকাঙ্খার প্রতি সহানুভূতিশীল। জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত।

ক্রিপসকে তদানীন্তন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা একটি প্রস্তাবের খসড়া করে দিয়ে ভারতে পাঠালো। সেটা নিয়ে আলোচনা হল গান্ধীজির সঙ্গে। অন্যান্য রাজনীতিবিদরা ক্রিপসের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। কিন্তু কোন ফল হল না। ক্রিপসের প্রস্তাব কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। প্রস্তাবগুলি ছিল "যুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই ভারতবর্ষকে 'ডোমিনিয়নের' মর্যাদা দেওয়া হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে যাবার অধিকারও ভারতবর্ষের থাকবে। এই প্রস্তাবকে কার্যকরি করার জন্য যুদ্ধ শেষ হবার পরেই একটি কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি গঠিত হবে এবং অ্যাসেম্বলির সদস্যরা আসবেন ব্রিটিশ অধিকৃত ভারত এবং দেশীয় রাজা— দু'জায়গা থেকেই। ব্রিটিশ ভারতের সদস্যরা প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নিম্নতর কক্ষের দ্বারা নির্বাচিত হবেন, কিন্তু দেশীয় রাজ্যসমূহের সদস্যদের দেশীয় রাজারা মনোনয়ন করে পাঠাবেন। যে কোন প্রদেশ ইচ্ছে করলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আওতার বাইরে থাকতে পারবে এবং সরাসরিভাবে ব্রিটেনের সঙ্গে আলোচনা চালাতে পারবে। ইত্যাদি"।

"যুদ্ধচলার সময় কোন সাংবিধানিক পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি এই প্রস্তাবগুলিতে দেওয়া হয়নি, তবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আশা করেছিলেন যে একটি "জাতীয় সরকার" সংগঠনে ও তাকে সক্রিয় রাখার জন্য ভারতীয় দলগুলি ও নেতারা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী হবেন।

প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃত সামরিক বিষয়গুলি ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষরই অধীনে থাকবে। তবে প্রতিরক্ষা সদস্য হিসেবে একজন ভারতীয়ও থাকবেন।

ক্রিপস প্রস্তাবকে সব পার্টিই প্রত্যাখ্যান করল। যে কোন প্রদেশকে ইচ্ছেমত স্বতন্ত্র

থাকার অধিকার দেওয়ার নীতিকে কংগ্রেস স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে কিছু সদস্য নির্বাচন ছাড়াই আসতে পারবেন-এ প্রস্তাব ও কংগ্রেস মানতে পারল না বলে গান্ধী মন্তব্য করলেন। কংগ্রেস এ প্রস্তাব মেনে নিলনা। তাদের দাবী ছিল ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধে ভারত বাসীর সাহায্য চাইলে অবিলম্বে ভারতকে স্বায়ত্ত শাসন-এর অধিকার দিতে হবে। কোন প্রদেশ ইচ্ছে করলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকতে পারবে এই প্রস্তাবকে মুশ্লিম লীগ সাদরে গ্রহণ করতে স্বীকৃতি জানালেন।

ভারত দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাবে এই দাবীগুলি মানলে তাই হিন্দু মহাসভা ক্রিপস প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করলেন। শিখরা ভীত। পাঞ্জাবে মুশ্লিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। শিখরা মনে করলো সংখ্যাগরিষ্ঠ মুশ্লিমরা ভারতীয় রাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যাবে।

হরিজন এবং দলিত সম্প্রদায়ের নেতা আহমেদকর মনে করলেন ক্রিপস প্রস্তাব মেনে নিলে হরিজনদের নির্ভর করতে হবে বর্নহিন্দুদের করুণার উপর।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার মতন প্রথম সারির প্রায় কোন নেতাই বাইরে না থাকায় নেতৃত্বহীন আন্দোলন সহিংস আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। গান্ধীজি বন্দি অবস্থায় আগা খাঁ প্রাসাদে থাকায় বেশ কিছুদিন আন্দোলনের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর কোনই ধারণা জন্মাতে পারেনি।

তবে জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমোনোহর লোহিয়া, অরুণা আসফ আলি, অচ্যুৎ পট্টবর্ধন প্রমুখ ছিলেন সহিংস আন্দোলনের নেতা।

কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য যখন জেলে তখন জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ কয়েকজন নেতার নেতৃত্বে আগস্ট আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। সরকার সামরিক আইন জারি করল না কিন্তু দেশের সর্বত্র ত্রাসের সঞ্চার করল। শাস্তিদান অর্ডিন্যান্স, যৌথ জরিমানা অর্ডিন্যান্স, কষাঘাত অর্ডিন্যান্স, বিশেষ আদালত প্রভৃতি জারি করে ভারতবাসীকে ভীতি-বিহ্বল করে তুলল।

কলকাতা, চট্টগ্রাম, ফেনীতে বিমান থেকে গুলি করে প্রায় সাড়ে তিনশ লোককে হত্যা করল। আহত হল প্রায় চারশ ষাট জন। সরকারি হিসেব অনুযায়ী পুলিশও সৈন্যদের গুলিতে এক হাজার আটাশজন আন্দোলনকারি নিহত হল। আহত হল প্রায় তিন হাজার দু'শ। বেসরকারি হিসেবে জানা যায় আগস্ট আন্দোলনে মৃতের সংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার। তবে নেহরুর বক্তব্য অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা দশ হাজারের কাছাকাছি।

১৯৪২ এর বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে। সংগঠন হীন, নেতাহীন, পরিমাণমত ও উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের অভাব জনগণকে সাম্রাজ্যবাদী প্রচণ্ড শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছে। তবে এই বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে একথা বলা যায় না। এ বিদ্রোহের সার্থকতার চিহ্ন পাওয়া যায় অন্তত দু'টি ক্ষেত্রে।

এ বিদ্রোহে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের ক্রোধ, স্বাধীনতার জন্য তাদের অজেয় সংকল্প অত্যন্ত কঠোরভাবে আত্মপ্রকাশ করে। জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার স্বাদলাভের জন্য অগণিত ভারতবাসী যে নিদারুণ নিপীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করেছে, বরণ করেছে আত্মত্যাগ-এ বিদ্রোহ তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয়ত বিয়াল্লিশের বিদ্রোহ ব্রিটিশরাজকে বুঝিয়ে দিল ভারতবর্ষের উপর তাদের

আধিপত্যের অবসান আসন্ন। এই বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তিম পর্যায় বলা যায়।

১৯৪৫ সালের বসন্তকালে ইউরোপের যুদ্ধ নিস্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। তখন ভারতের ভাইসরয় ওয়াভেল। তিনি লিনলিথগোব স্থলাভিষিক্ত। লিনলিথগোর সময় ওয়াভেল সহ বিশ্বের যুদ্ধবিশারদদের ধারণা ছিল ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হলেও জাপানের সঙ্গে অন্তত আরও এক বছর যুদ্ধ চলবে। আগস্ট মাসে আমেরিকার জাপানের নাগাসিকি ও হিরোশিমা শহরের উপর আনবিক বোমা বর্ষণে যুদ্ধের গতি গেল ঘুরে। জাপানকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হল। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত ওয়াভেল ও অন্যান্য যুদ্ধবিশারদরা জাপানের এত তাড়াতাড়ি আত্মসমর্পণের কথা চিন্তা করতে পারেননি। ওয়াভেল এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চিন্তা করে রাখলেন জাপানের সঙ্গে একবছর যুদ্ধ চালাতে হলে ভারতভূখণ্ডে শক্ত যুদ্ধঘাঁটি স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। সঙ্গে যুদ্ধের জন্য ভারতীয় অর্থসম্পদের উপর ইংলণ্ডকে নির্ভর করতে হবে বহুল পরিমাণে। তখন ভারতের রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমপর্যায়ে। সুচতুর ওয়াভেল এবং ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা বুঝতে পারলেন ভারতীয় জনগণ ও রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন।

ইউরোপে যুদ্ধের অবসান ঘটল ১৯৪৫-এর এপ্রিল মাসে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল করলেন পদত্যাগ। নতুন করে নির্বাচন হল। নির্বাচনে জয়লাভ করল শ্রমিকদল। নতুন প্রধান মন্ত্রী হলেন অ্যাটলি। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা ভারতের ব্যাপারে কিছু নতুন প্রস্তাব ঘোষণা করল। স্থির হল ১৯৩৫ সালের ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের কাঠামোর মধ্যে রেখে ভারতবর্ষে আরও কিছু সাংবিধানিক পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন। গান্ধীজিকে আগেই জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসের প্রথম শ্রেণীর অন্যান্য নেতাদেরও মুক্তি দেওয়া হল।

ওয়াভেল ভালোভাবে বুঝতে পারলেন জাপান ও আজাদহিন্দ বাহিনীদের পর্য্যুদস্ত করতে হলে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে একটা আপসরফা করতেই হবে। এর মধ্যে ওয়াভেল ইংলণ্ড গেলেন। মন্ত্রীসভার সঙ্গে গভীরভাবে আলোচনা করলেন। এই পরিস্থিতিতে কি করা যায় তা ভেবে তাঁরা চিন্তিত। ওয়াভেল ফিরে এলেন মার্চ মাসে।

ফিরে এসে স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন পঁচিশে জুন ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে সিমলাতে দীর্ঘ আলোচনা সভায় বসবেন। সেখানে সব দলের নেতারা উপস্থিত থাকবেন। কংগ্রেস-এর সব সদস্যই ছাড়া পেলেন। তাদের নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে ওয়াভেল কথা বললেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সব সদস্য তখন মুক্ত। বাপুর ইচ্ছে সিমলা বৈঠকে পরিদর্শক হিসেবে উপস্থিত হবেন। সিমলা সম্মেলনে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার নতুন প্রস্তাব নিয়ে ওয়াভেল উপস্থিত।

বাপু মীরা সহ সিমলা সম্মেলনে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে কংগ্রেসের প্রথম সারির সব নেতা। অন্যান্য দলের গণ্যমাণ্য নেতারাও সেখানে উপস্থিত। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এবং অন্যান্য দলের সদস্যরা ক্লান্ত। দীর্ঘ ৩৪ মাস তাঁরা জেলে অবরুদ্ধ ছিলেন। সদ্য পেয়েছেন ছাড়া। বিশ্রামের সময়ও তাঁরা পাননি। মুক্তি পেয়ে ছুটতে হয়েছে সিমলা। জিন্নাও মুস্লিম লীগের প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে উপস্থিত। বলা যেতে পারে সিমলা সম্মেলন বানচাল করাটাই যেন তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি যেন মুস্লিম লীগের অগ্রদূত হিসেবে এ সম্মেলনে উপস্থিত। সম্মেলন চলল ১৪ ই জুলাই পর্যন্ত।

ওয়াভেল বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার প্রস্তাবগুলি নিয়ে শুরু হলো রুদ্ধদ্বার আলোচনা। প্রস্তাবগুলো মূলত ছিল অসন্তোষজনক। এবং বলতে গেলে একটা প্রস্তাব ছিল প্ররোচনামূলক। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রস্তাবগুলি সন্তোষজনক ছিল। তবে মূল প্রস্তাবের মধ্যে অসন্তোসের ভাব ছিল প্রবল। এমনকি প্ররোচনামূলকও বটে।

প্রস্তাবে বলা হল ভাইরসরয়-এর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে ভাই সরয় নিজে থাকবেন আর থাকবেন ব্রিটিশ ভারতের প্রধান সেনাধ্যক্ষ। অন্যান্য সদস্যরা থাকবেন ভারতীয়দের মধ্য থেকে। ভাইসরয়-এর ক্ষমতা অক্ষুন্ন থাকবে। তবে সে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ভাইসরয়-এর কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়া গেল যে তিনি তাঁর কোন ক্ষমতা 'অযৌক্তিক ভাবে' প্রয়োগ করবেন না।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ছিল অতীব বিতর্কিত। বলাচলে মুস্লিমলীগ এতদিন যা আদায় করতে চাইছিল তাই যেন সরকার মেনে নিতে বদ্ধকর। এই প্রস্তাবে বলা হল বর্ণ হিন্দু এবং মুস্লিমদের সদস্য সংখ্যা সমানুপাতিক হারে থাকবে। এটা মুস্লিম লীগের দাবী। প্রকারান্তরে ওয়াভেল সাহেব এবং ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা ভারতে হিন্দু ও মুস্লিমদের মধ্যে "ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল"-এই নীতি চালু করে ঘোলা জলে মাছ ধরার পরিকল্পনা করল।

সম্মেলন আরম্ভ হল এরকম পরিবেশে, ক্রমে প্রস্তাবগুলি পেশ করা হল। জিন্না সাহেবের অনমনীয় মনোভাব আর তাঁকে ব্রিটিশ প্রতিভূ ওয়াভেলের সমর্থন সম্মেলনের সাফল্য ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠল। জিন্না জেদ ধরলেন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মুস্লিম সদস্যদের নির্বাচন করবার একমাত্র অধিকারী হবে মুস্লিম লীগ। কংগ্রেসের পক্ষে এ দাবী মেনে নেওয়া সম্ভব হল না। কেননা কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী মুস্লিম সদস্যও ছিল প্রচুর। সম্মেলন গেল ভেস্তে। ভারতবাসী "বিভাজন ও শাসন" নীতির স্বীকার হল। "বিভাজন ও শাসন" ব্রিটিশের এই কূটনীতিতে দেশে আরম্ভ হল বলা চলে গৃহযুদ্ধ। হিন্দু মুস্লিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নগ্নরূপে আত্ম প্রকাশ করল ১৯৪৭ সালের দাঙ্গা এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা যে যাঁর জায়গায় ফিরে গেলেন। গান্ধী চলে গেলেন পুনা। সেখানে তিনি একটা 'নেচার কিওর হাসপাতাল' খুললেন। তিনি সম্পূর্ণ ভাবে জনসাধারণের সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। মীরা চলে গেলেন তাঁর কিষাণ আশ্রমে। চারদিকে এক স্তব্ধ ও হতাশ পরিবেশ ভারতবর্ষের পরিমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

তেত্রিশ

মীরা কিষাণ আশ্রমের কলেবর বৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি মানসে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। কিষাণ আশ্রমে বর্তমানে পশুর সংখ্যা দাঁড়ালো চারটা গরু ও চারটা বাছুর, দু'টো বলদ এবং মীরার নিজস্ব ছোট্ট একটা ঘোড়া, মীরা ঘোড়াটি চড়ে সমগ্র গ্রাম পরিভ্রমণ করতেন। আশ্রমে ক্রমে কাজের লোকের ভিড় জমতে লাগল। এর-মধ্যে সুতোকাটা এবং গুটি পোকা থেকে সুতো বের করার অতি নিপূণ একজন কর্মচারীর সন্ধান পাওয়া গেল। সঙ্গে জুটে গেল একজন সমাজসেবক। তাঁর নাম "রামজী ভাই' গ্রামের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন তিনি।

আশ্রমে কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ-ও ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল। কাপড়গুলিতে নানা ধরনের রঙ লাগানোর কাজ চলতে লাগল। অপূর্ব সব চোখ ধাঁধানো খাদি কাপড় তৈরী হল মহিলাদের জন্য। পুরুষদের জামার কাপড়, পরনের ধূতি নিখুঁত।

আশ্রমে জামা কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ-ও ক্রমাগত বেড়ে যেতে লাগল। এ সমস্ত জামা কাপড় বিক্রী করে ভালো পয়সাও আসতে লাগল। সুভাষ চন্দ্র তখন জাপানে। তিনি ১৯৪১ সালের ১৬ ই জানুয়ারি কলকাতা থেকে ব্রিটিশরাজের অতন্দ্রপ্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে নানান দুঃখ কষ্ট সহ্য করে ২রা এপ্রিল জার্মানিতে এসে পৌছলেন। দু' বছর ছিলেন সেখানে। জার্মানীতেই তিনি গড়ে তুললেন ফ্রি ইন্ডিয়া সেন্টার। আর ব্রিটিশের হয়ে যুদ্ধেব্যাপৃত জার্মানীর হাতে ভারতীয় বন্দি সৈন্যদের নিয়ে গড়ে তুললেন এক সশস্ত্র বাহিনী। অচিরেই সুভাষচন্দ্র বুঝতে পারলেন ছয় হাজার মাইল দূর থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। হিটলারও তা ভালোভাবে অনুধাবন করলেন। শেষপর্যন্ত হিটলারের সম্মতি নিয়ে জাপানে এসে পৌছলেন। হিটলারই তাঁর জাপানে যাবার সব ব্যবস্থা করেদিলেন। হিটলার তখন খুবই বিব্রত। রাশিয়ায় জার্মানির সৈন্যরা প্রচণ্ড মার খেয়ে পিছু হাটতে বাধ্য হচ্ছে।

সুভাষ জার্মানি থেকে ডুবোজাহাজে করে জাপান এসে পৌছলেন, ১৯৪৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি তিনি জার্মানীর কিয়েল বন্দর থেকে যাত্রা করেন। নব্বইদিন তিনি ছিলেন জার্মান সাবমেরিনে। শেষ পর্যন্ত এসে পৌছলেন জাপানে। ২রা জুলাই তিনি সিঙ্গাপুরে এলেন রাসবিহারী বসু সহ।

রাসবিহারী বসু জাপানে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গড়ে তুলেছিলেন। যুদ্ধ বন্দি ব্রিটিশ ভারতের সৈন্যদের নিয়ে। সিঙ্গাপুরেই ছিল আজাদহিন্দ ফৌজ-এর প্রধান কার্যালয়। তবে এই আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ার মূল কৃতিত্ব মোহন সিং নামক এক ব্রিটিশ ভারতের বন্দি জেনারেলের। যে কোন কারণেই হোক মোহন সিং-এর উপর আস্তা ঢিলে হয়ে যায় জাপানের। তারা মোহন সিংকে গ্রেপ্তার করে। রাসবিহারীকেই এই ফৌজের সবকর্তৃত্বভার নিতে হয়। পরে সুভাষ জাপানে এলে রাসবিহারী আজাদহিন্দ ফৌজ এর সব দায়িত্ব সুভাষের উপর অর্পণ করেন। তখন রাসবিহারী খুবই অসুস্থ। ক্ষয় রোগে আক্রান্ত।

সুভাষ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যে থেকে এক বিপুল সংখ্যক যুবক নিয়ে এবং বন্দি ভারতীয় সেনাদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজকে আরও শক্তিশালী করে তুলেন। সিঙ্গাপুর বার্মা মালয় প্রভৃতি জায়গায় এই ফৌজের ঘাঁটি তৈরি হল। সুভাষ তার মনমত সদস্যদের নিয়ে গঠন করলেন বিদেশের মাটিতে "অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার"। তার গঠনতন্ত্রও সুভাষ নিজেই তৈরি করেন। রাসবিহারী ছিলেন এই সংস্থার সর্বপ্রধান।

'আজাদ হিন্দ ফৌজ' (প্রথমে যার নাম ছিল 'ইন্ডিয়ান ন্যাশানেল আর্মি')-ছিল ব্রিটিশের অধীনে যুদ্ধরত বন্দি ভারতীয় সেনাদের নিয়ে গঠিত। বিপুল সংখ্যক বন্দি সৈন্যকে নিয়ে সিঙ্গাপুরেই গঠিত হয় এই ফৌজ। নেতাজীর আশা ছিল এই ফৌজ নিয়ে জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে একত্রে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বর্মা, (আরাকান) ইম্ফলে লড়বেন। এবং ইম্ফলের মধ্যে দিয়ে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে পৌছবেন। তাঁর ফৌজের আক্রমণ ইংরেজরা ঠেকাতে পারবে না-এই ছিল নেতাজীর দৃঢ় বিশ্বাস। এবং ভারতের মাটিতে আজাদ হিন্দ ফৌজ পদার্পণ

করলে ভারতীয় সৈন্যরা তাদের সঙ্গে হাত মেলাবে। তারা ব্রিটিশ সরকারের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে নেতাজীর নেতৃত্বে স্বাধীন ভারত সরকার গড়ার কাজে মনপ্রাণ সমর্পণ করবে। কিন্তু নেতাজীর এ স্বপ্ন সফল হলো না।

জাপানের পরাজয়ের পর নেতাজীর জাতীয় বাহিনীর এ পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। নেতাজীর ঘটল আকস্মিক মৃত্যু বা রহস্যজনক অন্তর্ধান। ১৯৪৫ সাল। নভেম্বর মাস। ভারতের বড়লার্ট তখন ওয়াভেল। যুদ্ধ শেষ। পুরোপুরি ভাঁটা পড়েছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে। ওয়াভেল ও তাঁর সেনাপ্রধান হঠাৎ যেন এক অজানা ভয়ে আঁৎকে উঠলো। তিন আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনা প্রধানের বিচার শুরু হচ্ছে লালকেল্লায়। এই বিচারের রায়ে তাঁদের ফাঁসির হুকুম হলো। এই রায়ের কথা শুনে সমস্ত দেশ উঠল জেগে। প্রতিটি ভারতবাসীর রক্ত যেন টগবগ করে ফুটতে লাগলো। নেতাজি ও তাঁর ফৌজের কীর্তিকাহিনী প্রতিটি ভারবাসীর ঘরে ঘরে পৌছে গেল।

গান্ধীজি বললেন, "সারা দেশে এক নবজাগরণ হয়েছে, এমনকি সরকারি সৈন্যদের মধ্যেও এক নতুন রাজনৈতিক চেতনা এসেছে এবং তাঁরা স্বাধীনতার কথা ভাবতে শুরু করেছে।

ওয়েভেল ও অচিনলেখ আবিষ্কার করলেন, "লালকেল্লায় আই এন. এর তথাকথিত ট্রায়েল আসলে সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতা সংগ্রামী সৈন্যবাহিনীর প্রতি দেশবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি। লালকেল্লার চারদিকে স্বাধীন ভারতবর্ষ। নেতাজী'র স্বপ্নের স্বাধীন ভারতবর্ষ জন্মলাভ করল।" ব্রিটিশ আবিষ্কার করল তাদের মস্তবড় ভুল।

কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় শুরু হল লড়াই। জনগণের সঙ্গে ব্রিটিশ পুলিশ ও মিলিটারীর সংঘর্ষে চল্লিশজন মারা গেল। আহত হল তিনশ জনেরও বেশি। মাদ্রাজে ও বোম্বাইতে মারা গেল অনেক। আহত হল কয়েকশ। সমগ্র ভারতবর্ষ যেন রক্তে রঞ্জিত হতে লাগল। ১৯৪৬ সালে পুলিশ ও সেনাবাহিনীতেও দেখা দিল বিদ্রোহ।

জানুয়ারি ১৯৪৬ বোম্বাইয়ের বিমান বাহিনীর ভারতীয় বৈমানিকরা শুরু করল হরতাল। তাঁদের দাবী ছিল বিমান বাহিনীর ব্রিটিশ বৈমানিকদের ন্যায় তাদেরও একই রকম সুযোগ সুবিধে দিতে হবে। ভারতীয় বৈমানিক ও ইংরেজ বৈমানিকদের মধ্যে আর্থিক সুযোগ সুবিধা দানের পার্থক্য রাখা যাবে না।

এর পর শুরু হল বম্বেতে নৌ সেনাদের বিদ্রোহ। বিদ্রোহের শুরু অর্থনৈতিক দাবীদাওয়াকে কেন্দ্র করে। কিন্তু শাসকশ্রেণী এমন ভাব দেখায় যে তারা যেন ভিক্ষা চাইছে। ফলে বিদ্রোহ রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। বিদ্রোহীরা বম্বের ব্যারাকের গেটের উপর পোস্টার লাগায়। পোষ্টারে লেখা থাকে "ইংরেজ ভারত ছাড়ো", হিন্দুস্তান জিন্দাবাদ। শাসক শ্রেণী রেডিও অপারেটর দত্তকে গ্রেপ্তার করে। এর প্রতিবাদে ব্যারাকের নৌসেনারা হরতাল করে ১৮ই ফেব্রুয়ারি। যুদ্ধ জাহাজ তলোয়ার ও অন্যান্য জাহাজের মোট বিশহাজার কর্মচারি হরতালের সামিল হয়। রাস্তায় নৌসেনারা কংগ্রেসও মুস্লিম লীগের পতাকা হাতে বিদ্রোহ দেখায়। এই নৌসেনাদের বিদ্রোহের আগুন মাদ্রাজ-কলকাতা-এমনকি করাচীর নৌসেনাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। শাসক শ্রেণীর ত্রাহি ত্রাহি রব ওঠে।

২১শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ নৌসেনারা বম্বের ভারতীয় নৌসেনাদের প্রবল বেগে আক্রমণ

করে। সাতঘন্টা ধরে এই খন্ড যুদ্ধ চলে। ২১শে ফেব্রুয়ারী এডমিরল গডেফে আলটিমেটাম দেন যেন নৌসেনারা আত্মসমর্পন করে। নচেৎ সম্পূর্ণ ভারতীয় নৌসেনাদের চুরমার করে দেবে। গডেফে ব্রিটিশ ফ্লিটের সাহায্য চেয়ে পাঠায়। ভারতীয় নৌসেনারা কংগ্রেস ও মুশ্লিম লীগের সাহায্য চায়। কিন্তু কংগ্রেস ও মুশ্লিমলীগ তাদের আত্মসমর্পণ করতে অনুরোধ জানায়। আত্মসর্ম্পণ করলে তাঁদের উপর যাতে ব্রিটিশরা কোনরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেয় তার জন্য কংগ্রেস ও মুশ্লিম নেতারা প্রতিশ্রুতি দেন। নৌসেনা ও সেনানায়করা কংগ্রেস বা মুশ্লিমলীগ থেকে কোন সাহায্য পেলেন না। উল্টে তারা চাপ দিতে লাগল নৌ সেনাদের আত্মসমর্পণ করার জন্য। নৌসেনা বিদ্রোহ স্থগিত রাখা হল।

কিন্তু এর সুদূরপ্রসারি ফল ঘটল। স্থল নৌ এবং বিমানবাহিনীর ভারতীয় সৈনিকদের এই বিদ্রোহ ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রীর ও অন্যান্য মন্ত্রীদের চোখের ঘুম কেড়ে নিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ভারতকে স্বাধীনতা দেবার তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তিনি বুঝতে পারলেন, যাদের উপর নির্ভর করে ইংরেজ এতদিন ভারতবর্ষ শাসন করে এসেছে এখন আর তাদের উপর নির্ভর করা অসম্ভব।

অ্যাটলি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য নতুন দিল্লীতে ক্যাবিনেট মিশন পাঠাবার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন। ২৩ শে মার্চ এই মিশন দিল্লী এসে পৌছয়। লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস এবং এ. বি. আলেকজান্ডার ছিলেন কমিশনের সদস্য। কংগ্রেস ও মুশ্লিম লীগের নেতাদের কাছে এ কমিশন এক ফেডারেল রাষ্ট্রের প্রস্তাব রাখে।

ফেডারেল সরকার বৈদেশিক নীতি প্রতিরক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার দায়িত্বে থাকবে- অন্যান্য ব্যাপারে ক্ষমতা থাকবে প্রদেশ ও রাষ্ট্রের উপর। ব্রিটিশ ভারতকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করার পরিকল্পনা করা হল। একটি হবে পাঞ্জাব সিন্ধু উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্থান 'বি' অঞ্চল, দ্বিতীয়টি বাংলা এবং আসাম 'সি' এবং বাদ বাকি সব 'এ' অঞ্চল।

কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হবে একটি সাংবিধানিক সভা নিয়ে। সেখানে থাকবে ২৯৬ জন সাংসদ। তাঁরা নির্বাচিত হবেন সাম্প্রদায়িক ভিত্তির লোকের ভোটের মাধ্যমে। তিনটি অঞ্চলের সদস্যবৃন্দ আলাদাভাবে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চালাতে পারবে। প্রত্যেক প্রদেশকে প্রথম নির্বাচনের পর তাদের ইচ্ছে অনুযায়ি কেন্দ্রীয় নতুন সাংবিধানিক সভায় যোগ দিতে পারবে।

ক্যাবিনেট মিশন একটি অন্তবর্তী সরকার গঠনের পরামর্শ দিল। সেখানে থাকবে কংগ্রেস ও মুশ্লিম লীগের সদস্যরা। এটা হবে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করার পর।

৬ই জুন মুশ্লিমলীগ অন্তবর্তী সরকারে যোগদানের ইচ্ছে প্রকাশ করল। তারা ভেবেছিল কংগ্রেস হয়ত অন্তবর্তী সরকারে যোগ দেবে না। কিন্তু কংগ্রেসের মনোভাব মুশ্লিমলীগ প্রথমে বুঝতে পারেনি। স্থির হলো সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারের ও নির্বাচন হবে। গঠিত হবে রাজ্য বিধানসভা। জিন্না বুঝতে পারলেন কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি এঁটে উঠতে পারবেন না। অন্তবর্তী সরকারে বেশি প্রাধান্য থাকবে কংগ্রেসের। জিন্না অবস্থা পর্যবেক্ষন করে স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন মুশ্লিম লীগ কোনমতে অন্তবর্তী সরকারে যোগ দেবে না। তিনি আলাদা পাকিস্তানের দাবিতে

অটল রইলেন। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবকে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন।

জাতীয়তাবাদী মুস্লিম নেতারা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অন্তবর্তী সরকারে যোগ দেবার পক্ষে মত দিলেন। জিন্না ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি জাতীয়তাবাদী মুস্লিমদের কংগ্রেসের দালাল এবং ইস্‌লামের শত্রু বলে চিহ্নিত করলেন। এবং কংগ্রেসের সঙ্গে কেয়ালিশন সরকারে যোগ দেবার বিপক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখলেন। ক্যাবিনেট মিশনের কাছে জিন্না প্রস্তাব রাখলেন কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে যেন মুস্লিমলীগকে অন্তবর্তী সরকার গঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ক্যাবিনেট মিশন তাতে আপত্তি জানাল। তদুপরি ক্যাবিনেট মিশন বিধানসভার নির্বাচনের প্রস্তাব দিল। কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করল। জিন্না ছিলেন এই প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী। জিন্না তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। জিন্না জানালেন এই পরিস্থিতিতে প্রাদেশিক বিধান সভার নির্বাচন অসম্ভব। জিন্নার কথায় কোন গুরুত্ব দেওয়া হলো না।

গান্ধীজি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে মন্তব্য করলেন যে ক্যাবিনেট মিশনের জিন্নার সঙ্গে এভাবে ব্যবহার করা সমীচীন হয়নি। মুস্লিম লীগ অন্তবর্তী সরকারের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করল। তখন বাংলায় চলছে সারওয়ার্দির সরকার।

ব্রিটিশসরকার কংগ্রেস ও মুস্লিমলীগের মধ্যে মতপার্থক্যের পূর্ণ সুযোগ নিল। ১২ই আগস্ট ভাইসরয় অন্তবর্তী সরকার গঠনের জন্য জওহরলাল নেহরুকে আমন্ত্রণ জানালেন। ক্যাবিনেট মিশন এর মধ্যে দেশে ফিরে গেছে।

মুস্লিম লীগ ১৬ই আগস্ট "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের" ডাক দিল। রাজধানী কলকাতার বুকে ঝড় তুলল জাতিদাঙ্গা। মুস্লিমরা মেতে উঠল হিন্দুনিধনে। সারওয়ার্দি সরকার নির্বিকার। হাজার হাজার হিন্দুর রক্তে কলকাতার রাস্তাঘাট রঞ্জিত। পুলিশের সামনে হিন্দু খুন হচ্ছে। পুলিশ যেন দর্শকমাত্র। দু' তিনদিন এভাবে চলল হিন্দুদের হিমশীতল রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল। তাদের রক্ত উত্তপ্ত। তারা মরিয়া হয়ে উঠল। হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে পাল্টা আক্রমণ চালাল মুস্লিমদের উপর। তখন মুস্লিমরা দিশাহারা। টনক নড়ল সারওয়ার্দির।

সারওয়ার্দি রাস্তায় নামিয়ে দিল সামরিক বাহিনী। অথচ এর আগে এত হিন্দু নিধন হয়েছে তাদের জন্য সারওয়ার্দির হৃদয় কাঁদেনি। ভাইসরয় ওয়াভেলও দিশাহারা। অন্তবর্তী সরকার গঠন করতে ওয়াভেল ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। উপায়ন্তর না দেখে ওয়াভেল নেহরুকে তাড়াতাড়ি অন্তবর্তী সরকার গঠন করতে অনুরোধ করলেন। ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসই সরকার গঠন করল। অক্টোবর মাসে মুস্লিমলীগ অন্তবর্তী সরকারে যোগ দিল। তবে তারা সিদ্ধান্ত নিল সংবিধান রচনার সময় কোনরকম অংশ গ্রহণ তাঁরা করবে না। অর্থাৎ তারা অন্তবর্তী সরকারে যোগদিলেও এই সরকারের রীতিনীতি মানতে রাজি হল না। কনস্টিটউন্টে অ্যাসেম্বলিতে যোগ দিতে রাজি হল না। "স্থবিরতাকে দূর করবার জন্য ৩—৬ ডিসেম্বর লন্ডনে এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়, সে সম্মেলনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলি, ভারতের ভাইসরয় ওয়াভেল, কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল এবং মুস্লিমলীগের সভাপতি জিন্না যোগ দেন। সম্মেলন সাফল্যমন্ডিত হল না।

ভারত অগ্নিগর্ভ। চারদিকে চলছে জাতি দাঙ্গা। ভাইসরয় ওয়াভেল বেসামাল। দাঙ্গা দমনে তিনি ব্যর্থ। জিন্না পাকিস্তানের দাবিতে অটল। ভাইসরয় ডিসেম্বর মাসেই

কনস্টিটউন্ট অ্যাসেম্বলির সদস্যদের নিয়ে একটি মিটিং করলেন। মুস্লিমলীগের সদস্যরা এই সভাতে যোগ দিল না। এই সভাতে অনেকগুলি কমিটি গঠন করা হল। শুরু হলো সংবিধান রচনার কাজ। ভিন্ন ভিন্ন কমিটির উপর ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব। সংবিধান রচনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। আহমদকরকে নিযুক্ত করা হল সংবিধান রচনার সর্বাধিনায়কের পদে।

গান্ধীজি তখন সেবাগ্রামে। এদিকে কলকাতার দাঙ্গার প্রতিবাদে নোয়াখালি তে মুস্লিমরা হিন্দু নিধনে মেতে উঠেছে। শত সহস্র হিন্দুর রক্তে নোয়াখালির মাটি রক্তিম। হাজার হাজার হিন্দু রমনী ধর্ষিতা। হাজার হাজার রূপসী হিন্দু রমনীকে অপহরণ করল মুস্লিমরা। গান্ধীজি কলকাতার দাঙ্গার এবং নোয়াখালির দাঙ্গার এ সব খবর বিস্তারিতভাবে অবগত হয়ে বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি হরিজন পত্রিকায় লিখলেন। "We are not in the midst of civil war. But we are nearing it. If the British are wise they keep clear of it. Appearances are to the contrary"

গান্ধীজি কলকাতার দাঙ্গা সম্পর্কে মন্তব্য করলেন।

"If through deliberate courage the Hindus had died to a man that would have been deliverance of Hinduism in India and Purification of Islam in this land. As it was a third party to intervene.

চৌত্রিশ

মীরা নোয়াখালির সম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন কাগজের মাধ্যমে জানতে পারলেন। সেই সময় উত্তরপ্রদেশে চলছিল কংগ্রেসের সরকার। গোবিন্দবল্লভ পন্থের নেতৃত্বে। মীরা গান্ধীজির মত নিয়ে চললেন উত্তরপ্রদেশে। দেখা করলেন পন্থ-এর সঙ্গে। মীরা উত্তরপ্রদেশে একটা কিষাণ-আশ্রম স্থাপনের ইচ্ছে প্রকাশ করলেন।

গোবীন্দবল্লভ মীরাকে আশ্রমের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দিতে সম্মত। এ সমস্ত জমি যুদ্ধের সময় সরকার সৈন্যদের ছাউনি স্থাপনের জন্য অধিগ্রহণ করেছিল। যুদ্ধশেষে জমিগুলি উত্তরপ্রদেশ সরকার ফিরে পেল। তখন ভারতে চলছিল অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন। গোবিন্দবল্লভ মীরাকে অধিক খাদ্য উৎপাদন সংস্থার অনারারি স্পেশাল এডভাইজার নিযুক্ত করলেন। মীরার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। মীরা যেন যুক্ত হলেন অ্যাংলিচাইজড ব্যুরোক্র্যাসির সঙ্গে। মীরা এতদিন ছিলেন একজন খাঁটি ভারতীয় গ্রামসেবিকা। গান্ধী মতবাদে বিশ্বাসী। এখন তাঁর মনে হতে লাগল তাঁর জীবন যেন অন্য ধারায় প্রবাহিত।

তাঁর এখন রয়েছে নিজস্ব আপিস। অনেক কর্মচারি। অফিসার স্টেনো। মীরা তাঁর পছন্দ মতো স্টেনো স্টাফ নিয়ে ছুটলেন বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে। প্রথমে পরিদর্শন করলেন যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন মাঠ। তারপর অন্যান্য ফাঁকা জমি। সেই সমস্ত জমিগুলি কৃষিকাজের জন্য কিভাবে ব্যবহার করা যায় সেই ব্যাপারে তাঁর স্টাফ ও অফিসারদের সঙ্গে কথা বার্তা বললেন। দিল্লী থেকে তিনি রুরকি দেরাদুন এবং লক্ষ্ণৌর বিভিন্ন জায়গায় ছুটলেন।

মীরা লক্ষ্ণৌতে গিয়েছিলেন গরমের সময়। প্রচন্ড গরমে মীরার কষ্ট হচ্ছিল। তিনি সেই সময় লক্ষ্ণৌতে অনেক ব্রিটিশ জেনারেলদের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি দেখলেন

অনেক ব্রিটিশ জেলারেল খালি গায়ে বাইরে কাজ করছেন। তাঁর সঙ্গে তাঁরা কথা বলতে কোন সঙ্কোচবোধ করছেন না। অন্যদিকে ভারতীয় কর্মচারিরা স্যুট-কোর্ট পরে কাজ করে যাচ্ছেন। অথচ তাঁরা সকলেই ঘর্মাক্ত কলেবরে ক্লান্ত। তাদের কষ্ট মীরা অনুভব করলেন। ভারতীয় কর্মচারিদের একরম মানসিকতা তাঁকে বিস্মিত করল। ভারতীয় কর্মচারীদের ইংরেজদের দাসত্ব করার মনোবৃত্তি দেখে তিনি মনে মনে দুঃখ অনুভব করলেন।

মীরাকে খাঁটি ইংরেজ সৈনিক ও অফিসারের দল খালিগায়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাল। তাঁরা মীরার পদমর্যাদা সম্বন্ধে আগেই খবর পেয়ে গেছেন। তবে সৈনিক ও অফিসারদের মধ্যে কার কি পদমর্যাদা তা জানা মীরার পক্ষে তখনকার মত সম্ভব হল না, কেন না প্রত্যেকে ছিলেন তখন খালি গায়ে। ইউনিফর্মপরিধানে না থাকলে পদমর্যাদা বুঝা যায় না।

কিষাণ আশ্রমই ছিল মীরার প্রধান কর্মস্থল। অত্যধিক গরমে মীরার পক্ষে লক্ষ্মৌতে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি লক্ষ্মৌ থেকে মুসোরি চলে গেলেন। সেখান থেকেই তিনি ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অবলোকন করছিলেন।

মীরা বেশকিছুদিন মুসোরিতে কাটালেন। মুসোরিকে কেন্দ্র করে হরিদ্বার হৃষীকেশ অনেক জায়াগায় ঘুরলেন। মীরার স্বাস্থ্য অনেকটা সুন্দর হয়েছে। তিনি আবার চললেন কিষাণ আশ্রমে। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি কল্পে বাপুর পরিকল্পনা যে কত বাস্তবসম্মত তা মীরা অনুভব করতে লাগলেন। মীরা দেখলেন বাপুর চিন্তাধারাকে রূপায়িত করে তিনি গ্রামের লোকদের স্বাবলম্বী করে তুলছেন। চরকায় সুতো কাটা, তাঁতে কাপড় বোনা গ্রামের মাঠে মাঠে ফসল ফলানো সবেতেই যেন গ্রামবাসিরা তৃপ্তি পাচ্ছে। এবং অভিজ্ঞ হয়ে উঠছে।

কিষাণ আশ্রমের পাশেই মীরা প্রতিষ্ঠা করেছেন দাতব্য চিকিৎসালয়। মূলত গ্রামের গরীব মানুষেরাই এই চিকিৎসালয়ে চিকিৎসার সুযোগ পেল। তাঁতিদের মধ্যে বেশিরভাগই মুসলমান। তাঁরা শুধু চরকায় সুতো কেটে, তাঁতে কাপড় বুনে সন্তুষ্ট থাকত না। যাতে উৎপাদিত বস্ত্রসামগ্রী বিক্রির ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য তারা মীরাকে ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানাল। মীরা তার জন্য সমবায় সমিতি গঠন করে সরকার থেকে যাতে সাহায্য পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করলেন।

মীরা একদিন তাঁর ঘরে বসে কাজ করছেন। এমন সময় একজন হরিজন তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হলেন। মীরা তাঁকে দেখে ঘরে বসালেন। তিনি ছিলেন ছোটখাটো ধরনের মানুষ। নম্র-শান্ত তাঁর মুখমন্ডল।

মীরা লোকটিকে তাঁর আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করলেন। বৃদ্ধ বললেন তিনি বিচপুরি গ্রাম থেকে এসেছেন। বিচপুরি একটা ছোট গ্রাম। মীরাকে বৃদ্ধ বিচপুরি গ্রামে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। বিচপুরি গ্রামের দুর্দ্দশার কথা তিনি মীরার সামনে তুলে ধরলেন। মীরা নিবিষ্টমনে সব শুনলেন। লোকটি বলে চললেন যে গ্রামের কৃষিজমি সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বালিতে। পাশের নদীতে পলি পড়ে নদী শুকিয়ে যাচ্ছে। ধানের ক্ষেতবালিতে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মাঠের চাষ বন্ধ। লোকে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। এক বেলা আহার জুটাও কষ্ট সাধ্য। বৃদ্ধ বললেন অনেক নেতা ও গণ্যমান্য লোকের কাছে তিনি গেছেন। তাঁদের গ্রামের দুঃখের কথা বলেছেন। কিন্তু কেউ তাঁর কথার কর্ণপাত করেনি। মীরা যেন অন্তত তাঁদের

গ্রামে একবারের জন্য আসেন। মীরা সম্বন্ধে তিনি অনেক শুনেছেন। মীরা যে এক অতি বিশাল হৃদয়ের মহিলা তা তিনি জানেন।

মীরা বৃদ্ধের কথাতে সম্মত হলেন। বিচপুরি গ্রামে যেতে সম্মতি জানালেন। যথাসময়ে তিনি বিচপুরি গ্রামে গিয়ে হাজির সেখানকার অবস্থা স্বচক্ষে দেখলেন। বিচপুরি গ্রাম নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখলেন। বাপুকে বিস্তারিত জানালেন। তাঁর প্রবন্ধটি যাতে হরিজন পত্রিকায় ছাপানো হয় তার ব্যবস্থা করতে বাপুকে অনুরোধ করলেন।

বাপু মীরার চিঠি পেলেন। বাপু মীরার অনুভূতি দেখে আনন্দিত। মীরার প্রবন্ধ ছাপানো হলো হরিজন পত্রিকায়। অনেক সহৃদয় ব্যক্তি তাঁর এই প্রবন্ধ পড়লেন। একজন অজ্ঞাতনামা হৃদয়বানপুরুষ পাঁচহাজার টাকার একখানা চেক দিলেন মীরার নামে। চেকটি বাপুর হাতে দেওয়া হলো। চেকটা বাপুই পাঠালেন মীরার কাছে। তবে যে লোকটি চেকটি দিলেন তিনি বাপুকে তাঁর নাম গোপন রাখতে অনুরোধ করলেন। তাই লোকটার নাম জানা সম্ভব হলো না। মীবা চেকটা হাতে পেলেন। সেই সময় পাঁচ হাজার টাকার বিশাল দাম। সম্পূর্ণ টাকাটাই বিচপুবি গ্রামের জন্য খরচ করার ব্যবস্থা হলো।

এর পর মীরা আশে পাশের হরিজন পল্লীর উন্নতিকল্পে বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। আশ্রমের প্রায় দু'মাইল দূরে সামরিক বিভাগের লোকদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য একটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। সেখানে জনৈক ইংরেজ মিলিটারি অফিসারের স্ত্রী মিসেস ডিউক-এর সঙ্গে মীরার পরিচয় ঘটেছিল সিমলা কনফারেন্সে। সেই ১৯৪৫ সালের কথা। মিসেস ডিউক মীরাকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মকর্তা ছিলেন একজন ব্রিগেডিয়ার। তাঁকে মিসেস ডিউক চিনতেন। মিসেস ডিউক মীরাকে নিয়ে ব্রিগেডিয়ারের কাছে গেলেন। মীরা বিগ্রেডিয়ারকে নিয়ে একটি হরিজন গ্রামে গেলেন। হরিজন গ্রামের রাস্তাঘাট ছিল ভাঙাচোরা। চলার অযোগ্য। মীরা ব্রিগেডিয়ারকে রাস্তাঘাট গুলো সারিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন।

ব্রিগেডিয়ার মীরার কথা শুনলেন। তাঁরই আদেশে গ্রামে এল বুলডোজার। অন্যান্য সরঞ্জাম। মীরা তাঁর ছোট ঘোড়া পনির পিঠে চড়েই গ্রামে এলেন। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বললেন। সেখানে ছোট ছোট লাগোয়া কয়েকটি হরিজন গ্রাম ছিল। গ্রামের মোড়লদের সঙ্গে তিনি কথা বললেন।

সকলেই মীরার ব্যবহারে সন্তুষ্ট। তাঁর মানসিকতা দেখে গ্রামবাসীরা বিস্মিত। রাস্তা তৈরি করতে গিয়ে কিছু কিছু গাছ কাটা পড়ল। গ্রামবাসীরা কিছুই মনে করল না। বুঝতে পারল গ্রামের সার্বিক সংস্কার সাধনে এগাছগুলি কাটার প্রয়োজন। তাই গাছের মালিক কোন আপত্তিই করল না। কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রামে মাটির রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। ব্রিগেডিয়ারের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। মীরার মন আনন্দে ভরে গেল। গ্রামবাসী মীরাকে তাদের 'মা'র মতন ভক্তি শ্রদ্ধা জানাল। মীরা কিষাণ আশ্রমে। কিন্তু বাপুর চিন্তায় তিনি কাতর। কলকাতার দাঙ্গা, নোয়াখালির দাঙ্গা বাপুর মানসিক ও শারীরিক আস্থার অবনতি ঘটালো। অনেক চেষ্টা করেও হিন্দু-মুস্লিম সম্প্রীতি সাধনে তিনি ব্যর্থ। জিন্না পাকিস্তানের দাবীতে অটল।

বাপু নেহরু ও প্যাটেলকে একটার পর একটা প্রস্তাব দিয়ে চললেন। দেশভাগ বন্ধ করার চেষ্টার কসুর করলেন না। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টা বিফলতায় পর্যসিত হল। বাপু নিরুপায়।

তিনি অহিংসার পথ ধরে তাঁর যাত্রা শুরু করলেন। স্থির করলেন তিনি দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে যাবেন। চললেন কলকাতা। সুরাওয়ার্দি তাঁর আশ্রয় চাইলেন!

কলকাতায় হিন্দুরা সুরাওয়ার্দিকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে তৈরি। কেন না এটা নিশ্চিত সুরাওয়ার্দিই কলকাতার নৃশংস দাঙ্গা বাধাবার জন্য দায়ী। হিন্দুরা পাল্টা মার না দিলে মুশ্লিমদের হাতে হিন্দুরা নিঃশেষ হয়ে যেত। বাপু এসে কিছুদিন বেলেঘাটায় কাটালেন। অনশন করলেন। সুরাওয়ার্দি বাপুর হস্তক্ষেপ চাইল কলাকাতার শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য। মীরা ছিল বাপুর সঙ্গে।

বাপুর হস্তক্ষেপে কলাকাতায় শান্তি মিছিল বের হল। হিন্দু মুশ্লিম এক সঙ্গে সম্প্রীতির মিছিল করে কলকাতায় রাস্তা পরিক্রমা করল। আর খুনী সুরাওয়ার্দি প্রাণে বেঁচে গেল। কিন্তু হিন্দু মুশ্লিমদের মনে সম্প্রীতি ফিরে এলো তখনকার মত এটা বলা যাবে না। তখনো হিন্দু মুশ্লিম দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যেই রয়েছে সন্দেহের ভাব।

এরপর বাপু চললেন নোয়াখালি। নোয়াখালি যাত্রার আগে বাপুর কাছে খবর এলো বিহার হিন্দু-মুশ্লিম দাঙ্গায় বিধ্বস্ত। হিন্দুরা নোয়াখালিতে হিন্দু নিধনের প্রতিবাদে বিহার হিন্দুরা মেতে উঠেছে মুশ্লিমনিধনে। জওহরলাল ও অন্যান্য কেবিনেট মন্ত্রিরা ছুটলেন বিহারে। কিন্তু পরিস্থিতি ঘোরালো। নেহরু এমনকি বিমান থেকে বোমা ফেলে হিন্দুদের সংযত করার কথাও চিন্তা করলেন। বাপু তাঁকে বাধা দিলেন। বাপু বিহারবাসীদের কাছে তাঁর আবেদন জানালেন। অনশন সত্যাগ্রহ করার কথা চিন্তা করলেন।

বিহারবাসীরা বাপুকে ভালোবাসেন। গভীর শ্রদ্ধা করেন। বাপুর অনশন করার সিদ্ধান্তের কথা জেনে বিহারবাসীরা নিজেদের সংযত করল। দাঙ্গার প্রকোপ কমল বিহারে। বাপু এবার চললেন নোয়াখালি। ১লা ডিসেম্বর, ১৯৪৬ মীরাকে বাপু লিখলেন তাঁকে হয়ত বেশ কিছুদিন নোয়াখালি থাকতে হবে। হিন্দুদের মনে সাহস ফেরাতে হবে। মীরাকে তাঁর জন্য চিন্তা করতে নিষেধ করলেন।

বাপু চারমাস নোয়াখালি কাটালেন। চারমাস পর ফিরে এসে ছুটলেন বিহারে। বিহারের প্রতিটি ঘটনা নিখুঁতভাবে বিচার বিবেচনা করলেন। এর মধ্যে ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রি ক্লেমেন্ট অ্যাটলি ঘোষণা করলেন ১৯৪৮ এর জুন মাসের মধ্যেই ব্রিটিশ ভারতবাসির হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দেবেন। কংগ্রেস ও মুশ্লিমলীগ দু'পক্ষই এতে সম্মতি জানালো। দু'পক্ষই বুঝতে পারল তারা তাদের ঈপ্সিত বস্তু লাভ করতে চলেছে। কংগ্রেস চাইল অবিভক্ত ভারতের শাসনভার কিন্তু জিন্না পাকিস্তান দাবিতে অটল। জিন্নার মুশ্লিম লীগ পাঞ্জাব ও আসামের হিন্দু অধ্যুসিত অঞ্চলও পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করতে চান। আর চান কলকাতা। জিন্নার এই উদ্ভট প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকার মানলেন না।

ফল হল আবার দাঙ্গা। পাঞ্জাব ও আসামে দাঙ্গা গুরুতর আকার ধারণ করল। আসামের দাঙ্গা কোনক্রমে দমন করা হলো। কিন্তু পাঞ্জাবে লক্ষ লক্ষ শিখ হিন্দু ভিটামাটি ছাড়া। চলে এলো ভারতে। করাচী, লাহোর পাঞ্জাবে লক্ষ লক্ষ লোক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হলো। অসংখ্য হিন্দু মহিলা ধর্ষিতা হলো মুশ্লিম সমাজবিরোধীদের দ্বারা। ধর্মান্তরিত হলো অসংখ্য।

এর প্রতিবাদে হিন্দুমহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ সোচ্চার হয়ে উঠল। তারা

বাপুর মুস্লিম প্রীতির ও জিন্নাকে তোষণের জন্য গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করল। বাপুকে মুস্লিম তোষণকারী-ও মুস্লিমদের ধ্বজাধারী বলতে দ্বিধাবোধ করল না। তারা বাপুর জীবন নাশের চেষ্টায় ব্রতী হল। ট্রেনে হরিজন অধ্যুসিত এলাকায় যাবার সময় বাপুকে লক্ষ করে তাঁর কামরায় বোমা ছুড়ল।

১৯৪৪ সালে সেবাগ্রামে তারা বাপুকে একবার অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল। তখন তাদের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছিল বলে মনে হয় না। বাপু কিছুদিন দিল্লীর ভাঙ্গী কলোনিতে ছিলেন। আর. এস. এস. তাদের যুবসংগঠনকে গান্ধীর পেছনে লেলিয়ে দিল। গান্ধীকে তারা পদে পদে অপদস্থ করার প্রবল চেষ্টা চালাতে লাগল। চেষ্টা চালাতে লাগল তাঁর প্রাণ নাশের।

এই সময় ক্ষমতা হস্তান্তরের বন্দোবস্ত করার জন্য ভারতে ভাইসরয় হয়ে এলেন লর্ড মাউন্টবেটেন। মাউন্টবেটেন কিন্তু লেবার পার্টির সদস্য ছিলেন না। তথাপি কর্মগুণে তিনি লেবার পার্টির আস্থাভাজন হয়ে উঠেছিলেন।

মাউন্টবেটেনের ভারতে আসার তারিখ ২২ শে মার্চ, ১৯৪৭ । তখন গান্ধী বিহারে। মাউন্টবেটেন ভারতে এসেই গান্ধীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। তিনি গান্ধীর কাছে চিঠি পাঠালেন। গান্ধী তাঁর বিহার সফর সেরে ৩১শে মার্চ দিল্লী এলেন। দেখা করলেন মাউন্টবেটেনের সঙ্গে। দু'জনের মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো।

কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগের মধ্যে দেখা দিল গুরুতর বিরোধ। লর্ড মাউন্টবেটেন ৩রা জুন ঘোষণা করলেন ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। কি পদ্ধতিতে ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে তার একটা খসড়াও প্রস্তুত করা হল।

১। ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলে মুস্লিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সমস্ত অঞ্চল নিয়ে মুস্লিম লীগ আলাদা ডোমিনিয়ন গঠন করতে পারবে। তার জন্য নতুন সাংবিধানিক সভা গঠন করতে হবে। এবং পাঞ্জাব ও বাংলাকে ভাগ করে মুস্লিম অধ্যুসিত এলাকা (সংখ্যাগরিষ্ঠের নিরিখে) পাকিস্তানে যাবে, হিন্দু অধ্যুসিত এলাকা থাকবে হিন্দুস্থানে।

২। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গণভোট নেওয়া হবে। সেখানকার অধিবাসীরা পকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তি চাইলে তাদের সেই অধিকার দেওয়া হবে।

৩। 'সিলেট' জনগণের ভোটের মাধ্যমে ভারত কিম্বা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হবে।

৪। বাংলার এবং পাঞ্জাবের হিন্দু ও মুস্লিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি নির্ধারণের ভার দেওয়া হবে সীমানা নির্ধারণ কমিশনের ওপর।

৫। পার্লামেন্টের বর্তমান অধিবেশনে ভারতকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেবার ব্যাপারে বা দু'টি ডোমিনিয়ন গঠনের ব্যাপারে যদি ভারত ভাগ মেনে নেওয়া হয় তাহলে ভারত ও পাকিস্তানকে ডোমিনিয়ন হিসেবে স্বীকৃতি দেবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এর জন্য সাংবিধানিক সভার আপাতত কোন মতামত প্রয়োজন হবে না।

মাউন্টবেটেনের এই ঘোষণা কংগ্রেস ও মুস্লিমলীগের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। গান্ধী হয়ে গেলেন নির্লিপ্ত। ভারত ভাগ গান্ধীর কাছে অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু নেহরু প্যাটেলের

আর জিন্নার একগুঁয়েমি মনোভাব গান্ধীকে ভারত ভাগ মেনে নিতে হল অদৃষ্টের অমোঘ বিধানে। জিন্না অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। বললেন তিনি "truncated and motheaten" পাকিস্তান ত চাননি। যা চেয়েছিলেন তা পেলেন না।

তবুও বলতে হবে তখনকার পরিস্থিতিতে এভাবে ভারত ভাগ ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগ নিমরাজি হয়ে ভারত ভাগ মেনে নিল। বাংলার এবং পাঞ্জাবের ভাগ বাটোয়ারা দু'টি কমিশনের ওপর বর্তাল। ব্রিটিশ সরকার তাদের পছন্দের লোক Sir Cyril Radcliffe কে কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করল।

স্বাধীন ভারত সরকার গঠনের জন্য (দি ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স বিল) ১লা জুলাই, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ করা হলো সর্বসম্মতিক্রমে। স্থির হলো ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। ১৪—১৫ আগস্ট মধ্যরাতে সাংবিধানিক সভার এক বিশেষ আধিবেশন ডাকা হলো দিল্লীতে। এ সভাতে ঘোষণা করা হল যে স্বাধীন ভারত ডোমিনিয়ন-এর জন্ম হল ব্রিটিশ কমন ওয়েলথ এর সদস্য হিসেবে। এবং লর্ড মাউন্টবেটন হলেন এই ভারতের প্রথম গবর্নর জেনারেল।

জিন্নাকে স্বাধীন পাকিস্তানের গবর্নর জেনারেল হিসেবে ঘোষণা করা হল এবং জিন্নাকে অনতিবিলম্বে তাঁদের সাংবিধানিক সভা গঠন করার দায়িত্ব দেওয়া হলো। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতি ঘোষণা করা হল। ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ ভারতের ইতিহাসে Red-letter day হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করল। পাকিস্তানের পাঞ্জাব থেকে হিন্দু শিখ ও অন্যান্য অমুস্লিমরা ভয়ে ভারতের দিকে পাড়ি দিয়েছে আর পাকিস্তানের হিন্দুরা দলে দলে চলে আসতে লাগল ভারতে। শ্যামাপ্রসাদ চেয়েছিলেন exchange of population কিন্তু ভারত সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। অতএব কার্যত লোক বিনিময় automatically হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানে স্থায়ী ও কোন পাঞ্জাবী শিখ বা হিন্দু আছে মনে হয় না। অথচ বাংলাদেশে আগের পূর্ব পাকিস্তানে বিপুল সংখ্যক হিন্দু এখনো রয়েছে। যেমন বিপুলসংখ্যক মুস্লিম রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে।

বাপু হিন্দু ও মুস্লিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন করলেন তারা যেন নিজ নিজ বাসভূমি পরিত্যাগ না করে। কিন্তু বাপুর কথায় কেউ কর্ণপাত করল না। বাপু অসহায় শিশুর মত সব কিছু নিরীক্ষণ করলেন। করার তাঁর কিছুই যেন নেই। মীরা আশা করেছিলেন ভারত ভাগ বন্ধ করার জন্য বাপু হয়ত অহিংস আন্দোলন চালাবেন কিম্বা অনশন শুরু করবেন। কিন্তু তিনি কোন কিছুই করলেন না। চলে গেলেন নির্জনে।

মীরা জানতে পারলেন বাপু কিছুদিনের জন্য পাকিস্তানে যাবেন। মীরা উদ্বিগ্ন। বাপুর লাহোরে যাবার ইচ্ছে ছিল। লাহোর ও কাশ্মিরে তিনি গিয়েছিলেন। তবে হয়তো তাঁর মনোবাসনা ছিল শেষ জীবনটা তিনি পাকিস্তানে কাটাবেন। মীরা বলেছেন এই কথা চিন্তা করতেও তাঁর কেমন যেন মনে হয়।

ছত্রিশ

মীরা চললেন দিল্লী। গান্ধী সকাশে। গান্ধীর সঙ্গে দেখা হলো। কথাবার্তা হলো। গান্ধীর মন ভারাক্রান্ত। মীরা বেশিদিন দিল্লীতে থাকতে পারলেন না। কা ' তাগিদে তাঁকে ছুটতে হলো কিষাণ আশ্রমে। উত্তরপ্রদেশে।

তখন উত্তরপ্রদেশে গ্রামীণ-উন্নয়ন সংস্থার কাজ চলছে জোর কদমে। খোলা হয়েছে Rural Development Deptt. উত্তপ্রদেশ সরকার মীরার কর্মক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত ছিল। আগেই উত্তর প্রদেশ সরকার গ্রামীণ উন্নয়নের ব্যাপারে সরকারকে সাহায্যের জন্য অনারারি অ্যাডভাইজার নিযুক্ত করেছিলেন।

মীরা পূর্ণউদ্যমে তাঁর কাজ করে যাচ্ছিলেন। মীরা Cattle Farming এর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। কিষাণ আশ্রম উত্তর প্রদেশ সরকারের Rural Development Project এর অন্তর্ভুক্ত হল। মীরার Cattle Farm এর জন্য টাকা মঞ্জুর হলো। অর্ধেক দিল উত্তর প্রদেশ সরকার আর অর্ধেক দিল কেন্দ্র। মীরা জায়গা নির্বাচনের জন্য উত্তর প্রদেশের চারদিকে ঘুরতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত হৃষীকেশ থেকে দু'মাইল দূরে একটা জায়গা তাঁর পছন্দ হলো। বনে জঙ্গলে ঢাকা সম্পূর্ণ জায়গাটার পরিধি হবে প্রায় চার মাইল। জমির পরিমান প্রায় তিনহাজার একর। জায়গাটা ব্লক এরিয়াতে। ব্লকের নাম বীরভদ্রব্লক।

এখানে রয়েছে প্রচুর লম্বা লম্বা ঘাস। পশু খাদ্য উৎপাদনের সুযোগও যথেষ্ট। এখানকার জঙ্গলে রয়েছে বন্যশুকর, হরিণ, শেয়াল এমনকি বাঘ, ভল্লুক ও হাতি। প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। বিচিত্র সব গাছ গাছালির সারি। মীরার মন আনন্দে নেচে উঠল। মীরা জায়গাটির নাম দিলেন পশু লোক বা Animal World। বিস্তারিত জানিয়ে বাপুকে চিঠি দিলেন। এখানে তৈরি করলেন একটা আশ্রম। মীরা যেন কবির খেয়ালে চলতে লাগলেন।

সরকারের ইচ্ছে Cattle Centre হবে দু' ধরনের। একটাতে থাকবে বয়স্ক ও অসুস্থ পশু। আর একটাতে শুধু সুস্থ গরু মহিষ। যাদের কাছ থেকে প্রচুর দুধ পাওয়া যাবে।

হৃষীকেশে গঙ্গার ধারে রামনগরে কালিকমলিওয়ালার আশ্রম। সেখানকার অতিথিশালায় মীরা তাঁর আস্তানা গড়লেন। সেখান থেকে পশুলোকে তিনি কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তখন অসম্ভব গরম। গরমে তাঁর শরীর খারাপ হয়ে যেতে লাগল। অথচ কাজ আরম্ভ না করলেও নয়।

মীরার পাহাড়ি এলাকায় ভ্রমণের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি ঘোড়া। তিনি তাঁর ছোট ঘোড়া পনি কে রেখে এসেছেন কিষাণ আশ্রমে। মীরা তাই রয়েছেন একটা ছোট ঘোড়ার খোঁজে।

একদিন তিনি হৃষীকেশের পাহাড়ি এলাকায় পায়চারি করছিলেন। এমন সময় দেখতে পেলেন দু Gujars (মুস্লিম যাযাবর পশুপালক) দু'টি ঘোড়া নিয়ে চলেছে। বিক্রির জন্য। মীরা তাদের লক্ষ্য করলেন। তাঁদের ডাকলেন। কথা বললেন তাদের সঙ্গে। একটি ঘোড়া মীরার পছন্দ। মীরা সেটা কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। দরদস্তুর করা হল। মীরা ঘোড়াটিকে কিনলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মীরার সঙ্গে ঘোড়াটির এক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠল। মনে হচ্ছিল যেন কতদিনের পরিচিত তার বর্তমান মালিক। মীরা ঘোড়াটিকে আদর করলেন মায়ের মত স্নেহে। ঘোড়াটির জন্য জিন কেনা হল। তার নাম রাখা হল মানা।

সে দেখতে অনেকটা আগের ঘোড়া পনির মত। তবে আকারে কিছুটা বড়। মীরা ঘোড়াটিতে চড়তে চেষ্টা করলেন ধীরে ধীরে তিনি সফল হলেন। ঘোড়াটির পিঠে চড়ে পাহাড়ি এলাকায় ভ্রমণ করতে প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হতো। ধীরে ধীরে তিনি সুনিপুণভাবে নতুন ঘোড়ায় চড়া রপ্ত করে ফেললেন। প্রকৃতি প্রেমে আকৃষ্ট-মীরা। তিনি তাঁর পরিকল্পনা অচিরেই রূপায়িত করার জন্য সচেষ্ট।

মীরার সঙ্গে কাজে লেগে গেলেন একজন সদাশয় কর্মনিষ্ঠ ও সত্যনিষ্ঠ গান্ধী অনুগামী। তাঁর নাম ধর্মপাল। ধর্মপাল ও তাঁর তিন সঙ্গী চললেন মীরার সঙ্গে। জায়গা স্থির করা পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরিকল্পনার কাজ সমাপ্ত করা-এ ছিল তাঁদের প্রাথমিক কাজ। সঙ্গে রয়েছে মীরার স্টেনো।

মীরা উত্তর কাশীতেই বিরাট একটা জায়গা পছন্দ করলেন। জায়গাটি ছিল দেবপ্রয়াগের সন্নিকটে। অলকানন্দা ও ভাগিরথীর শাখানদীর নিকটে। মীরার ধারণা উত্তর কাশির জলবায়ু কিছুটা শীতল হবে। সেখানে তাঁদের থাকার সুবিধে। কিন্তু বিধি যে বাম। প্রচন্ড গরম। তখন জুন মাস। মীবাও তাঁর সঙ্গীদের সেখানে থাকা অসম্ভব।

এত ব্যস্ততার মধ্যেও মীরা বাপুর চিন্তাতেই কাতর। এর মধ্যে বাপুর কাছ থেকে মীরা একখানা চিঠি পেলেন। উত্তরকাশীতে যাবার জন্য আগ্রহী।

এদিকে ভারতে চলছে বড় বড় শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা। নেহরু প্যাটেলের নেতৃত্বে। গান্ধীজি ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তাধারার লোক। তিনি ভারতে ভারী শিল্প স্থাপনের বিপদ সম্পর্কে নানান যুক্তি দেখালেন। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পই ভারতকে আর্থিক সম্পদে সমৃদ্ধ করবে এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ভারী শিল্প ভারতের দরিদ্র জনগণের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির প্রতিবন্ধক এই ধারণা তাঁর মনে দৃঢ় ভাবে প্রোথিত। তিনি এ ব্যাপারে সুভাষ, নেহরু, প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। বিফল মনোরথে হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

তাঁর সব পরিকল্পনা যেন ধীরে ধীরে অগ্রাহ্য হতে লাগল। খণ্ডিত ভারত তিনি কোনদিনও চাননি। ভারত হল দ্বিখণ্ডিত। চাননি ভারী শিল্প। ভারী শিল্প ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের গতিকে যে শ্লথ করে দেবে এটা তিনি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তিনি তার জন্য কোন কার্যকরি ব্যবস্থা নিতে পারলেন না। এই না পারার মনোবেদনা তাঁর দেহের ও মনের উপর গভীর আঘাত করল।

ক্ষোভে দুঃখে তিনি মীরাকে লিখলেন তিনি এখন কংগ্রেসের মধ্যে অপাংক্তেয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রয়োজন এখন ফুরিয়ে এসেছে। কংগ্রেস এখন আর তাঁর কথায় চলে না। নেহরু প্যাটেলরাই এখন দেশের কর্ণধার। এবং তাঁরাই জনগণের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করার মালিক।

মীরা উত্তরকাশীতে তাঁরই এক পরিচিত লোকের বাড়িতে থাকতেন। বাপুকে উত্তরকাশীর আবহাওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে জানালেন। মীরার চিঠি পেয়ে বাপু উত্তর কাশীতে যাবার পরিকল্পনা স্থগিত রাখলেন।

উত্তর কাশীর স্থানীয় লোকের পরামর্শে মীরা প্রতাপনগরে যাবার জন্য তৈরি হলেন। প্রতাগনগর জায়াগাটির জলবায়ু অনেকটা শীতল। গারওয়াল অঞ্চলে অবস্থিত এই জায়গাটি।

তেহরি-গারওয়ালের মহারাজার সঙ্গে মীরা দেখা করলেন। মহারাজা মীরার জন্য তাঁর অতিথিশালাটির বন্দোবস্ত করে দিলেন। মীরার সঙ্গে রইল তাঁর কর্মচারি ধর্মপাল স্টেনো কৃষ্ণমূর্তি ও রান্নার জন্য একটি ছেলে। আর রইল তাঁর ঘোড়াটি। যার নাম রেখেছেন মানা। প্রতাপনগরের আবহাওয়া সুন্দর। শীতলও বটে। মীরার শরীর এখানে এসে অনেকটা সুস্থ।

সাঁইত্রিশ

প্রতাপনগরের জলবায়ুর বর্ণনা দিয়ে মীরা বাপুকে চিঠি দিলেন। কিছুদিন এই স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকার জন্য মীরা বাপুকে আমন্ত্রণ জানালেন। মীরা বুঝতে পারলেন হিমালয়ের এরকম সুন্দর জায়াগায় বাপু কিছুদিন অতিবাহিত করলে তাঁর শারীরিক ও মানসিক উন্নতি ঘটবে। কিন্তু সমতলের অবস্থা যে খুবই উদ্বেগজনক। মীরার কাছে ভারতের বিভিন্ন জায়গার পরিস্থিতির নিয়মিত খবর আসছে।

এদিকে দিল্লীতে মুস্লিমলীগ ও কংগ্রেসের সঙ্গে মাউন্ট বেটনের ঘন ঘন আলোচনা চলছে। দিল্লীর অবস্থা সংকটজনক। পাকিস্তান থেকে দলে দলে শিখ ও হিন্দুরা এসে দিল্লীতে তাদের আস্তানা খুঁজে বের করার চেষ্টায় রত। মীরা প্রতাপনগর ছেড়ে এখন পশুলোকে যাবার কথা ভাবছেন। কিন্তু বর্ষা এসে গেছে। পশুলোকে আপাতত কাজকর্ম করা সম্ভব নয়। এদিকে বাপুও প্রতাপনগর আসতে পারছেন না।

তখন বিহার ও দিল্লীর সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি খুবই খারাপ। বাপু তখন দিল্লীতে। বিহার আবার অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে। পাঞ্জাবী হিন্দু শিখদের আগমনে দিল্লীর অবস্থাও ভয়নক। বাপু বিহারের পরিস্থিতি অনুধাবন করার জন্য ছুটলেন বিহারে। বিহার থেকে বাপু আবার ছুটলেন কলকাতা। বাপু অনুধাবন করতে পারলেন কলকাতার অবস্থা আবার খারাপের দিকে। সুরাবর্দীর জীবন সংশয়।

মীরা খবরের কাগজে পড়লেন বাপু কলকাতায়। সুরাবর্দীর বাড়িতে ছিলেন এবার। এসময় মীরা খুবই অসুস্থ। দিল্লীতে রয়েছেন। হার্টের রোগে আক্রান্ত, হিন্দুরা সুরাবর্দীর বাড়ি আক্রমণ করতে উদ্যত। সুরাবর্দীর রক্ত চাই এই চিৎকারে সুরাবর্দীর বাড়ির আশেপাশের জায়গা বির্দীর্ণ হচ্ছিল। হিন্দুরা শ্লোগান দিচ্ছিল "Go Back Gandhi". হিন্দুরা চিৎকার করে জানাল তারা সুরাবর্দীর মাথা চায়। সুরাবর্দীর নেতৃত্বে কলকাতা মহানগরী হিন্দুর রক্তে রঞ্জিত। গান্ধী এসে না পড়লে সুরাবর্দীর জীবননাশ ছিল অবধারিত। সুরাবর্দীর হিন্দু নিধনের পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেল। যে সুরাবর্দী মুখ্যমন্ত্রী হয়ে কলকাতায় হিন্দু নিধনে নেতৃত্ব দিচ্ছিল তাতে হিন্দুদের মাথা ঠিক রাখা সম্ভব ছিল না।

হিন্দুরা পাল্টা আক্রমণে মুস্লিমদের প্রতিহত না করলে সুরাবর্দী কলকাতা হিন্দুশূন্য করত। গান্ধীই বাঁচালেন সুরাবর্দীকে। আর কলকাতা বাঁচল আর একটা বড় দাঙ্গার হাত থেকে। গান্ধীই তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বে হিন্দুদের সংযত করলেন। কি বিহারে কি বাংলায়। যদিও ইতিমধ্যে কয়েক সহস্র হিন্দু মুস্লিমের তাজা রক্তে কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার ভেসে গেছে। মীরাবেন বলেছেন "Lord Mountbatten wrote that celebrated letter to Bapu

which he called him the One Man Boundary Force under whose charge there were no riots, whereas in the Panjab, where they had 55000 soldiers, there was large scale rioting"

সত্যি কথা বলতে কি গান্ধীজির একক ব্যক্তিত্বে কলকাতা ও বিহারের দাঙ্গা বন্ধ হল। না হলে আরও অগণিত হিন্দু মুস্লিমের রক্তে বিহার এবং কলকাতার মাটি রঞ্জিত হত। মাউন্টবেটেন তাই যথার্থই বলেছেন পাঞ্জাবে ৫৫০০০ হাজার ব্রিটিশ সামরিকবাহিনী দাঙ্গা থামাতে পারছেন না অথচ গান্ধীজির একক ব্যক্তিত্বে কলকাতা ও বিহার আবার একটা বড় দাঙ্গার হাত থেকে রক্ষা পেল। এখানেই গান্ধীজির কৃতিত্ব।

তবে গান্ধীজির মনের সন্দেহ দূরীভূত হল না যে কোন সময় হিন্দু মুস্লিম সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুন আবার জ্বলে উঠতে পারে। বাপু একটা চিঠিতে মীরাকে লিখলেন, "The Joy of the crowd is there, but not in me . . . . . Hindu Muslim unity seems to sudden to be true."

বাপুর এ কথায় যে কতখানি সত্যতা ছিল তা ১৯৫০ সালের দাঙ্গা তা প্রমাণ করল। ইচ্ছাকৃতভাবে ভূট্টো কাশ্মীরের একটা মিথ্যা এবং তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্বপাকিস্তানের শত-সহস্র হিন্দুকে মারল। তার প্রতিবাদে যখন কলকাতায় আগুন জ্বলে উঠল তখন পশ্চিমবঙ্গের .... মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তা কঠোর হাতে দমন করলেন। আর তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানের সরকারের কলাকৌশলে শত সহস্র নিরীহ হিন্দু নিহিত হল। শতসহস্র হিন্দু নারী ধর্ষিতা হল। হল ধর্মান্তরিত।

এদিকে দিল্লীতে মীরা ম্যালেরিয়ায় গুরুতরভাবে আক্রান্ত। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। ডাক্তার মীরার প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু করুণাময় ভগবানের অসীম কৃপায় মীরা প্রাণে বেঁচে গেলেন। শরীর যদিও বা পুরোপুরি সুস্থ নয়।

এরকম একটা শারীরিক ও মানসিক অবস্থায় মীরা দিল্লীতে। অবস্থান করছেন বিড়লা হাউসে। দিল্লীতে শুরু হয়েছে দাঙ্গা। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু ও শিখ স্মরণার্থীরা দিল্লীতে মুস্লিম নিধনে মেতে উঠেছে। মুস্লিমরা মারমুখী হয়ে হিন্দু শিখদের বিরুদ্ধে দাঙ্গায় লিপ্ত। মীরার শারীরিক অবস্থা অনুধাবন করে ডাঃ যোশীকে মীরাকে দেখার জন্য কল দেওয়া হল। ডাঃ যোশী পর পর দু'দিন এলেন বিড়লা হাউসে। মীরাকে দেখলেন। ঔষধ দিলেন। মীরা এখন অনেকটা সুস্থ। কিন্তু তৃতীয় দিনে ডাঃ যোশী আসার সময় রাস্তায় এক আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন। ডাঃ যোশীর বিড়লা হাউসে আসা হলো না। তাঁকে দাঙ্গার শিকার হতে হলো। নিষ্ঠুর ঘাতকের অব্যর্থ নিশানা ডাঃ যোশীর বক্ষস্থল বিদীর্ণ করল। তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তাঁরই বাড়ির সামনে।

দিল্লী ও পাঞ্জাব যে আবার অগ্নিগর্ভ। নেহরু ও মাউন্টবেটেন আলোচনা করলেন। অনেক চিন্তা ভাবনা করে তাঁরা দুজনে বাপুকে সত্বর দিল্লী চলে আসতে লিখলেন। অত্যন্ত জরুরি চিঠি। টেলিগ্রাম ও পাঠানো হল। তাঁরা বাপুকে পাঞ্জাবে পাঠাতে বদ্ধ পরিকর। নচেৎ পাঞ্জাবে শান্তি ফেরানো অসম্ভব। ব্রিটিশের ৫৫০০০ সৈন্য নামিয়েও পাঞ্জাবকে শান্ত করা যাচ্ছে না। পাঞ্জাবের দাঙ্গা যে গুলি দিয়ে বন্ধ করা যাবে না মাউন্টব্যাটেন এবং নেহরু ও অন্যান্য সকলে বুঝলেন। গান্ধীজির moral pressure একান্তভাবে প্রয়োজন।

গান্ধী কলকাতা থেকে দিল্লী রওনা হলেন। শরীর তাঁর সুস্থ ছিল না। অনেকের ধারণা ছিল তিনি কলকাতা থেকে দিল্লীতে আসতে পারবেন না। অসামান্য মনোবল গান্ধীকে দিল্লী নিয়ে এল। কলকাতা অনেকটা শান্ত। গান্ধী দিল্লীতে এসে উঠলেন বিড়লা হাউসে। গান্ধী মীরার সঙ্গে দেখা করলেন মীরার ঘরে গিয়ে। দিল্লীতে ভাঙ্গী কলোনীতে গিয়ে গান্ধীর পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। সেখানে স্মরণার্থীদের ঠাসা ভিড়। তাই গান্ধীকে বিড়লা হাউসে থাকতে হল।

গান্ধী স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন দিল্লীর অবস্থা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি অন্য কোথাও যাবেন না। গান্ধীর জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা হল। গান্ধী প্রতিদিন স্মরণাথী শিবির পরিদর্শনের জন্য যেতে লাগলেন। তিনি দেখলেন হিন্দু মুশ্লিম শিখ প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা স্মরণার্থী শিবির। তিনি দেখলেন প্রত্যেকেই রাগে ফুঁসছে। প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছেতে যেন প্রত্যেকের রক্ত টগ বগ করে ফুটছে।

গবর্ণর জেনারেল মাউন্টবেটন ও নেহরুর সঙ্গে গান্ধী আলোচনা করলেন। তিনি বললেন তিনি পাঞ্জাবে এমনকি পাকিস্তানেও যাবার জন্য প্রস্তুত। তিনি মাউন্টবেটনকে সেভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বললেন।

আটত্রিশ

এর মধ্যে আবার খবর পাওয়া গেল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জাতিদাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। মীরা চিন্তিত। তাঁর কিষাণ-আশ্রম হয়ত আক্রান্ত হবে। সেখানকার গ্রামবাসীরা এই দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়বে। মীরা তাঁর আশ্রমে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব। বাপুর কাছে পরামর্শ চাইলেন। চাইলেন অনুমতি। কিন্তু বাপু তাঁকে যেতে নিষেধ করলেন। মীরার স্বাস্থ্যও ভাল নয়। মীরা বাপুর কথা মেনে নিলেন।

বাপু প্রায় রোজই দিল্লীর শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শনে যান। মীরা তো ভীত সন্ত্রস্ত। বাপুর যে কোন সময় বিপদ হতে পারে এ কথা ভেবে তিনি আতঙ্কিত। বাপু নিজেও তাঁর জীবনের জন্য শঙ্কিত। যে কোন সময় তাঁকে আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হতে পারে। তিনি হিন্দু-মুশ্লিমদের মধ্যে একটা মিলনের সেতুবন্ধন করতে বদ্ধপরিকর।

বাপু বিড়লা হাউসের বাগানে রোজ বিকেলে প্রার্থনা সভা করেন। লোক সমাগম নেহাৎ কম হয় না। মীরাও সেই সভায় উপস্থিত থাকেন। তবে তিনি ভিড় এড়িয়ে একটু দূরে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে বাপুর প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

মীরার স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছিল না। একটু উত্তেজনা হলেই তিনি অজ্ঞান হয়ে যেতেন। ধীরে ধীরে দাঙ্গার প্রকোপ কমল সমগ্র দেশে। কিন্তু উগ্রজাতীয়তাবাদীরা গান্ধীর জীবন নাশের জন্য মরিয়া। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকসঙ্ঘের সদস্যরা ভাবত গান্ধীর জন্যই ভারতে মশ্লিমরা এত প্রাধান্য পাচ্ছে। যার জন্য তাঁরা ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলেও সম্মান জানাতে চায়না। ভারতবর্ষের বুকের রক্ত শোষণ করে, ভারতবর্ষ থেকে তারা হিন্দু নিধনে ব্যাপৃত।

বাপু হতাশায় মুহ্যমান। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর পক্ষে এ দেশের জন্য আর কিছু করা সম্ভব নয়। তিনি যেন এক প্রাচীনপন্থী নির্বোধ। একদিন মীরা বাপুর কাছে তাঁর মনে

এরকম হতাশার কারণ জানতে চাইলেন। বাপু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "হেরাম" তাঁর অন্তরের গভীরে যে তীব্রযন্ত্রণা তাতে প্রলেপ দেবার ক্ষমতা এ পৃথিবীতে কারুরই নেই।

মীরা বাপুর অনুমতি নিয়ে সামরিক বিভাগের অফিসারদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। তাদের সঙ্গে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করতে চাইলেন। কিন্তু বাপু তাঁকে সেই অনুমতি দিলেন না। কাশ্মীরের ব্যাপারেও বাপু তখন গভীরভাবে চিন্তিত। পাকিস্তানের উপজাতীয় লোকেরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সহায়তায় কাশ্মীরের বেশ কিছু অংশ দখল করে নিয়েছে। দখলীকৃত অংশের নাম দিয়েছে "আজাদ কাশ্মীর" বল্লভভাই প্যাটেলের ইচ্ছে ছিল হানাদারদের তাড়িয়ে দিয়ে পুরো জায়গাটায় আবার ভারতকাশ্মীরের অঙ্গীভূত করার। কিন্তু গান্ধীর জন্য প্যাটেলের চেষ্টা ফলবতী হল না। এভুলের মাশুল এখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষকে দিতে হচ্ছে। এখানেই রয়েছে "ট্র্যাজেডি" গান্ধীর অহিংস নীতিতে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান যে অসম্ভব তা তিনি যেন বুঝেও বুঝতে চান না। তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস অহিংস নীতিতে সব কিছুর সমাধান সম্ভব। এর উপর গ্রামীণ অর্থনীতি নিয়ে তিনি বিশেষ ভাবে উদ্বিগ্ন। ১৯৩৮ সালে ন্যাশ্যানেল প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হয়। সুভাষ-নেহরুরা এই পরিকল্পনার উদ্‌গাতা। পাশ্চাত্তের ধাঁচে বড় বড় শিল্প স্থাপন করে ভারতের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির কথা তারা চিন্তা করছেন।

গান্ধী মীরাকে বললেন ভারত স্বাধীন হয়েছে। কংগ্রেসের নেতারা বড় বড় পদের মোহে লালায়িত। কংগ্রেস হয়ে উঠেছে বড়লোকের প্রতিষ্ঠান। দেশের নিচের তলার লোকদের সার্বিক উন্নতি বিধানে তারা ততটা সচেতন নয়। তাই গান্ধী চিন্তিত। ব্যথিত। ভারত আবার এক সাংঘাতিক সংকটের দিকে এগোচ্ছে। তিনি তা দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছেন। তিনি এখন একঘরে। কেউ এখন তাঁকে আর তেমন আমল দিচ্ছে না। তাঁর কথার গুরুত্ব এখন লুপ্তপ্রায়। এই যেন তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণার চেয়েও পীড়াদায়ক।

মীরাকে তিনি এক চিঠিতে লিখলেন, "I don't know what you think of that freedom. For me it is a disillusioment" সত্যি বলতে কি গান্ধীর কাছে দ্বিখন্ডিত ভারতের স্বাধীনতা যেন প্রহসনমাত্র।

মীরা বলেছেন বাপুকে দেখলে তখন মনে খুবই কষ্ট হতো। তিনি একাকী। নির্লিপ্ত। যেন প্রতিমুহূর্তে তিনি নিজের মৃত্যুকামনায় রত।

মীরা বাপুর জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। বাপুর মানসিক শান্তির জন্য কিছুই যে তিনি করতে পারছেন না। মীরা নানান চিন্তা ভাবনা করে একদিন বাপুকে বললেন, "Let me build you a mud cottage and a cowshed on the golf course of the viceroy's House. There are lots of land going to waste, and if start living there right under the noses of the new rulers they will be bound sooner later to come down from their palatial dwellings and live humbly too. In this way the atmosphere might gradually change".

মীরার প্রস্তাব শুনে গান্ধীজি মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন "মীরা তোমার এই বিদগুটে প্রস্তাব আমি মেনে নিতে অপারগ। আমি স্থির করেছি পায়ে হেঁটে পাঞ্জাব পরিভ্রমণ করব। সেখানকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিরসন করার আগে আমি অন্য কোন কথা ভাবতে পারছি না।"

বাপুর কাছে ভারতের ও ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন। ভারত ভাগের যন্ত্রনাটা যে বাপুর কাছে অসহনীয় তা মীরাকে অনুধাবন করতে বললেন বাপু। বাপুর এরকম মানসিক

অবস্থার মধ্যেও মীরা বাপুকে বললেন তিনি যেন মীরার 'পশুলোক' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। বাপু মীরার কথায় সম্মতি দিতে পারলেন না। তিনি মীরাকে বললেন, "what is the use of counting on a corpse."।

কিন্তু গান্ধীর ভেতরের জ্বালার বাহ্যিক প্রকাশ ছিল না। তিনি কাউকেও কিছু বুঝতে দিতেন না। সব সময় রসিকতাপূর্ণ কথাবার্তা বা মনভোলানো ব্যক্তিত্বে সকলকে আপ্লুত করে রাখতেন। অথচ তাঁর ভেতরটা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। তিনি যেন নির্বিকল্প সমাধি নিতে চলেছেন। মীরার বুঝতে অসুবিধে হলো না বাপু শীঘ্রই ইহলোক ত্যাগ করে অমৃতলোকে পা বাড়াতে চলেছেন।

উনচল্লিশ

ডিসেম্বর মাস। প্রচন্ড শীত। দিল্লী আপাতত শান্ত। কিন্তু দিল্লীবাসীরা চাইছে, বাপু যেন আরও কিছুদিন দিল্লীতে থেকে যান। তাদের মনের ভীতি তখনো বিদূরিত হয়নি। যে কোন মুহূর্তে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হতে পারে। বাপুর মনেও রয়েছে সেই ভীতি। তাঁর চোখে ঘুম নেই। তন্দ্রাচ্ছন্ন বাপু। দুঃস্বপ্নের নগরীতে বাপু যেন দেবদূতের ন্যায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মনের পরিবর্তন আনতে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য।

মীরা বুঝতে পারলেন বাপুকে খানিকটা মানসিক শান্তি দিতে পারেন নেহরু ও প্যাটেল। মীরার পক্ষে যা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই মীরা তাঁর কর্মস্থল 'পশু লোকে' চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বাপুর সম্মতি পাওয়া গেল।

১৮ই ডিসেম্বর মীরা চললেন তাঁর কর্মস্থলে। পশু লোক স্থাপিত হয়েছে হৃষীকেশের সন্নিকটে এক বিশাল জায়গা নিয়ে। মীরা গিয়েই সেখানকার কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য অর্থ সংগ্রহে মনোযোগ দিলেন। তবে তাঁর মন বাপুর চিন্তাতেই তখনো অস্থির। কেন না যে কোন সময় দিল্লীতে আবার চরম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হতে পারে।

একমাসও কাটল না। মীরা খবর পেলেন দিল্লীতে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছে। বাপু দাঙ্গা দমনে অন্য কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে শুরু করলেন অনশন। এটাই যে তাঁর শেষ অস্ত্র। ১৬-১-৪৮ তারিখে বাপু মীরাকে চিঠি দিলেন। কেন না তিনি জানতেন মীরা বাপুর অনশনের খবর পেয়ে দিল্লী ছুটে আসবেন। মীরাকে দিল্লী আসতে নিষেধ করলেন। গান্ধী মীরাকে লিখলেন। "এখানে (দিল্লীতে) ছুটে এসো না। আমি অনশন করছি। আমার অনুরক্ত ভক্তবৃন্দ যে যেখানে আছে তারা যদি সেখানে থেকে ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে দেশে শান্তির জন্য এবং আমার জীবনের জন্য প্রার্থনা করে তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি এ সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারব। ভগবানে বিশ্বাস রাখ এবং যেখানে আছ সেখানেই থাক"।

মীরা ত বাপুর চিঠি পেয়ে অস্থির। মীরার রাতের ঘুম কে যেন এক অদৃশ্য শক্তিবলে কেড়ে নিয়েছে। এর মধ্যে অর্থাৎ ১৯/১/৪৮ তারিখে মীরা খবর পেলেন দিল্লীর দাঙ্গা প্রশমিত। বাপু মীরাকে সেই দিনই চিঠি দিলেন। চিঠিটা এক লাইনের, "সব উৎকণ্ঠার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।"

মীরা আশ্বস্ত হলেন। কিন্তু তার পরের দিনই মীরার দুশ্চিন্তা গেল বেড়ে। মীরা খবরের কাগজে দেখলেন 'বিড়লা হাউসে' বাপুর প্রার্থনা সভায় একটা বোমা পড়েছে। বোমাটি বাপুকেই লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছে। অল্পের জন্য বাপু প্রাণে বেঁচে গেছেন। বাপু যেন বুঝেও বুঝতে চাইছেন না তাঁকে খুন করার জন্য শত্রুরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। বাপুর জীবন নেবার জন্য শত্রুরা উদগ্রীব এটা ছিল বাপুর চিন্তার বাইরে। তিনি তাঁর অনুরক্তদের বললেন স্বয়ং ভগবানের যদি তাই ইচ্ছে হয় তবে তাঁকে তিনি রোধ করতে পারবেন না।

মীরা তখন হৃষীকেশে। কালিকমলিওয়ালার ধর্মশালায় বাস করছেন। গঙ্গার তীরেই অবস্থিত এই ধর্মশালা। এখান থেকে তাঁর পশুলোক কাছেই। সেই দিনটিতে মীরা তাঁর পশুলোকের বিবিধ পরিকল্পনা নিয়ে খুবই ব্যস্ত। তাঁর সঙ্গী-সাথীরাও ব্যস্ত। এসেছেন একজন উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার। পশু লোক এর বিশাল এলাকাটা পরিদর্শন করতে। এবং মীরার পরিকল্পনার কথা বিস্তারিত ভাবে জানতে। কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য দেবার কথা চিন্তা করছে। তাই একজন পদস্থ অফিসারকে পাঠিয়েছে এর বিস্তারিত অনুসন্ধানের কাজ সেরে সরকারকে রিপোর্ট জমা দিতে।

মীরা অফিসার ভদ্রলোককে সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলেন। অফিসারটি সন্তুষ্ট। মীরা সহ তিনি ধর্মশালায় ফিরে এলেন। মীরার অন্যান্য সঙ্গী সাথিদের কেউ কেউ ফিরে এলেন তাঁর সঙ্গে। কেউ কেউ পশুলোকে থেকে গেলেন। অফিসার ভদ্রলোক চলে গেলেন হৃষীকেশের হোটেলে। মীরা ও তাঁর সাথিরা চললেন কালিকমলিওয়ালার ধর্মশালায়।

তখন রাত। মীরা ক্ষিদেতে কাতর। খাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁকে যথারীতি থালায় সাজিয়ে খাবার দেওয়া হল। মীরা খেতে যাবেন-ঠিক সেই সময় পশুলোকের কিছু কর্মচারি ছুটে এল মীরার কাছে তাঁদের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। মীরাকে যে কি বলবেন তারা ভেবে পাচ্ছে না। এরই মধ্যে এসে উপস্থিত একখানা সরকারি জিপ। জিপে একজন সরকারি অফিসার। কিছু লোক সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। মীরা ভীতি বিহ্বল নয়নে তাদের পানে চেয়ে আছেন। ঘটনাটা জানার জন্য অধীর আগ্রহ তাঁর। খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠেছে। পেটের ক্ষিদে গেছে উড়ে। মীরা কয়েকসেকেন্ড নির্বাক দৃষ্টিতে মাটিতে বসে রইলেন।

হঠাৎ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোক মীরাকে কাঁদতে কাঁদতে বললেন। 'বাপুকে প্রার্থনা সভায় এক আততায়ী গুলি করে হত্যা করেছে।" মীরার বুকে কথাটা ধনুকের তীরের মত বিঁধলো। মীরার দেহখানি ভূতলে পতিত হল। দু'চোখ অশ্রুতে ভরে গেল।

মীরা যেন ভাবতে লাগলেন যাঁর প্রেরণায় ও আকর্ষণে ভারতবর্ষে তাঁর স্থায়ী আস্তানা স্থাপন করা - সেই আকর্ষণ নিমেষে মিলিয়ে গেল। কত কথাই তাঁর মনে পড়তে লাগল। বাবা-মা ইহলোকে নেই। নেই দিদি রোহনা। স্বদেশে ফিরে গিয়ে কোথায় তিনি আশ্রয় পাবেন। বিশেষত গান্ধীজির প্রেরণা তাঁকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত করেছিল। ইংলন্ডের সন্তান হয়েও তিনি এখন ইংরেজদের চোখে শত্রু একজন ভারতীয়া স্বাধীনতা সংগ্রামী ভিন্ন আর কেউ নন।

নানান চিন্তা ভাবনা করে নিজেকে সংযত করলেন। জেলখানায় মহাদেবের মৃত্যু দেখেছেন, দেখেছেন কস্তুরাবার মৃত্যু। দেখেছেন এসমস্ত প্রিয়জনের মৃত্যুতে গান্ধীজির নির্বিকার ভাব। সহনশীলতা। গান্ধীজির সঙ্গে থেকে মীরা যে শিক্ষা লাভ করেছেন সেই

শিক্ষাই তাঁকে সুখ-দুঃখকে সমজ্ঞানে গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়েছে। গীতার বাণী যেন তাঁর হৃদয় তন্ত্রীকে বিকম্পিত করতে লাগল। তিনি কিছুটা সুস্থির হলেন।

বাপুর শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকার জন্য দিল্লী গেলেন মীরা। বাপুর নশ্বরদেহ যথানিয়মে দাহ করা হল গান্ধীঘাটে। যমুনা নদীর তীরে। গান্ধীর চিতাভস্ম হৃষীকেশের গঙ্গায় বিসর্জন দেবার ব্যবস্থা হল। ভস্মাধার নিয়ে আসা হল হৃষীকেশে। মীরাই সেই ভস্মাধার হৃষীকেশের পবিত্রগঙ্গায় বিসর্জন দিলেন। একটি ভস্মাধার গেল এলাহাবাদে সেটা বিসর্জন দেওয়া হল ত্রিবেনী সঙ্গমে। তবে সেখানে মীরা গেলেন না।

মীরা চিন্তাক্লিষ্টা। বিস্ফারিত নয়নে মহাশূন্যে তাকিয়ে রইলেন ফ্যাল ফ্যাল করে। স্বামীজির মৃত্যুতে শিষ্যা নিবেদিতার মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল মীরার মনেও যেন আজ গান্ধীজির মৃত্যুতে সেই ভাব। যে আকর্ষণে তিনি ভারতে এসেছিলেন তাঁর সেই আশা সম্পূর্ণ হল না। হয়ত তাঁকে তাঁর কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই ধরাধাম থেকে চলে যেতে হবে। তবুও মীরা যেন এক অদৃশ্য শক্তিবলে বলিয়ান হয়ে ভারতের মাটিতে ভারতীয়দের সার্বিক মঙ্গলবিধানে যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন গান্ধীজির প্রেরণায় সেগুলো সম্পূর্ণ করার জন্য সংকল্প গ্রহণ করলেন। স্বামীজির মৃত্যুর পর নিবেদিতাও ঠিক এভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

নিবেদিতা ভারতের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেননি। তিনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য চরমপন্থী আন্দোলনের অন্যতমা নেত্রী। তবে তাঁর শেষ জীবন বড়ই করুণ। মৃত্য হয়েছিল শৈল শিখর দার্জিলিং-এ। শেষ জীবনে লেডী অবলা বসু ও গনেন মহারাজ ছিলেন তাঁর একান্ত অনুগামী, না হলে তাঁর কি অসহায় অবস্থা হতো তা ভাবতেও মনে ভীতির সঞ্চার হয়।

মীরা বেন ভারতের স্বাধীনতা দেখেছেন। দেখেছেন খণ্ডিত ভারত। বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দেখেছেন গান্ধীজির মৃত্যু। গান্ধীজির পরিকল্পনা কার্যকরি করতে গিয়ে পেয়েছেন পদে পদে বাধা। গান্ধীজি চেয়েছিলেন ভারতের প্রতিটি গ্রাম কুটির শিল্পে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক। প্রচার হোক খাদির। ভারি শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হোক তা ছিল গান্ধীজির চিন্তার বাইরে। কিন্তু নেহরু প্যাটেলের পরিকল্পনা ছিল ভারি শিল্পের সম্প্রসারণ। দেশের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি নচেৎ সম্ভব নয়-এ ছিল তাঁদের মনোভাব। তার জন্য গান্ধীজির সঙ্গে তাঁদের মনোমালিন্য ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজিকে সরে দাঁড়াতে হয়েছে। ভারত ভারিশিল্পের পীঠস্থান হয়ে উঠেছে। তার পরিণাম ভারত ও ভারতবাসীর পক্ষে ভালো হয়েছে কিনা জনগণ তার বিচার করবে।

তবুও গান্ধীশিষ্যা মীরা বেন কিন্তু গান্ধীজির পরিকল্পনা কার্যকরি করার জন্য চেষ্টার কসুর করেননি। হিমালয়ের পাদদেশে বিশাল জায়গা নিয়ে তার 'পশুলোক' পরিকল্পনার মধ্যে নিষ্পেষিত, অবহেলিত পাহাড়ী এলাকার বিপুল সংখ্যক জনগণের হিতসাধনের বিপুল সম্ভাবনা ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার কিছু অর্থসাহায্যও দিতে চেয়েছিল।

এই পরিকল্পনাটি কার্যকরি করার জন্য "গান্ধী মেমোরিয়েল ট্রাস্ট" এর কাছে মীরাবেন আর্থিক সাহায্য চেয়েছিলেন। এই ট্রাস্টটি গঠিত হয়েছিল গান্ধীজির মৃত্যুর অনতিকাল পরেই। কিন্তু এই ট্রাস্ট মীরাবেনকে তাঁর পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য সাহায্য করতে

তেমন ভাবে এগিয়ে আসেনি। কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসের লালফিতার বাঁধনও তাঁর পরিকল্পনা কার্যকরি করতে পদে পদে বাধার সৃষ্টি করেছে।

অথচ তাঁর এই পশুলোক পরিকল্পনা ছিল গান্ধীজির দ্বারা অনুমোদিত। ভারত সরকারও অনুমোদন দিয়েছিল। গান্ধীজি তো পশুলোক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি। তিনি তখন পরপারে। এসেছিলেন তদানীন্তন ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ। কিন্তু আর্থিক ও অন্যান্য নানান অসুবিধেতো এই পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণ শেষ পর্যন্ত সম্ভব হল না।

মীরা হতাশ হলেন। ভারতবাসীর সার্বিক মঙ্গলাবিধানে গান্ধীজির চিন্তাধারাকে তিনি অবহেলিত জনগণের কাছে পৌছে দেবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। ভারতের শতকরা আশিভাগ লোক তখন ছিল কৃষিনির্ভর। কৃষকদের মধ্যে গান্ধীজির চিন্তাধারাকে পৌঁছে দেবার জন্য তিনি নিজের খরচে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশনার কাজে হাত দেন। ইংরেজি, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, গুজরাটি ভাষায় প্রকাশিত হতে লাগল এই পত্রিকা। পুরো টাকাটাই তিনি তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে খরচ করতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কপর্দকশূন্য হয়ে গেলেন। কাজের কাজ কিছুই হলো না। তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন।

তিনি পত্রিকাটির নাম দিয়েছিলেন 'বাপুর রাজ পত্রিকা'। তিনি শুধু পত্রিকা প্রকাশ করে ক্ষান্ত হলেন না, তিনি সমতলের বহু কৃষকের বাড়ি বাড়ি গেছেন-সাধারণ লোকের কাছে তাঁর মনের কথা বলেছেন-লোকে তাকে যথেষ্ট সমাদর করেছে। শুনেছে তাঁর কথা। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন কংগ্রেস সরকাব ও সরকারি অফিসার ও মন্ত্রিরা তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যাপাবে মোটেই আগ্রহী নন। তাদেব মধ্যে কোন আন্তরিকতা নেই। উপরন্তু কিভাবে এ সব পরিকল্পনা ভন্ডুল করা যায় তাই যেন তাদের চিন্তারাজ্যে বিচরণ করছে।

মীরার কোন পরিকল্পনা কার্যকরি হল না। এর মধ্যে মীরার একান্ত অনুগত কয়েকজন তাঁকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। ধর্মপাল চলে গেছেন ইংলন্ডে। তিনি বিয়ে করেছেন এক ইংলিশ রমনীকে। আর কৃষ্ণমূর্ত্তি যোগ দিয়েছেন Gandhi National memorial Turst-এ। অথচ ট্রাস্ট থেকে মীরাকে তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য আর্থিক সাহায্য দিতে তারা ততখানি আগ্রহী নন। হিমাচল অঞ্চলের সব পরিকল্পনাই ভেস্তে গেল।

কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে এবং কাশ্মীরের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী বক্সি গোলাম মহম্মদ-এর আগ্রহে মীরা গেলেন কাশ্মীর। শ্রীনগরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বক্সি গোলাম মহম্মদ তাঁকে সাদরে বরণ করলেন। কাশ্মীরী প্রথায়। তাঁকে আপ্যায়ন করা হল। তাঁর সঙ্গে সাথি জগদীশ। মীরা গোপালন, অশ্বপালন ও অন্যান্য কুটির শিল্পের প্রসারের ব্যাপারে কিভাবে এগোতে হবে তা ভালভাবেই জানতেন। বলা যায় তিনি তখন বক্সি গোলাম মহম্মদের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার জন্য কাশ্মীরে গেছেন।

কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী তাঁকে বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য করছেন। শ্রীনগরে ডেয়ারি ডেভেলাপমেন্ট প্রকল্পের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিনি নানা বিধ উপায় বাতলে দিলেন। গ্রীষ্মকালে গরু গাভী ও অন্যান্য পশুদের প্রায় ৬০০০ ফুট উঁচুতে গোচারণ ভূমিতে নিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন। বিদেশ থেকে গরু এনে অর্থাৎ জার্সি-হাইফার ইত্যাদি গরু এনে ভারতীয় গাভির সঙ্গে ক্রস-ব্রিডিং এর মাধ্যমে উন্নত জাতের গাভি ও গরু উৎপাদন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। সেই ভাবে কাজ হলো। বিদেশ থেকে ষাঁড় আনা হলো। এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া হল 'Goabal'।

কিন্তু তাঁর সেই কাজেও বাধার সৃষ্টি হতে লাগল। ফলে ধীরে ধীরে তাঁর সব পরিকল্পনাই পরিত্যক্ত হল। মীরা সাময়িকভাবে তেহরি গারওয়াল হিলস-এ চলে এলেন থাকার জন্য। বুঝতে পারলেন তাঁকে তাঁর পরিকল্পনামত কাজ করার সুযোগ দেবে না কেউ। মীরা দুঃখ করে বললেন I had no place in which to live, and very little money left. Kishan Ashram, Pashulok, Gopal Ashram and Goabal had all passed out of my life like dreams. No more Government projects, that at best was clear.

গান্ধীজি মারা যাবার পর থেকে দশটি বছর মীরা ভারতের নিম্নবিত্ত জনগণের সার্বিক মঙ্গলবিধানে বিবিধ পরিকল্পনা রচনা করেন। কিন্তু তাঁর একটার পর একটা পরিকল্পনা বিফলতায় পর্যবশিত হয়। শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে মীরা ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার কথা চিন্তা করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি ভিয়েনা চলে যান। তাঁর ভিয়েনা বা ইউরোপের জীবন সম্পর্কে লেখকের কিছু জানা নেই। অশেষ মানসিক কষ্টে তিনি ভারত ছেড়ে চলে যান।

নিবেদিতা ও অ্যানিবেশান্ত ভারতের মাটিতেই দেহ রাখেন। ভারতের মাটিতেই হিন্দু ধর্মমতে তাঁদের নশ্বর দেহের সমাধি হয়। মীরা বেন চেয়েছিলেন হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে কিন্তু গান্ধীর নির্দেশে তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু ধর্মে দীক্ষালাভ করেননি। খ্রীষ্টান ধর্মমতে স্বদেশে তাঁর শেষ কৃত্য সম্পদিত হয়েছিলো। নিয়তির অমোঘ বিধানে তাঁর সারাটা জীবন এক ঘূর্ণিবাতের আবর্তে আবর্তিত হয়েছে। শেষরক্ষা তাঁর হয়নি।

মীরা ভারতে ৩৪ বছর কাটিয়েছেন। প্রচুর অভিজ্ঞতা ভারতবাসী ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে তিনি লাভ করেছেন। ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর দুঃখ মোচনে তিনি নিরলস সংগ্রাম করেছেন। ভারতের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তিনি ঘুরেছেন। ভারতের জনগণের মনে আশার আলো প্রজ্বলিত করার সংকল্পে তিনি ছিলেন অটল।

ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর সার্বিক মঙ্গলের জন্য গান্ধীজির স্বপ্নকে রূপায়িত করার সংকল্পেও তিনি ছিলেন অটল। কিন্তু তাঁর আশা সফল হয়নি।

সংক্ষেপে বলা চলে অপরূপ রূপসী ইংলন্ডের নৌবাহিনীর সর্বোচ্চ অধিকর্তার কন্যা এসেছিলেন ভারতে। গান্ধীজির টানে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সব ছেড়ে। রম্যাঁ রল্যাঁর গান্ধীজীবনী পড়ে এবং রল্যাঁর গান্ধী সম্পর্কে মন্তব্য শুনে মীরার জীবনের মোড় গিয়েছিল ঘুরে। যোগিনী বেশে চলে এসেছিলেন ভারতে। শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন গান্ধীজির তেত্রিশ বছর বয়সে। ৩৪ বছর কাটিয়েছেন ভারতে। ২৪ বছর ছিলেন গান্ধীজির সঙ্গে। গান্ধীজির মৃত্যুর পর দশবছর ভারতে ছিলেন। হিমালয়ের পাদদেশে আস্তানা গেড়েছিলেন। তখন কংগ্রেস সরকার ভারতের মসনদে। নেহরু প্রধানমন্ত্রী। বলতে দ্বিধা নেই গান্ধীর মৃত্যুর পর সরকার বা বেসরকারি কোন তরফ থেকে তিনি তাঁর পরিকল্পনামত কাজ করার সুযোগ পাননি।

ভারতে এসেই তিনি সবরমতি আশ্রমে উঠেছিলেন। গান্ধীজির শিষ্যা হিসেবে অনেক কাজ করেছেন। সবরমতি আশ্রমের পরিবেশ পরিস্থিতি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। আশ্রমিকদের মধ্যে ব্যভিচার তাঁকে পলে পলে দগ্ধ করেছে। বাপু অনশন করেও আশ্রমিকদের

মনের পরিবর্তন ঘটাতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত মীরার সঙ্গে পরামর্শ করে বাপু সবরমতি আশ্রম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন।

আশ্রম চলে যায় সেবাগ্রামে। সেখানেও মীরাবেন ছিলেন গান্ধীজির অন্যতম প্রধান অনুরক্ত ভক্ত। মধ্যবয়সে মীরা পৃথ্বী সিং নামক এক সুদর্শন পাঞ্জাবী স্বাধীনতা সংগ্রামী ও গান্ধী অনুরাগীর সঙ্গে পরিচিতা হন। ভারতে এসে এই একমাত্র ব্যক্তি যাকে প্রেমডোরে বাঁধতে চেয়েছিলেন তিনি। বিয়েও করতে চেয়েছিলেন তাঁকে। গান্ধীজির সম্মতিও তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু পৃথ্বীসিং তাঁকে প্রতারণা করলেন। এর পর মীরা দৈহিক সুখভোগের চিন্তা চির কালের জন্য বিসর্জন দেন। সম্পূর্ণ রূপে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর সার্বিক মঙ্গ ল বিধানে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরেছেন। বহুবার মালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মরনোম্মুখ হয়েছেন। তবুও ভারতবাসীর সেবার কাজ থেকে তিনি সরে দাঁড়াননি। গান্ধীজিও অনেক সময় তাঁকে ভুল বুঝেছেন। এভাবে ভারতবাসীর সেবায় আত্মত্যাগ করতে গিয়ে তিনি যেমন ধন, জন, যৌবনকে উপেক্ষা করেছেন তেমনি উপেক্ষা করেছেন তাঁর শারীরিক অসুস্থতাকে। এদেশ থেকে বা এদেশের অধিবাসীদের কাছ থেকে তিনি কিছু পেয়েছিলেন একথা বলা মুস্কিল। কিন্তু আবহেলিত ভারতবাসীকে দিতে চেয়েছিলেন অনেক কিছু। পারলেন না। শেষ পর্যন্ত বেদনার্দ্র হৃদয়ে এদেশ ছেড়ে চলে যান।

মাদাম কামা, নিবেদিতা, অ্যানিবেশান্ত-এঁদের মত মীরাও ছিলেন একান্ত ভারতপ্রেমী। যতদিন এদেশে ছিলেন ততদিন এদেশকে স্বদেশ জ্ঞানে সেবা করেছেন। কিন্তু ভারত প্রেমিক এ সমস্ত মহীয়সী নারী আজ ভারতবাসীর স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত প্রায়। আমাদের দেশের রথী-মহাবথীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে এঁদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন-এ কথা বলা যাবে না। এটা যে আমাদের লজ্জার।

মীরা বেনের জীবনী বাংলা ভাষায় কিম্বা ইংরেজিতে কোন ভারতীয় লেখক লিখেছেন কিনা আমার জানা নেই। তবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য উৎসর্গকৃতা এ সমস্ত বিদেশিনীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। তা না হলে বিশ্বমানবাত্মার কাছে আমাদের জবাব দেবার যে কিছুই থাকবে না।